আমেরিকাবাসী বাঙালী তরুণী

ঝুম্পা লাহিড়ির

পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

ইন্টারপ্রেটার অব ম্যালাডিজ

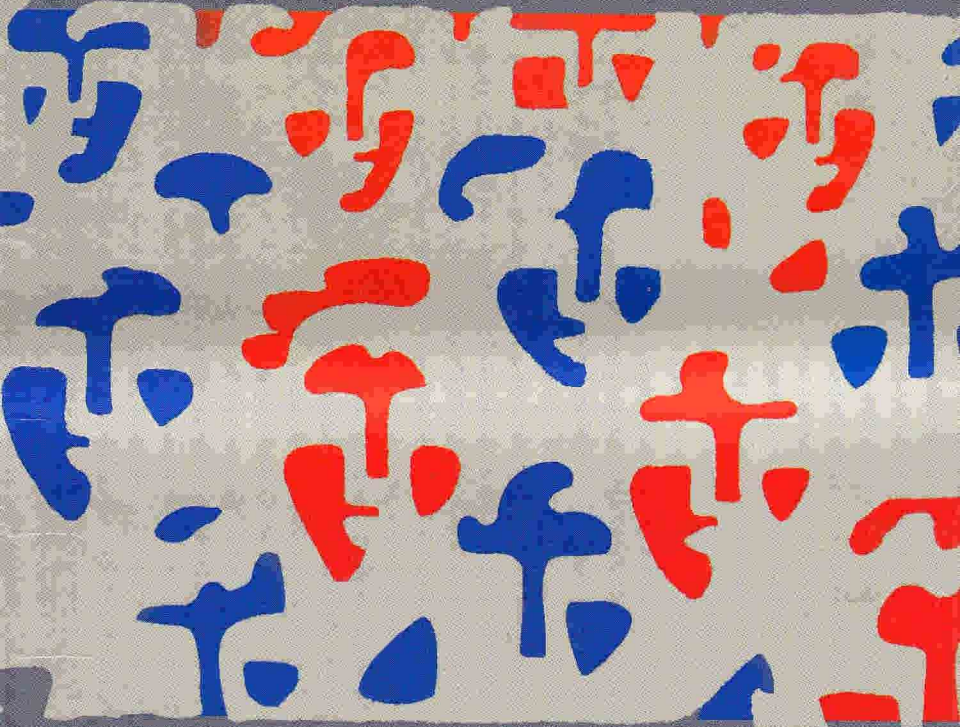

অনুবাদ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

সূচিপত্র

সাময়িক ব্যাপার	৯
মি. পীরজাদা যখন রাতে খেতে আসতেন	২৭
ইন্টারপ্রেটার অব ম্যালাডিজ	৪৩
একজন খাঁটি দারোয়ান	৬৫
সেক্সি	৭৫
মিসেস সেন	৯৮
আশীর্বাদধন্য বাড়ি	১১৮
বিবি হালদারের চিকিৎসা	১৩৫
তৃতীয় এবং শেষ মহাদেশ	১৪৮

সাময়িক ব্যাপার

নোটিশে জানানো হয়েছে যে, ব্যাপারটা সাময়িক—পরবর্তী পাঁচ দিন রাত আটটা থেকে এক ঘণ্টার জন্যে বিদ্যুৎ থাকবে না। তুষারঝড়ে একটি লাইন খারাপ হয়ে গেছে এবং বিদ্যুৎকর্মীরা তা ঠিক করতে সন্ধ্যার এই সময়টা বেছে নিয়েছে। তাদের কাজের সময় বৃক্ষশোভিত রাস্তার পাশের বাড়িগুলোই শুধু বিদ্যুৎবিহীন থাকবে। এ রাস্তাটি এক সারি দোকান ও ট্রলি স্টপেজের কাছেই, যেখানে শোভা ও সুকুমার তিন বছর ধরে বাস করছে।

নোটিশটি জোরে জোরে পাঠ করে শোভা স্বীকার করলো, "তারা যে আমাদের সতর্ক করেছে, এটাই বড় কথা।" সুকুমারের চাইতে ব্যাপারটা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সে কাঁধে ঝুলানো চামড়ার ব্যাগটা করিডোরে নামিয়ে রেখে কিচেনে গেল। ঘামে ভেজা ধূসর প্যান্টের উপর নেভি-ব্লু পপলিনের রেইনকোট চাপানো, পায়ে সাদা জুতা। দেখে মনে হয় তার বয়স তেত্রিশ বছর। তার ধরণের মহিলাদের বয়স অনুমান করা মুশকিল। এ রকম দাবিও সে করেছে এক সময়।

জিমনেসিয়াম থেকে ফিরেছে সে। তার ঠোঁটের কালচে লাল লিপস্টিক এখন শুধু তার মুখের বাইরের দিকে দেখা যাচ্ছে এবং কাজলের রেখা কয়লার দাগের মতো চোখের নিচের পাতায় লেপ্টে আছে। সুকুমার ভাবে কখনো কখনো তাকে এরকমই দেখা যায় পার্টি থেকে বা রাতে বার থেকে ফেরার পর। কারণ তখন সে অ্যালসেমির কারণে মুখ ধোয় না এবং সুকুমারের গায়ে ঢলে পড়তে বেশি আগ্রহী থাকে। সে টেবিলে একগুচ্ছ চিঠি রাখলো সেগুলোর উপর চোখ না বুলিয়েই। তার চোখ তখনো আরেক হাতে ধরা নোটিশের উপর নিবদ্ধ। "এ ধরণের মেরামতের কাজ তো তাদের দিনের বেলায় করার কথা।"

"তুমি বলতে চাও, যখন আমি ঘরে থাকব?" সুকুমার বললো, চুলায় ভেড়ার মাংস চাপানো পাত্রের উপর কাঁচের ঢাকনাটা বসিয়ে দিল ঠিকমত, যাতে বাষ্পের খুব সামান্যই নির্গত হতে পারে। গত জানুয়ারি থেকে সে বাড়িতে বসে কাজ করছে। ভারতে কৃষি বিপ্লবের উপর তার থিসিসের শেষ অধ্যায়গুলো চূড়ান্ত করতে চেষ্টা করছে। সে জানতে চাইলো, "রিপেয়ারের কাজ কখন শুরু হবে?"

"নোটিশে বলা হয়েছে উনিশে মার্চ থেকে। আজ কি মার্চের উনিশ?" শোভা ফ্রিজের পাশে বোর্ডের কাছে গেল, যেখানে উইলিয়াম মরিসের একটি ক্যালেন্ডার।

ওয়ালপেপার প্যাটার্নের। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালো সে, যেন প্রথমবার এটি দেখছে। ক্যালেন্ডারের উপরের অংশের প্যাটার্নের ছবি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করে সে নিচের দিকে সংখ্যার উপর চোখ ফেললো। ক্রিসমাস গিফট হিসেবে এক বন্ধু ডাকযোগে ক্যালেন্ডারটি পাঠিয়েছিল, যদিও শোভা ও সুকুমার সে বছর ক্রিসমাস উদ্‌যাপন করেনি।

'আজই তো', শোভা ঘোষণা করলো। "আচ্ছা, আগামি শুক্রবার তো ডেন্টিস্টের সঙ্গে তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট।"

দাঁতের উপর দিয়ে জিভ ঘুরিয়ে নিল সুকুমার। সকালে দাঁত ব্রাশ করতে ভুলে গেছে সে। এটাই প্রথম নয়। সেদিন সে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায়নি। আগের দিনও না। শোভা যতো বাইরে কাটাচ্ছে কাজে, যতো বেশি সময় দিতে শুরু করেছে অথবা অতিরিক্ত কোন উদ্যোগ নিচ্ছে, সুকুমার ততো বেশি সময় ঘরে থাকছে, এমনকি চিঠি আনতে যাচ্ছে না, ফল বা মদ কিনতেও যাচ্ছে না ট্রলি স্টপেজের কাছের দোকানে।

ছ'মাস আগে সেপ্টেম্বরে সুকুমার বাল্টিমোরে গিয়েছিল একটি একাডেমিক কনফারেন্সে যোগ দিতে। শোভার তখন প্রসবের সময় আসন্ন। কাঙ্ক্ষিত সময়ের তিন সপ্তাহ আগে। সে কনফারেন্সে যেতে চাচ্ছিল না, কিন্তু শোভাই পীড়াপীড়ি করে পাঠায়। যোগসূত্র স্থাপনের জন্যে কনফারেন্সটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ পরের বছরই তাকে চাকুরির প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। শোভা তাকে বলেছিল যে, সুকুমারের হোটেলের নম্বর এবং কনফারেন্সের কর্মসূচি, ফ্লাইট নম্বর সবকিছু তার কাছে আছে। জরুরি অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছে দেয়ার জন্যে সে তার বান্ধবী গিলিয়ানের সাথে কথা বলে রেখেছে। সেদিন সকালে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে ট্যাক্সি ক্যাব যখন বিদায় নিলো শোভা ঢিলেঢালা পোশাক পরা অবস্থায় দরজায় দাঁড়িয়ে এক হাত তুলে নাড়ছিল, আরেক হাত তার স্ফীত পেটের উপর, যেন স্ফীত অংশও তার শরীরের স্বাভাবিক অংশ।

শোভাকে গর্ভবতী অবস্থায় সর্বশেষ দেখার মুহূর্তের কথা সে যখনই ভাবে, তখন সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে ট্যাক্সি ক্যাবটির কথা। একটি স্টেশন ওয়াগন, লাল রং এর এবং নীল রং এ লিখা। তাদের নিজেদের গাড়ির তুলনায় সেটি গর্তের মতো। যদিও সুকুমারের উচ্চতা ছয় ফুট এবং জিনসের প্যান্টের পকেটে তার হাত দু'টি ঠিকভাবে রাখতে পারে না, সে পিছনের সিটে নিজেকে খাটো বামনের মতো অনুভব করেছে। ক্যাব বেকন স্ট্রিট দিয়ে দ্রুত অতিক্রম করার সময় সে কল্পনা করেছে যে, একদিন তাকে ও শোভাকে একটি স্টেশন ওয়াগন কিনতে হতে পারে। তাদের সন্তানদের মিউজিক স্কুলে, ডেন্টিস্টের কাছে আনা নেয়ার জন্যে। সে কল্পনা করে নিজে গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল আঁকড়ে আছে, শোভা পিছন দিকে ফিরে বাচ্চাদের জুস বক্স দিচ্ছে। এক সময় পিতৃত্বের এই কল্পনা সুকুমারের

চিন্তাকে বিঘ্নিত করতো, এটা তার বিদ্যমান উদ্বেগের অতিরিক্ত। কারণ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে এখনো সে ছাত্র। কিন্তু শরতের সেই সকালে, তখনো গাছগুলো ব্রোঞ্জের মতো পাতায় আচ্ছন্ন। প্রথমবারের মতো সে এ পরিবেশকে স্বাগত জানায়।

কনফারেন্স রুমে একজন স্টাফ মেম্বার তাকে খুঁজে পেয়ে একটি চিরকুট ধরিয়ে দেয়। তাতে একটি টেলিফোন নম্বর লিখা। সুকুমার জানে নম্বরটি হাসপাতালের। সে যখন বোস্টনে ফিরে এলো তখন সব শেষ হয়ে গেছে। মৃত শিশু প্রসব করেছে শোভা। হাসপাতালের ছোট্ট একটি কেবিনে ঘুমিয়ে ছিল সে। এতো ছোট্ট কেবিন যে, তার বেডের পাশে দাঁড়ানো কষ্টকর। তার গর্ভের ফুল অত্যন্ত দুর্বল ছিল এবং সিজার করতে হয়েছে। তাও দ্রুততার সাথে নয়। ডাক্তার ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। যথাসম্ভব অনুগ্রহের হাসি হাসলেন তিনি। এ ধরনের হাসি শুধু পেশাগতভাবে পরিচিতদের প্রতিই সম্ভব। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শোভা উঠে দাঁড়াতে পারবে। ভবিষ্যতে সে আর সন্তান ধারনে সক্ষম হবে না, তেমন কোন আশঙ্কা নেই।

এখন সুকুমারের ঘুম থেকে উঠার সময়ের মধ্যে শোভা বেরিয়ে যায়। চোখ খুলে সে বালিশের উপর শোভার ঝরে পড়া দীর্ঘ কালো চুল দেখতে পায় এবং তার কথা ভাবে, পরিপাটি পোশাকে শহরের কেন্দ্রস্থলে অফিসে সে এখন তৃতীয় কাপ কফিতে চুমুক দিচ্ছে। যেখানে সে টেক্সট বই এর টাইপের ভুল অনুসন্ধান ও চিহ্নিত করে। ভুল চিহ্নিত করার পদ্ধতি একবার সে তাকে ব্যাখ্যা করেছিল রঙিন পেন্সিল দিয়ে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, সুকুমারের থিসিস প্রস্তুত হলে সে একইভাবে ভুল দেখে দেবে। শোভার কাজের বিশেষত্বের কারণে তার ঈর্ষা জাগে। নিজের স্বভাবকে পলায়নপর মনে হয়। মোটামুটি মেধার ছাত্র সে, কোন কৌতূহল ছাড়াই বিস্তারিত গ্রাস করতে পারে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সে নিবেদিত না হলেও পরিশ্রমী, গ্রন্থের অধ্যায়গুলো সারাংশ তৈরি, হলুদ দাগ দেয়া কাগজে যুক্তিগুলো টুকে রাখার ব্যাপারে অধ্যবসায়ী। কিন্তু এখন সে বিছানায় শুয়ে থাকবে বিরক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। তার পাশের ক্লোজেটের উপর চোখ পড়বে, যা শোভা সব সময় খানিকটা খোলা অবস্থায় রাখে। সেই সেমিস্টারে ক্লাস নিতে সে পশমি জ্যাকেট ও সুতির ট্রাউজারের সারি থেকে সে কোনটাই পরেনি। শিশুটির মৃত্যুর পর শিক্ষকতার দায়িত্ব থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেনি সে। তার এডভাইজার এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে স্প্রিং সেমিস্টারে নিজের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারে। গ্রাজুয়েট স্কুলে সুকুমারের ষষ্ঠ বছর চলছে। এডভাইজার বলেছেন, "স্প্রিং ও সামারে তুমি ভালো করবে। পরবর্তী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই তুমি সবকিছু গুছিয়ে ফেলতে সক্ষম হবে।" কিন্তু কোনকিছুতেই তাড়া অনুভব করছিল না সুকুমার। বরং সে ভাবছিল যে, সে এবং শোভা কি করে তাদের তিন বেডরুমের

বাড়িতে পরস্পরকে এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। যথাসম্ভব বেশি সময় পৃথক তলায় কাটিয়ে দিচ্ছে। সে ভাবছে কি করে সে সামনের উইকএন্ডের প্রতীক্ষা না করে থাকতে পারছে, যখন শোভা ঘন্টার পর ঘন্টা সোফায় তার রঙিন পেন্সিল ও ফাইল নিয়ে বসে কাজ করে, সে কারণে সুকুমার তার নিজ বাড়িতে একটি রেকর্ড বাজাতেও ভয় পায় যে, ব্যাপারটা কঠোর হতে পারে। সে ভাবে, শোভা তার চোখে চোখে তাকিয়ে হাসার পর কতোদিন কেটে গেছে অথবা দু'জন ঘুমানোর আগে এখনো যখন তারা পরস্পরের দেহে উপনীত হয় সেই দুর্লভ মুহূর্তে শোভা সর্বশেষ কবে ফিসফিস করে তার নাম উচ্চারণ করেছে।

শুরুতে সুকুমারের বিশ্বাস ছিল যে, শোভা এবং সে কোন না কোনভাবে সব জটিলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। শোভার বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর। সে কর্মক্ষম, আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এটা সান্ত্বনার ব্যাপার নয়। প্রায়ই এমন হয় যে, দুপুরের খাবারের সময় ঘনিয়ে এলে সুকুমার নিজেকে বিছানা থেকে টেনে তুলে এবং নিচতলায় কফিপট থেকে তার জন্যে শোভার রেখে যাওয়া কফি একটি শূন্য মগে ঢালে।

সুকুমার পিঁয়াজের ছালগুলো জড়ো করে আবর্জনার পাত্রে রাখে। ভেড়ার মাংসের উপরে লেগে থাকা চর্বি সে তুলে নিয়েছে। সিঙ্কের কলে পানি ছেড়ে ছুরি ও কাঠের বোর্ড ভিজায়। লেবুর টুকরা ঘষে রসুনের গন্ধ দূর করতে চেষ্টা করে। কৌশলটা সে শোভার কাছে শিখেছিল। সাড়ে সাতটা। জানালা দিয়ে সে আকাশ দেখলো, হালকা কালো প্রলেপের মতো। ফুটপাতের পাশে এলোমেলো বরফের স্তূপ, যদিও এখন লোকজন হাতমোজা ও টুপি ছাড়াই চলাফেরায় যথেষ্ট উষ্ণ অনুভব করে। গত ঝড়ে প্রায় তিনফুট উচু হয়ে তুষার পড়েছিল। ফলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত লোকজনকে চলতে হয়েছে সরু ট্রেঞ্চের মতো পথ ধরে। সুকুমার এক সপ্তাহ যে ঘর থেকে বের হয়নি তারও কারণ এটি। কিন্তু এখন ট্রেঞ্চ প্রশস্ত হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে বরফ গলে পানি রাস্তার পাশের গর্তে গড়িয়ে যাচ্ছে।

"আটটার আগে ভেড়ার মাংস সিদ্ধ হবে না", সুকুমার বললো। "আমাদেরকে হয়তো অন্ধকারেই খেতে হবে।"

"আমরা মোমবাতি জ্বালাতে পারি।" শোভা বললো। দিনের বেলায় চমৎকারভাবে বাধা বেনি খুললো, ফিতা খুলে জুতা ছাড়লো। "বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার আগেই আমি স্নান সেরে নিচ্ছি।" সে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে বললো, "আমি নিচে যাচ্ছি।"

সুকুমার শোভার ব্যাগ ও জুতা সরিয়ে রাখলো ফ্রিজের পাশে। সে আগে এমন ছিল না। কোট খুলে হ্যাঙ্গারে রাখতো, জুতা ক্লোজেটে রাখতো এবং বিল

এলেই যথাশীঘ্র পরিশোধ করতো। কিন্তু এখন সে বাড়িকে হোটেলের মতো মনে করছে। নীল ও মেরুন রং-এর তুর্কি কার্পেটের উপর হলুদ প্রিন্টের কাপড়ে মোড়া আর্মচেয়ারের বৈসাদৃশ্য নিয়ে শোভা আর মাথা ঘামায় না। বাড়ির পিছনের অংশে বেষ্টনী দেয়া পোর্চে চিকের উপর কৌচকানো সাদা ব্যাগ, যাতে ঝালর ভরা রয়েছে, এক সময় শোভা ভেবেছিল এগুলো দিয়ে পর্দা তৈরি করবে।

শোভা যখন স্নান করছিল, সুকুমার নিচতলার বাথরুমে গিয়ে সিঙ্কের নিচে রাখা বাক্সে একটি নতুন টুথব্রাশ দেখতে পেল। সস্তা, শক্ত ব্রাশ ব্যবহার করে সে মাড়িতে ব্যথা অনুভব করলো এবং বেসিনে রক্ত মিশ্রিত থুথু ফেললো। একটি ঝুড়িতে রাখা অনেকগুলো ব্রাশের একটি। দোকানে যখন সস্তায় বিক্রি হচ্ছিল তখন শোভা কিনেছিল যদি শেষ মুহূর্তে কোন অতিথি তাদের সাথে রাত্রিযাপনের সিদ্ধান্ত নেয় তার জন্যে।

শোভার বৈশিষ্ট্যই ওরকম। ভালো হোক আর মন্দ হোক বিস্ময় সৃষ্টি করার জন্যেই যেন সে। তার যদি কোন স্কার্ট বা পার্স পছন্দ হয়, তাহলে দু'টি করে কিনবে। বোনাসের অর্থ নিজের নামে পৃথক ব্যাংক একাউন্টে জমা রাখে। তাতে সুকুমার কিছু মনে করেনি। তার বাবার মৃত্যুর পর তার মা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। যে বাড়িতে সে বড় হয়েছে সে বাড়ি ছেড়ে সুকুমার কলকাতায় ফিরে যায়, যাতে সব গুছিয়ে নিতে পারে। শোভা যে একটু ভিন্ন ধরনের সুকুমারের তা ভালো লেগেছিল। শোভার আগেভাগে চিন্তা করার ক্ষমতায় সুকুমার অবাক হতো। সে যখন শপিং এ অভ্যস্ত হলো, তখন থেকে স্টোররুমে সব সময় বাড়তি অলিভ বা কর্ণ অয়েলের বোতল মজুত থাকতো, ইটালিয়ান না ইন্ডিয়ান খাবার রান্না হবে তার প্রস্তুতি হিসেবে। বিভিন্ন আকৃতি ও রং এর পাস্তার (ইটালিয়ান নুডলস) অসংখ্য প্যাকেট, বাসমতি চালের বস্তা, হে মার্কেটের মুসলিম কসাইদের দোকান থেকে কেনা ভেড়া বা বকরির মাংসের বড় বড় অংশ এনে কেটে টুকরো টুকরো করে অনেকগুলো প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে ফ্রিজে রাখা হতো।

এক শনিবার বাদ দিয়ে পরবর্তী প্রতি শনিবারে তারা দোকানের সারির মাঝ দিয়ে ঘুরত, যাতে সুকুমারও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। শোভা যত বেশি খাবার জিনিস কিনতো, সুকুমার অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শুধু দেখতো, ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে গেলে সুকুমার ব্যাগ হাতে তার পিছু পিছু হাঁটতো। দাঁত পড়েছে, কিন্তু দাড়ি গজায়নি এমন বয়সী ছেলেদের কাছে আদা, মিষ্টি আলু, আর্টিচোক কিনতে সে রোদের মধ্যে দরকষাকষি করতো, পাল্লায় ওজন করে কাগজের মোড়কে ভরে এক এক করে তুলে দিতো তার হাতে। ভিড়ের মাঝে ঠেলা ধাক্কা গায়ে মাখতো না সে, এমনকি যখন সে প্রেগন্যান্ট তখনো না। শোভা দীর্ঘাঙ্গী, প্রশস্ত কাঁধ এবং গুরু নিতম্বের কারণে তার ধাত্রীও আশ্বস্ত করেছিল যে, সন্তান ধারণের উপযুক্ত গঠন তার। বাড়ি ফেরার পথে গাড়ি মোড় ঘুরে চার্লস রো ধরলে তারা বিস্মিত হতো যে, কতো খাবার কিনেছে।

খাবার কখনো নষ্ট হওয়ার সুযোগ ছিল না। বন্ধুরা এলে শোভা তাদের খেয়ে যাওয়ার জন্যে বলতো এবং যে সব জিনিস ফ্রিজে ও বোতলে সংরক্ষণ করেছে সেগুলো দিয়ে খাবার প্রস্তুতিতে দিনের অর্ধেক সময় ব্যয় করতো। টিনজাত সস্তা জিনিস নয়, রোববারের ছুটিতে তৈরি নানা মশল্লা মিশ্রিত মরিচ ও চাটনি, টমেটো ও শুকনো ফল দিয়ে তৈরি খাবার পরিবেশন করতো। কিচেনের তাকে লেবেল লাগানো মশল্লার বোতলের সারি। যা তাদের পছন্দ হয়েছে সেগুলো কিনে পিরামিডের মতো স্তূপ করেছে; তাদের নাতিনাতনিদের সময় পর্যন্ত চলে যাওয়ার মতো। ইতোমধ্যে এগুলো খেয়ে শেষ করার কথা। সুকুমার মজুত খাবার থেকেই ধীরে ধীরে চালিয়ে যাচ্ছে। কাপ দিয়ে চাল মেপে নিয়ে দু'জনের জন্যে রান্না করছে; দিনের পর দিন ব্যাগ ভর্তি মাংসের বরফ ছাড়াচ্ছে। প্রতিদিন বিকেলে পাকপ্রণালীর পৃষ্ঠা উল্টিয়ে শোভার পেন্সিল দিয়ে দাগ দেয়া নির্দেশিকা অনুসরণ করতো, এক চা চামচের পরিবর্তে দু'চা চামচ ধনে। ছোলার বদলে মসুর ডাল। প্রতিটি রেসিপি'র পাশে তারিখ লিখা রয়েছে, যা দেখে বুঝা যায় কবে প্রথমবার সেই খাবারটা একত্রে খেয়েছে। ২ এপ্রিল, ফুলকপির সাথে সবজি। ১৪ জানুয়ারি, বাদাম ও কিসমিসের সাথে মুরগির মাংস। এসব খাবারের কথা তার আদৌ মনে নেই, কিন্তু শোভার প্রুফরিডারের হাতের স্পষ্ট লিখাগুলো আছে। সুকুমার এখন রান্না করাকে উপভোগ করে। এ কাজের মধ্যে অন্তত কর্মক্ষম বিবেচনা করে নিজেকে। সে যদি রান্না না করতো, তাহলে সে নিশ্চিত যে, শোভা এক বাটি শুকনো খাবার দিয়েই নৈশভোজ সেরে নিতো।

আজ রাতে বিদ্যুৎ নেই। তাদেরকে এক সাথেই খেতে হবে। কয়েক মাস ধরে তারা নিজেরা খাবার তুলে নিচ্ছে চুলা থেকেই। সুকুমার তার প্লেট নিয়ে পড়ার টেবিলে যায়, ঠাণ্ডা হতে দেয় এবং এরপর গোগ্রাসে গিলে। অন্যদিকে শোভা খাবার নিয়ে লিভিং রুমে গিয়ে টিভিতে খেলা দেখে অথবা রঙিন পেন্সিল দিয়ে ফাইলের প্রুফ কাটে।

সন্ধ্যায় কখনো কখনো শোভা সুকুমারের রুমে প্রবেশ করে। তার পদশব্দে সুকুমার হাতের উপন্যাসটা সরিয়ে টাইপ করতে শুরু করে। সুকুমারের কাঁধের উপর দু'হাত রেখে কম্পিউটারের নীল উজ্জ্বল স্ক্রিনের উপর তাকায়। দু'এক মিনিট পর উচ্চারণ করে, "অতো পরিশ্রম করো না" এবং বিছানার দিকে এগোয়। সারাদিনে এই একবারই শোভা সুকুমারকে খুঁজে নেয় এবং সুকুমার এই সময়টির জন্যে আতংকে থাকে। সে জানে, ব্যাপারটা এমন যা করতে শোভা নিজেকে বাধ্য করবে। রুমের চারদিকে তাকায় শোভা। গত গ্রীষ্মে তারা রুমটি সাজিয়েছিল কুচকাওয়াজরত হাঁস এবং বাঁশি ও ড্রাম বাজাচ্ছে এমন খরগোসের ছবি দিয়ে। আগস্টের শেষ দিকে জানালার পাশে তারা একটি বেবীকট বসায়, একটি সাদা টেবিল শিশুর কাপড়চোপড় রাখার ড্রয়ারসহ এবং নকশাদার কুশনযুক্ত রকিং চেয়ার। শোভাকে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনার আগেই সুকুমার সবকিছু খুলে

সরিয়ে ফেলে। দেয়ালে লাগানো খরগোস ও হাঁসের ছবিগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলে। রুমটি শোভার স্মৃতিকে যেভাবে বিক্ষত করে কিছু কারণে ঠিক সেভাবে সুকুমারকে ভাবায় না। জানুয়ারিতে সে যখন লাইব্রেরিতে তার কাজ শেষ করে, তখন ইচ্ছাকৃতভাবে সেই রুমে তার ডেস্ক বসায়, কারণ এ রুমে সে এক ধরনের সান্ত্বনা খুঁজে পায়, আরেকটি কারণ শোভা রুমটি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে।

সুকুমার কিচেনে ফিরে যায় এবং ড্রয়ার খুলতে থাকে। ছুরি, কাঁচি, ঘুটনি, চামচ এবং রসুন, লবঙ্গ ও এলাচ ছেঁচার জন্যে কলকাতার একটি বাজার থেকে শোভার কেনা হামানদিস্তার মধ্যে সে মোমবাতি খুঁজে পেতে চেষ্টা করে। একটি ফ্ল্যাশলাইট পেল সে। কিন্তু ব্যাটারি নেই। জন্মদিনে বাবহৃত মোমবাতির আধাপ্যাকেট পেল। গত মে মাসে তার জন্যে জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করে শোভা তাকে সারপ্রাইজ দিয়েছে। একশ বিশজন অতিথির আগমনে বাড়িটি গাদাগাদি হয়ে গিয়েছিল—সব বন্ধু এবং বন্ধুদের বন্ধুরা আমন্ত্রিত হয়েছিল, যারা এখন কৌশলে তাদের এড়িয়ে চলে। বাথটাবে বরফের মধ্যে রাখা হয়েছিল পানীয়ের বোতল। শোভার তখন পাঁচ মাস চলছে, সে মার্টিনির গ্লাসে হালকা পানীয় জিঞ্জার অ্যাল পান করছিল। কাস্টার্ড দিয়ে ভ্যানিলা ক্রিম কেক বানিয়েছিল শোভা। অতিথিদের মধ্যে হাঁটার সময় সে সারাক্ষণ সুকুমারের দীর্ঘ আঙুল নিজের আঙুলের সাথে আঁকড়ে রেখেছিল।

সেপ্টেম্বর থেকে তাদের একমাত্র অতিথি এসেছেন শোভার মা। অ্যারিজোনা থেকে তিনি আসেন এবং শোভা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর দু'মাস তাদের সাথে কাটান। প্রতি রাতে তিনি রান্না করতেন, নিজে ড্রাইভ করে সুপারমার্কেটে যেতেন, তাদের কাপড় ধুয়ে দিতেন। তিনি ধর্মপরায়ণ মহিলা। গেস্টরুমে বিছানার পাশে টেবিলের উপর তিনি ছোট্ট একটি বেদি বসিয়ে সেখানে স্থাপন করেন সুন্দর মুখশ্রীর দেবীর ফ্রেমে বাঁধানো ছবি এবং গাঁদা ফুলের পাঁপড়িপূর্ণ একটি পাত্র। দিনে দু'বার তিনি প্রার্থনা করতেন ভবিষ্যতে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নাতিনাতনি লাভের। সুকুমারের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন না হয়েও আন্তরিক ছিলেন। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের কাজ থেকে শেখা দক্ষতায় তিনি সুকুমারের সোয়েটার ভাঁজ করে রাখতেন। তার কোটের হারিয়ে যাওয়া বোতাম লাগিয়ে দিয়েছেন এবং ধূসর রং এর পশমি মাফলার বুনে কোন আনুষ্ঠানিকতা প্রকাশ না করেই উপহার দিয়েছেন, যেন এটি পড়ে গিয়েছিল এবং কেউ লক্ষ্য করেনি। শোভার ব্যাপারে তিনি কখনো তার সাথে কথা বলেননি। একদিন সে যখন শিশুর মৃত্যুর প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে তখন তিনি হাতের বোনা থেকে চোখ তুলে তাকিয়ে বলেন, "কিন্তু তখন তো তুমিও সেখানে ছিলে না।"

তার খটকা লাগলো যে, ঘরে জন্মদিনের মোমবাতি ছাড়া আর কোন মোমবাতি নেই। এ ধরনের সাধারণ জরুরি বিষয়ে শোভার প্রস্তুতি ছিল না। এখন সে জন্মদিনের মোমবাতিগুলো রাখার জন্যে জায়গা খুঁজে সিঙ্কের উপর জানালার পাশে লতানো গাছটির টবের মাটিতে রাখলো। গাছটি পানির ট্যাপের কয়েক ইঞ্চি দূরত্বে, কিন্তু টবের মাটি এতো শুকিয়ে আছে যে, প্রথমে মাটি ভিজাতে হবে, এরপরই তাতে মোমবাতি দাঁড় করানো সম্ভব। কিচেনের টেবিলের জিনিসগুলো একদিকে সরিয়ে দিলো; চিঠির স্তূপ, লাইব্রেরি থেকে আনা না পড়া বই। সেখানে তাদের প্রথম একসাথে খাবার কথা স্মরণ করলো; যখন তারা বিয়ে করবে বলে, শেষ পর্যন্ত একত্রে বাস করবে বলে উৎফুল্ল, রোমাঞ্চিত। তখন তারা একে অন্যের কাছে পৌঁছতে অধিক আগ্রহী থাকবে, খাওয়ার চাইতে বেশি আগ্রহ থাকবে প্রেম বিনিময়ে। বিয়ের উপহার হিসেবে লক্ষ্ণৌ থেকে তার এক কাকার পাঠানো সূচীকর্ম শোভিত মাদুর টেবিলে বিছিয়ে অতিথিদের জন্যে রাখা বিশেষ প্লেট ও মদের গ্লাস সাজিয়ে রাখলো। লতানো গাছটা রাখলো টেবিলের মাঝখানে। তারকাকৃতির পাতাগুলো ঘিরে দশটি ছোট মোমবাতি। ডিজিটাল রেডিও'র সুইচ অন করে একটি জাজ সঙ্গীতের স্টেশন স্থির করলো।

শোভা নিচতলায় এসে বললো, "এসব কি হচ্ছে?"

একটা মোটা টাওয়েলে তার চুল পেঁচানো ছিল। টাওয়েল খুলে চেয়ারের উপর রাখলো। তার ভিজা কালো চুল পিঠে ছড়িয়ে পড়লো। অন্যমনস্কভাবে চুলার দিকে এগুতে সে হাতে কয়েকটি চুল পেঁচিয়ে নিচ্ছিল। পরিষ্কার ট্রাউজার পরেছে শোভা, গায়ে টি-শার্ট এবং ফ্লানেলের গাউন। তার পেট আবার স্ফীত হয়েছে। নিতম্ব শুরু হওয়ার আগে তার কোমর সরু। গাউনের ফিতা হালকা গিট দিয়ে বাঁধা।

প্রায় আটটা বাজে। সুকুমার টেবিলে ভাত রাখলো। আগের রাতের ডাল মাইক্রোওয়েভ ওভেনে দিয়ে টাইমার ঠিক করলো। কাঁচের ঢাকনার উপর দিয়ে গাঢ় রং-এর তরকারির দিকে লক্ষ্য করে শোভা বললো, "তুমি ঝোলের তরকারি বানিয়েছো।"

সুকুমার ঢাকনা সরিয়ে এক টুকরা মাংস তুলে ক্ষিপ্রতার সাথে দুই আঙুল দিয়ে পরখ করলো যাতে গরমে ছ্যাকা না লাগে। এরপর একটি বড় চামচ দিয়ে মাংসের বড় একটি টুকরায় চাপ দিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলো যে, মাংস হাড্ডি থেকে সহজে ছাড়ানো যাবে কি না। সে উচ্চারণ করলো, 'হয়ে গেছে।'

মাইক্রোওয়েভের শব্দ উঠতেই বিদ্যুৎ চলে গেল এবং সঙ্গীত থেমে গেল।

"ঠিক সময়েই বিদ্যুৎ গেল।" শোভা বললো।

"আমি জন্মদিনের মোমবাতিগুলোই শুধু খুঁজে পেয়েছিলাম।" টবে রাখা মোমবাতি জ্বাললো সে। প্লেটের পাশে অবশিষ্ট মোমবাতি ও দিয়াশলাইটা রেখে দিলো।

"এটা কোন ব্যাপারই নয়।" মদের গ্লাসের উপর দিয়ে আঙুল ঘুরিয়ে বললো, "চমৎকার দেখাচ্ছে।"

শোভা কিভাবে বসেছে, মৃদু আলোয় সুকুমার তা বুঝতে পারে। চেয়ারের সামনের দিকে এগিয়ে বসেছে, পায়ের গোড়ালি আড়াআড়ি করে রাখা, টেবিলের উপর বাম কনুই। মোমবাতি খোঁজার সময়ই সুকুমার একটি বাক্সে মদের একটি বোতল পায়, তার ধারণা হয়েছিল বোতলটি খালি। বোতলটি দুই হাঁটুর মাঝে রেখে সে ছিপি খুলে। সে ভয় করেছিল, খোলার সময় মদ উপচে পড়বে, সেজন্যে গ্লাস হাতে নিয়ে কোলের খুব কাছে রেখেছিল মদ ঢালার সময়ে। নিজেরাই খাবার বেড়ে নিল তারা। কাঁটা চামচ দিয়ে ভাত নাড়ছিল, তরকারির মশল্লা, তেজপাতা, লবঙ্গ পৃথক করছিল। কয়েক মিনিট পরপর সুকুমার মোমবাতি জ্বালিয়ে টবে পুতে দিচ্ছিল। সুকুমারকে বারবার মোমবাতি জ্বালাতে দেখে শোভা বললো, 'ঠিক ভারতের মতো ব্যাপার। কখনো কখনো একটানা দীর্ঘ সময়ের জন্যে বিদ্যুৎ চলে যায়। একবার তো আমাকে পুরো অন্ধকারের মধ্যে একটি শিশুর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়েছিল। শিশুটি সারাক্ষণ শুধু কেঁদেছে। খাবারও নিশ্চয়ই খুব ঝাল ছিল।"

তাদের সন্তান কখনো কাঁদেনি, সুকুমার ভাবলো, তাদের সন্তানের কখনো অন্নপ্রাশন হবে না। যদিও শোভা অতিথিদের তালিকা তৈরি করে ফেলেছিল এবং সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল, তার ছেলে হলে ছ'মাসের মাথায় এবং মেয়ে হলে সাত মাস বয়সে সে ওর তিন ভাই এর মধ্যে কাকে বলবে সন্তানের মুখে ভাত তুলে দিতে।

'তোমার কি গরম লাগছে?' সুকুমার জানতে চাইলো। লতানো গাছের টবটি টেবিলের এক প্রান্তে বইগুলোর কাছে ঠেলে দিল, তাতে একে অন্যকে দেখতে আরো সমস্যা হলো। সহসা তার বিরক্তি লাগলো যে, সে উপরে গিয়ে কম্পিউটারের সামনে বসতে পারবে না।

"বাহ্, বেশ সুস্বাদু হয়েছে।" কাঁটা চামচ দিয়ে প্লেটে চাপ দিতে দিতে শোভা বললো। "সত্যি, চমৎকার।"

শোভার গ্লাসে আবার মদ ঢেলে নিল শোভা। সুকুমারকে ধন্যবাদ দিল সে।

আগে ওরা এমন ছিল না। এখন শোভার পছন্দনীয় কিছু বলার জন্যে তাকে যুদ্ধ করতে হবে, এমন কিছু যাতে সে প্লেট থেকে অথবা প্রুফরিডিং ফাইল থেকে চোখ তুলে তাকায়। শেষ পর্যন্ত তাকে উৎফুল্ল করার চেষ্টা ছেড়ে দেয় সে। নিরবতার মধ্যে বিরক্ত বা বিব্রত না হওয়ার কৌশল শিখে নিয়েছে সুকুমার।

"আমার মনে আছে, ঠাকুরমা'র বাড়িতে থাকার সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে আমরা সবাই কিছু একটা বলতাম।" শোভা বললো। সুকুমার তার মুখ প্রায় দেখতেই পাচ্ছে না। কিন্তু তার কণ্ঠ শুনেই সে বুঝতে পারে যে সে তার চোখ

কুঞ্চিত করে আছে, যেন দূরের কোন কিছু দেখার চেষ্টা করছে। এটা শোভার অভ্যাসের একটি।

'কি রকম?'

'আমি জানি না। একটি ছোট্ট কবিতা। একটি জোক। পৃথিবী সম্পর্কিত ব্যাপার। কিছু কারণে আমার আত্মীয়রা সবসময় চাইতেন, যাতে আমি তাদেরকে আমার আমেরিকার বন্ধুদের নাম বলি। আমি জানি না যে, এই তথ্যটা তাদের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন। আমার পিসির সাথে যখন শেষ দেখা হলো, তখন তিনি টাসকনে আমার সাথে এলিমেন্টারি স্কুলে পড়েছে এমন চারটি মেয়ের কথা বললেন। তাদেরকে এখন আমি প্রায় মনেই করতে পারি না।"

শোভা ভারতে যতোটা সময় কাটিয়েছে সুকুমার ততোদিন কাটায়নি। সুকুমারের বাবা মা নিউ হ্যাম্পশায়ারে থাকতেন এবং ভারতে গেলে তাকে রেখে যেতেন। প্রথমবার যখন সে ভারতে যায়, তখন সে শিশু এবং আমাশয় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। তার বাবা অল্পে ঘাবড়ে যাওয়ার মতো মানুষ, অতএব তাকে আবার ভারতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভীত থাকতেন যে, যদি কিছু ঘটে যায় এবং তাকে কনকর্ডে পিসি ও পিসের কাছে রেখে যেতেন। কৈশোর ও যৌবনের সূচনায় সুকুমার কলকাতায় যাওয়ার চাইতে সেইলিং ক্যাম্পে অংশ নিতে বা আইসক্রিম খেতে পছন্দ করতো। কলেজের শেষ বছরে তার বাবার মৃত্যু হয় এবং এরপরই শুধু দেশটির প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকে। দেশের ইতিহাস গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করে, যেন এটি তার নেয়া আরেকটি বিষয়। এখন তার মনে হয়, ভারতে তার নিজের শৈশবের কাহিনী আছে।

'চলো, আমরা তাই করি', হঠাৎ শোভা বলে উঠলো।

'কি করবো?'

'অন্ধকারে একে অন্যকে কিছু একটা বলি।'

'কি রকম? আমি কোন জোক জানি না।'

'না না জোক নয়' এক মুহূর্ত ভাবলো শোভা। 'আগে আমরা কেউ কাউকে বলিনি, এমন ধরনের কিছু বললে কেমন হয়?'

'হাইস্কুলে পড়ার সময় আমি এই খেলা খেলতাম' সুকুমারের স্মরণ হলো। 'আমি যখন মাতাল হয়ে যেতাম।'

'তুমি সত্য ভাবতে থাক অথবা সাহসী হও। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। ঠিক আছে, আমি শুরু করছি।' শোভা মদের গ্লাসে চুমুক দিলো। 'আমি প্রথমবার যখন একা তোমার অ্যাপার্টমেন্টে এলাম, তখন তোমার ঠিকানা লিখার নোটবুকটি খুলে দেখেছিলাম যে, আমার নামটা ওতে আছে কিনা। সম্ভবত দু'সপ্তাহ হয়েছিল আমাদের পরিচয়ের।'

'আমি কোথায় ছিলাম?'

'পাশের রুমে তুমি ফোন ধরতে গিয়েছিলে। তোমার মা ফোন করেছিলেন এবং আমার মনে হয়েছিল তোমাদের আলাপ দীর্ঘ হবে। আমি জানতে চেষ্টা করেছিলাম যে, তোমার সংবাদপত্রের মার্জিন থেকে আমাকে কতোটা গুরুত্ব দিয়েছো।'

'আমি কি তা করেছিলাম?'

'না। কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়িনি। এবার তোমার পালা।'

সে কিছু ভাবতে পারছিল না। কিন্তু শোভা সুকুমারের কথা শোনার অপেক্ষায় ছিল। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে তাকে মানসিকভাবে এতোটা দৃঢ় দেখা যায়নি। তাকে বলার কি আর অবশিষ্ট আছে? সে তাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা ভাবলো। সাক্ষাৎ হয়েছিল ক্যাম্ব্রিজের এক লেকচার হলে, যেখানে কিছু বাঙালি কবির আবৃত্তির অনুষ্ঠান ছিল। কাঠের ফোল্ডিং চেয়ারে পাশাপাশি বসেছিল। সুকুমারের শীঘ্র বিরক্তি ধরে যায়, কারণ সাহিত্যের দুর্বোধ্য শব্দের মর্মার্থ উদ্ধার তার কর্ম নয় এবং দর্শক-শ্রোতাদের সাথে কবিতার বিশেষ অংশ শোনার পর প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ ও মাথা ঝুঁকানোতে অংশ নিতেও পারছিল না। কোলের উপর রাখা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চোখ রেখে বিশ্বের বিভিন্ন নগরীর তাপমাত্রা দেখছিল সে। গতকাল সিঙ্গাপুরের তাপমাত্রা ছিল একানব্বই ডিগ্রি, স্টকহোমে একান্ন। যখন বামে মাথা ঘুরালো, তখন তার পাশেই উপবিষ্ট এক মহিলাকে দেখলো একটি কভারের পিছনে কেনাকাটার তালিকা তৈরি করতে এবং সে দেখলো যে মহিলাটি সুন্দরী।

'ঠিক আছে', স্মরণ হওয়ার পর সে মুখ খুললো। "আমরা প্রথমবার যখন একটা পর্তুগীজ রেস্টুরেন্টে ডিনারে গেলাম, তখন আমি ওয়েটারকে বখশিশ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। পরদিন সকালে সেখানে ফিরে গিয়ে তার নামটা জেনে ম্যানেজারের কাছে তার জন্যে টাকা রেখে এসেছিলাম।"

"শুধুমাত্র ওয়েটারকে বখশিশ দেয়ার জন্যে তুমি সামারভিল পর্যন্ত এতোটা পথ ফিরে গিয়েছিলে?"

"আমি একটা ট্যাক্সি ক্যাব নিয়েছিলাম।"

"ওয়েটারকে বখশিশ দিতে ভুললে কেন?"

জন্মদিনের মোমবাতিগুলো নিভে গেছে। কিন্তু সুকুমার অন্ধকারের মধ্যেও শোভার মুখ পরিষ্কার অনুমান করতে পারে, টানা আয়ত চোখ, আঙ্গুরের মতো টসটসে ঠোঁট, দু'বছর বয়সে উঁচু চেয়ার থেকে পড়ে যাওয়ায় থুতনি কেটে যে দাগটা হয়েছিল এখনো তা বুঝা যায়। প্রতিদিন সুকুমার লক্ষ্য করে, এক সময় শোভার যে সৌন্দর্য তাকে বিমোহিত করেছিল, তা ম্লান হয়ে গেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কসমেটিকস ব্যবহার যেন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে; তার সৌন্দর্য বিকাশের জন্যে নয়, কোনভাবে সৌন্দর্য ধরে রাখার জন্যে।

'সেদিন খাওয়ার পর আমার মাঝে মজার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারি' সুকুমার প্রথমবারের মতো ব্যাপারটা নিজের কাছে এবং শোভার কাছেও স্বীকার করলো। 'নিশ্চয়ই আমি বিহবল হয়ে পড়েছিলাম।'

শোভা বরাবর যখন ঘরে ফিরে পরদিন রাতে তার চাইতে আগে ফিরলো। আগের রাতের মাংস রয়ে গিয়েছিল এবং সুকুমার মাংসটা গরম করলো, যাতে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে তারা খেতে পারে। সেদিন বরফের মধ্য দিয়েই সে বাইরে গিয়েছিল এবং কোনার দোকান থেকে এক প্যাকেট মোমবাতি ও ফ্লাশলাইটের ব্যাটারি কিনে এনেছিল। পদ্মের আকৃতির মোমদানিতে সে মোমবাতিগুলো সাজিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তারা টেবিলের উপরে সিলিং থেকে ঝুলানো বাতির আলোতেই খেলো।

খাওয়া শেষ হলে সুকুমার দেখে অবাক হলো যে, শোভা তার প্লেটের উপর নিজেরটা রেখে সেগুলো ধোয়ার জন্য সিঙ্কের কাছে নিচ্ছিল, সুকুমার ধারণা করেছিল যে, শোভা লিভিংরুমে তার ফাইলের স্তূপ নিয়ে বসবে। সে প্লেটগুলো তার হাত থেকে নিয়ে বললো, 'এগুলো নিয়ে ভেবো না।'

স্পঞ্জে তরল ডিটারজেন্ট ঢেলে শোভা বললো, 'কাজটা না করলে কেমন দেখায়। প্রায় আটটা বাজে।'

সুকুমার সচকিত হলো। সারাদিন সুকুমার বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার অপেক্ষা করেছে। আগের রাতে শোভা তার ঠিকানা লিখার নোটবুকটার উল্লেখ করেছিল, তা নিয়ে সে ভেবেছে। তখন সে কেমন ছিল তা স্মরণ করে শোভার ভালো লাগবে। প্রথম যখন তাদের দেখা হলো তখন শোভা নার্ভাস হলেও কতোটা সাহসী ছিল, কতোটা আশাবাদী ছিল। সিঙ্কের সামনে তারা পাশাপাশি দাঁড়ালো। জানালায় তাদের অবয়বের প্রতিফলন হয়েছে। সুকুমার একটু লজ্জিত হলো, ঠিক যেভাবে প্রথমবার একত্রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে লজ্জা অনুভব করেছিল। সর্বশেষ কবে তারা একসাথে ছবি তুলেছে সে স্মরণ করতে পারে না। ক্যামেরার ফিল্মে এখনো শোভার ছবি আছে, যেগুলো চত্বরে তুলেছিল সে যখন প্রেগন্যান্ট ছিল তখন।

প্লেট ধোয়ার পর তারা টাওয়েলের দুই প্রান্ত দিয়ে হাত মুছলো। আটটার সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল। সুকুমার মোমবাতির সলতে জ্বালালো। মোমবাতির দীর্ঘ, স্থির শিখা দেখে তার ভালো লাগলো।

'চলো, বাইরে বসি' শোভা বললো। 'মনে হয়, বাইরে এখনো বরফ।' তারা দু'জনে একটি করে মোমবাতি হাতে নিয়ে সিঁড়িতে বসলো। মাটিতে তখনো জমাট বাঁধা বরফ, সে অবস্থায় বাইরে বসাটা বেমানান। কিন্তু আজ রাতে সবাই বাড়ির বাইরে, নির্মল বাতাস লোকজনকে ব্যস্ত রাখার জন্যে যথেষ্ট। পড়শিদের বাড়ির দরজা খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। ফ্লাশলাইট হাতে সামনে দিয়ে অতিক্রম করছে পড়শিদের কেউ কেউ।

'আমরা বুকস্টোরে যাচ্ছি, ব্রাউজ করতে।' রূপালি চুলের লোকটি বললো। স্ত্রীর সাথে হাঁটছিল সে। শীর্ণদেহী মহিলা, একটি কুকুরের বেল্ট হাতে। ওরা ব্র্যাডফোর্ড দম্পতি। গত সেপ্টেম্বরে তারা শোভা ও সুকুমারকে সহানুভূতি জানিয়ে একটি কার্ড পাঠিয়েছিল। লোকটি বললো, 'শুনেছি, ওখানে বিদ্যুৎ আছে।'

'তারা ভালো অবস্থায় আছে তাহলে।' সুকুমার বললো, 'তা না হলে তোমাদেরকে তো অন্ধকারে ব্রাউজ করতে হবে।'

মহিলাটি হাসলো। একটি হাত চালান করে দিল স্বামীর কনুই এর ভাঁজে। 'আমাদের সাথে যাবে।'

'না ধন্যবাদ।' শোভা ও সুকুমার এক সাথে বললো। সুকুমার অবাক হলো যে, শব্দগুলো শোভার উচ্চারণের সাথে মিশে গেছে। সুকুমার ভেবে পাচ্ছে না যে, এই অন্ধকারে শোভা তাকে কি বলবে। সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটাও ইতোমধ্যে তার মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে। একজনের সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। হতে পারে যে, শোভা ভাবছে তার বয়স পয়ত্রিশ বছর হওয়া সত্ত্বেও এখনো ছাত্র। বাল্টিমোরে চলে যাওয়ার ঘটনায় তার মায়ের মতো সেও তাকে দোষারূপ করতে পারে। কিন্তু সুকুমার নিজেই তো আশ্বস্ত যে, এগুলো ঠিক নয়। শোভাও তার মতই বিশ্বস্ত ছিল। সুকুমারের উপর তার বিশ্বাস ছিল। শোভাই তো তাকে বাল্টিমোরে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেছিল। তারা একে অন্যের বিষয়গুলো জানে না এমন কি থাকতে পারে ? সে জানে, ঘুমানোর সময় শোভা শক্ত করে তার আঙুলগুলো আঁকড়ে থাকে। দুঃস্বপ্ন দেখার সময় সে এপাশ ওপাশ করতো। তার মনে আছে, হাসপাতাল থেকে তাদের ফিরে আসার পর শোভা ঘরে ঢুকেই প্রথম যে কাজটি করেছে তা হলো তাদের সাজানো সবকিছু তুলে করিডোরে স্তূপ করেছে। শেলফ থেকে বইগুলো নামিয়েছে, জানালার পাশ থেকে ফুলের টব, দেয়ালে টানানো পেইন্টিং, টেবিল থেকে ফটো, বাসনকোসন নামিয়েছে চুলার উপর দেয়ালের হুক থেকে। এসব করতে শোভাকে বাধা দেয়নি সুকুমার। রুমে রুমে গিয়ে শোভা যে কাজগুলো একের পর এক করছিল, সে শুধু তা প্রত্যক্ষ করেছে। যখন সে নিজের কাছে পরিতৃপ্ত হয়েছে, তখন তার সৃষ্ট স্তূপের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার ঠোঁটে এতো বিতৃষ্ণার ছাপ যে, সুকুমারের মনে হয়েছে সে থুথু ফেলবে। কিন্তু তা না করে সে কাঁদতে শুরু করে।

সিঁড়িতে বসতেই সুকুমার ঠাণ্ডা অনুভব করতে শুরু করেছিল। তার মনে হলো, শোভারই প্রথম কথা বলা উচিত। শেষ পর্যন্ত সে বললো, "সেবার যখন তোমার মা এলেন, এক রাতে আমি বললাম যে, আমাকে অধিক রাত পর্যন্ত কাজে থাকতে হবে। আসলে আমি গিলিয়ানের সাথে বাইরে গিয়ে মার্টিনি পান করেছিলাম।" সুকুমার তার দিকে তাকালো, খাড়া নাক, পুরুষালি ধরনের চোয়াল। সে রাতটির কথা সুকুমারের ভালোভাবে স্মরণ আছে, মায়ের সাথে রাতে খেয়েছে, পরপর দু'টি ক্লাস নিয়ে সে খুবই ক্লান্ত ছিল। সে আশা করছিল, শোভা

কাছে এসে কিছু ভালো কথা বলবে। কারণ সুকুমার খুব বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরে আসে। তার পিতা মারা গেছেন বার বছর গত হয়েছে এবং তার মা এসেছেন তাদের সাথে সপ্তাহ দু'য়েক কাটানোর জন্যে। অতএব তাদের দু'জনেরই কর্তব্য তার বাবার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানানো। প্রতি রাতে তার মা সেই খাবারগুলোই রান্না করতেন, যেগুলো বাবা পছন্দ করতেন। কিন্তু খাবারগুলো নিজে খেতেন না, বরং ভেঙে পড়তেন। শোভা তার হাত ধরে টানলে তার চোখ অশ্রুতে ভরে উঠতো। তখন শোভা বলেছে, 'খুবই মর্মস্পর্শী ব্যাপার।' এখন শোভাকে বারের ভেলভেটের সোফায় গিলিয়ানের সাথে বসা অবস্থায় কল্পনা করতে পারছে। মুভি দেখে ফেরার পথে তারা সেই বারে থামতো, শোভা তার অতিরিক্ত-জলপাই লাভ নিশ্চিত করতে এবং গিলিয়ান একটি সিগারেট ধরাতে। সুকুমার শোভার অভিযোগ এবং গিলিয়ানের সহানুভূতির কথা কল্পনা করতে পারে। গিলিয়ানই শোভাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল।

"এবার তোমার পালা" সুকুমারের ভাবনায় বাধা দিয়ে শোভা বললো। তাদের রাস্তার শেষ প্রান্তে সুকুমার ড্রিল মেশিনের শব্দ এবং বিদ্যুৎ কর্মীদের হাঁকডাক শুনতে পেল। রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধ বাড়িগুলোর অন্ধকারাচ্ছন্ন বহির্ভাগের দিকে তাকালো। জানালাগুলোর একটি মোমবাতির আলোতে উজ্জ্বল। ঘরের ভিতরে উষ্ণতা বিলানোর পরও বাড়ির উপরে চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে।

"কলেজে প্রাচ্য সভ্যতার উপর আমার পরীক্ষার সময় আমি নকল করেছিলাম।" সুকুমার বললো। "আমার শেষ সেমিস্টারের শেষ পরীক্ষা চলছিল। মাত্র কয়েক মাস আগে বাবা মারা গেছেন। আমার পাশের পরীক্ষার্থীর একটি নীল বই দেখলাম। সে আমেরিকান, খানিকটা বাতিকগ্রস্ত। ভালো উর্দু ও সংস্কৃত জানতো সে। প্রশ্নপত্রে একটি কবিতা অংশবিশেষ উল্লেখ করে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, এটি 'গজল' কি না; আমি কিছুতেই তা মনে করতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত তার উত্তরপত্রের দিকে উঁকি দিয়ে দেখে উত্তর লিখেছি।"

এ ঘটনা পনের পছর আগের। শোভাকে বলতে পেরে সে হালকা বোধ করছে। শোভা তার দিকে তাকালো। সুকুমারের মুখের দিকে নয়, তার জুতার দিকে—হরিণের চামড়ার পুরনো জুতা পরেছে সে চপ্পলের মতো। জুতার পিছনের অংশ পায়ের চাপে বসে গেছে। সে অবাক হয়ে ভাবছিল যে, এ ব্যাপারে শোভা প্রশ্ন করলে সে কি জবাব দেবে। শোভা তার হাত নিজের হাতে নিয়ে চাপ দিলো। তার শরীরের আরো কাছে ঘেঁষে বললো, "তুমি কেন এ কাজ করেছো, তা বলার প্রয়োজন নেই।"

রাত ন'টা পর্যন্ত তারা একসাথে বসে ছিল, বিদ্যুৎ আসার পূর্ব পর্যন্ত। রাস্তার উল্টো দিকের বাড়িগুলোর পোর্চ থেকে কিছু লোক হাততালি দিচ্ছিল। টেলিভিশনগুলো খুলে দেয়ার শব্দও আসছে। ব্র্যাডফোর্ড দম্পতি কোন্ আইসক্রিম

খেতে খেতে ফিরছে, তাদের দেখে হাত নাড়লো। শোভা সুকুমারও হাত নাড়লো। এরপর তারা উঠলো। এখনো তার হাত শোভার হাতে। তারা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলো।

কোন বাক্য বিনিময় না করেই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এই পর্যায়ে উপনীত হলো। যে ছোটখাট বিষয় নিয়ে একে অন্যকে আঘাত দিয়েছে বা পরস্পরকে হতাশ করেছে—সেসব তারা স্বীকার করে নিয়েছে। পরদিন সুকুমার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ভাবলো যে, শোভাকে সে কি বলবে। কিছু চিন্তা তাকে বিক্ষিপ্ত করছিল যে, সে কি বলবে, শোভা যে ফ্যাশন ম্যাগাজিনটির গ্রাহক একবার সুকুমার সেই ম্যাগাজিন থেকে একটি মেয়ের ছবি ছিঁড়ে ফেলে তার বই এর মধ্যে এক সপ্তাহ রেখেছিল। সে কি স্বীকার করবে যে, শোভা তাদের তৃতীয় বিবাহবার্ষিকীতে তাকে যে সোয়েটারটা কিনে দিয়েছিল সেটি সে নগদ দামে বেঁচে দিয়ে একটি হোটেলের বারে গিয়ে দিনে দুপুরে একা মদ পান করে মাতাল হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে শোভা তার ডিনারের জন্যে দশ পদের রান্না করেছিল। সোয়েটারের বিষয় মনে পড়ায় সে বিষাদগ্রস্ত হলো। মদ পরিবেশনকারীকে সে বলেছিল, "আমাদের বিয়ের বার্ষিকীতে আমার স্ত্রী একটি সোয়েটার দিয়েছিল।" অতিরিক্ত মদপানে ইতোমধ্যে তার মাথা ভারি হয়ে গেছে। পরিবেশনকারী উত্তর দেয়, "আর কি আশা করো তুমি? তুমি তো বিবাহিত।" সুকুমার নিজেও জানে না যে সে মহিলার ছবিটি কেন ছিঁড়ে রেখেছিল। ছবির মহিলা শোভার মতো সুন্দরী নয়। সাদা রং এর সূচীকাজে ভরা জামা পরা, মুখটা ফোলা ফোলা, শীর্ণকায় এবং পুরুষালি পা। তার অনাবৃত হাত উপরে তোলা এবং মাথার পাশে দু'হাতের মুষ্টি পাকানো, যেন নিজের কানে ঘুষি মারবে। এটি ছিল মোজার বিজ্ঞাপনের ছবি। শোভা তখন প্রেগন্যান্ট। তার পেট হঠাৎই এমন বিপুল হয়ে গেছে যে সুকুমার তাকে আর স্পর্শ করতে চায় না। প্রথম যখন সে ছবিটি দেখে তখন সে, শোভার পাশে শোয়া ছিল এবং তাকে পাঠরত অবস্থায় দেখছিল। পুনঃ ব্যবহার্য জিনিসের স্তূপের মধ্যে ম্যাগাজিনটি পেয়ে সে মহিলার ছবির পৃষ্ঠাটি যত সতর্কতার সাথে সম্ভব ছিঁড়ে নেয়। প্রায় এক সপ্তাহ সে প্রতিদিন ছবিটি অন্তত একবার হলেও দেখেছে। একটি নারীর জন্যে তার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠে, কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা এমন যে, এক বা দু'মিনিটের মধ্যে বিরক্তিতে পর্যবসিত হয়। ব্যাপারটা প্রায় দাম্পত্য বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল তাকে।

তৃতীয় রাতে সে শোভাকে সোয়েটার সম্পর্কে বললো, চতুর্থ রাতে বললো ছবির কথা। শুনে শোভা কিছুই বললো না; প্রতিবাদ জানালো না অথবা নিন্দা করলো না। শুধু শুনলো এবং আগের মতো তার হাতটা নিয়ে চাপ দিতে থাকলো। তৃতীয় রাতে শোভা সুকুমারকে বললো যে, একবার ক্লাস শেষ হওয়ার পর সুকুমার বিভাগীয় চেয়ারম্যানের সঙ্গে যখন কথা বলছিল তখন তার থুতনিতে খাবার লেগে

থাকতে দেখেও তাকে বলেনি। কোন কারণে তার উপর রেগে ছিল শোভা, অতএব সে যেভাবে চলছে চলুক। পরবর্তী সেমিস্টারে তার ফেলোশীপ বহাল রাখা জরুরি হলেও শোভা নিজের থুতনিতে আঙুল রেখে সুকুমারকে সতর্ক করেনি। চতুর্থ রাতে সে বলে যে, ইউতাহ'র সাহিত্য সাময়িকীতে সুকুমারের জীবনের একমাত্র প্রকাশিত কবিতাটি তার কখনো ভালো লাগেনি। শোভার সাথে সাক্ষাতের পর সে কবিতাটি লিখেছিল। তার কাছে কবিতাটি ভাবপ্রবণ মনে হয়েছে।

বাড়ি যখন অন্ধকার থাকে তখন কিছু একটা ঘটে যায়। তারা একে অন্যের সাথে কথা বলতে সক্ষম হয়। তৃতীয় রাতে রাতের খাবারের পর তারা একসাথে সোফায় বসে এবং অন্ধকার হওয়া মাত্র সুকুমার পাগলের মতো শোভার কপাল, মুখে চুমু দিতে শুরু করে। অন্ধকার সত্ত্বেও সে চোখ বন্ধ করে এবং জানে যে, শোভাও চোখ বন্ধ করে রেখেছে। চতুর্থ রাতে তারা অন্ধকারের মধ্যেই সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে এক সাথে উপর তলার শেষ ধাপ অনুভব করে বিছানায় যায় এবং এমন প্রাবলো মিলিত হয়, যা তারা ভুলে গিয়েছিল। শোভা নিঃশব্দে কাঁদলো এবং ফিসফিসিয়ে সুকুমারের নাম উচ্চারণ করলো। অন্ধকারেই আঙুল দিয়ে সুকুমারের ভুরু অনুভব করছিল। সুকুমার যখন নিঃশেষিত, তখন সে মনে মনে ভাবছিল যে, পরবর্তী রাতে শোভাকে কি বলবে এবং শোভাই বা তাকে কি বলতে পারে। এই চিন্তা তাকে উত্তেজিত করলো। সে বললো, "আমাকে জড়িয়ে ধরো, তোমার দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরো।" নিচতলায় বাতি জ্বলে উঠার সময়ের মধ্যে তারা ঘুমিয়ে পড়লো।

পঞ্চম রাতি শেষে সকালে সুকুমার চিঠির বাক্সে বিদ্যুৎ কোম্পানির আরেকটি নোটিশ পেল। বিদ্যুৎ লাইন নির্ধারিত সময়ের আগেই মেরামত করা সম্ভব হয়েছে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে। সে হতাশ হলো। শোভার জন্যে চিংড়ির মালাই তৈরির পরিকল্পনা করেছিল সে। কিন্তু দোকানে গিয়ে সুকুমারের সে ইচ্ছা তিরোহিত হলো। সে ভাবলো, বাতি যাবে না, জানার পর ব্যাপারটা আর আগের মতো নেই। দোকানের চিংড়িগুলো তার কাছে মনে হলো ফ্যাকাসে ও শুকনো। নারকেল দুধের টিন মনে হলো ধূলিময় এবং মূল্য বেশি। তবু সেগুলো কিনলো সে। এছাড়া নিলো একটি মোমবাতি ও দুই বোতল মদ।

শোভা বাড়ি ফিরলো সাড়ে সাতটায়। তাকে নোটিশটি পড়তে দেখে সুকুমার বললো, "আমার মনে হয়, আমাদের খেলা এখানেই শেষ।" শোভা তার দিকে তাকালো। "তুমি চাইলে এখনো মোমবাতি জ্বালাতে পারো।" আজ রাতে সে জিমনেশিয়ামে যাবে না। রেইনকোটের নিচে সে গরম জামা পরেছে। মুখের মেকাপে হয়তো খানিক আগেই আবার তুলির ছোঁয়া লাগাতে হয়েছে। শোভা যখন কাপড় পাল্টাতে উপর তলায় গেল, সুকুমার তখন নিজের জন্যে গ্লাসে মদ

ঢেলে একটি গানের রেকর্ড অন করলো। 'থেলোনিয়াস মঙ্ক এলবাম'। সে জানে শোভা এটা পছন্দ করে। শোভা উপর থেকে নামার পর দু'জন একসাথে খেলো। সে তাকে ধন্যবাদ দিলো না, বা শুভেচ্ছা জানালো না। মোমবাতির মৃদু আলোতে তারা শুধু খেলো। একটা কঠিন সময় কাটিয়ে এসেছে তারা। চিংড়ি সাবাড় করলো দু'জনে এবং এক বোতল মদ শেষ করে দ্বিতীয় বোতলে হাত দিলো। মোমবাতি জ্বলে প্রায় শেষ হওয়া পর্যন্ত একসাথে বসে রইলো উভয়ে। শোভা তার চেয়ারে গিয়ে বসলো, সুকুমার ভাবলো যে, শোভা কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু সে মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়ার পরিবর্তে উঠে দাঁড়ালো, বাতির সুইচগুলো অন করে আবার বসলো।

সুকুমার বললো, "আমরা কি বাতিগুলো নিভিয়ে রাখতে পারি না। শোভা তার প্লেট একপাশে সরিয়ে হাত জোড় করে টেবিলের উপর রাখলো। অত্যন্ত নরম সুরে বললো, "আমি যখন কথা বলবো, তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবে বলে আশা করি।"

সুকুমারের হৃদস্পন্দন বাড়তে শুরু করেছে। যেদিন শোভা তাকে বলেছে যে, সে আবার প্রেগন্যান্ট, সেদিনও সে এই শব্দগুলোই উচ্চারণ করেছিল এ রকম নম্রতার সাথেই। টেলিভিশনে বাস্কেটবল খেলা দেখা বন্ধ করে দিয়েছিল তার আগে। সে তখন অপ্রস্তুত ছিল, কিন্তু এখন কথা শোনার জন্যে প্রস্তুত। সুকুমার চায়নি যে, শোভা আবার প্রেগন্যান্ট হোক। আনন্দিত হবার ভান করতে চায়নি সে।

"আমি একটি অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছিলাম এবং পেয়েও গেছি।" কোন কিছুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শোভা বললো। মনে হলো, বাম কাঁধের পিছনের দিকে তার দৃষ্টি। সে বলছে, "আমাদের কারো দোষ নয়।" একত্রে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছে তারা। শোভা তার নিজের জন্যে কিছু সময়ের প্রয়োজন বলে মনে করছে। জামানত হিসেবে দেয়ার মতো অর্থ সে সঞ্চয় করেছিল। অ্যাপার্টমেন্টটি বেকন হিলে, যেখান থেকে হেঁটেই সে কাজে যেতে পারবে। সে রাতে বাড়ি ফেরার আগেই সে চুক্তি সই করে এসেছে।

শোভা সুকুমারের দিকে তাকায়নি, কিন্তু সুকুমার তার দিকে তাকিয়ে ছিল। এটা স্পষ্ট যে শোভা শুধু হিসাব কষেছে। সারাক্ষণ সে অ্যাপার্টমেন্টের সন্ধান করতো, পানির চাপ পরীক্ষা করতো, রিয়েল এস্টেট এজেন্টকে জিজ্ঞাসা করতো যে, শীতে হিটিং ও গরম পানির বিল ভাড়ার সঙ্গে যুক্ত কিনা। সুকুমার রীতিমতো বিরক্তি অনুভব করলো যে, শোভা সন্ধ্যাগুলো অতিবাহিত করেছে তাকে ছাড়া জীবনযাপনের প্রস্তুতির জন্যে। সে স্বস্তিবোধ করার পাশাপাশি বিরক্ত। গত চারটি সন্ধ্যা ধরে তাহলে সে একথাটা বলতেই চেষ্টা করেছে। এটাই ছিল তার খেলার উদ্দেশ্য।

এখন সুকুমারের কথা বলার পালা। কিছু ব্যাপার ছিল, সে প্রতিজ্ঞা করেছিল তাকে না বলার এবং গত ছ'মাস সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে বিষয়টি মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। আলট্রাসনোগ্রাম করার আগে শোভা ডাক্তারকে বলেছিল তাদের সন্তান ছেলে অথবা মেয়ে তা না জানাতে। সুকুমার তাতে সম্মত হয়েছিল। শোভা সন্তানটি চাইছিল একটি সারপ্রাইজ হিসেবে।

পরে, তারা কয়েক বার কথা বলেছে, কি ঘটেছে তা নিয়ে। শোভা বলেছে যে, অন্তত একটি ব্যাপারে তারা অজ্ঞ। এক্ষেত্রে শোভা তার সিদ্ধান্তের জন্যে কৃতিত্ব নিতো। কারণ এর ফলে তার একটি রহস্যের মধ্যে আশ্রয় নেয়ার ক্ষমতা জন্মেছিল। সুকুমার জানতো যে, শোভা তার জন্যেই রহস্যটার সৃষ্টি করেছে। বাল্টিমোর থেকে সে খুব বিলম্বে পৌছেছিল, যখন সবকিছু শেষ হয়ে গেছে এবং শোভা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। সন্তানকে দেখার জন্যে, তাকে দাহ করার আগে কোলে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট আগে ফিরেছিল। প্রথমে এই ধারণায় সে চমকে উঠেছিল, কিন্তু ডাক্তার বলেছিল যে, বাচ্চাকে কোলে নেয়ার ফলে তার শোক ভার লাঘবের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। শোভা ঘুমিয়ে ছিল। মৃত শিশুকে পরিচ্ছন্ন করা হলো। তার স্থগিত চোখের পাতা পৃথিবীর প্রতি চিরতরে অবরুদ্ধ।

সুকুমার বললো, "আমাদের সন্তান ছেলে ছিল, তার ত্বক বাদামি নয়, বরং লাল ছিল। মাথায় কালো চুল এবং ওজন ছিল প্রায় পাঁচ পাউন্ড। ওর আঙুল ভাঁজ করে বন্ধ অবস্থায় ছিল, ঠিক রাতের বেলায় তোমার আঙুল যেভাবে থাকে।"

শোভা এবার তার দিকে ফিরেছে। দুঃখের ছাপ শোভার মুখে। কলেজের পরীক্ষায় সুকুমার নকল করেছে, ম্যাগাজিন থেকে মহিলার ছবি ছিঁড়ে রেখেছে, একটি সোয়েটার বিক্রি করে দিয়ে দিনেদুপুরে মদপান করে মাতাল হয়েছে। এ বিষয়গুলোই তো সে শোভাকে বলেছে। সে তার পুত্রকে কোলে নিয়েছে, যার জীবন ছিল শুধুমাত্র শোভার দেহের অভ্যন্তরে, হাসপাতালের অজ্ঞাত এক কোনায় অন্ধকার রুমে তার বুকের সাথে মিশে। যতক্ষণ পর্যন্ত নার্স তাকে টোকা দিয়ে শিশুটিকে নিয়ে না গেছে, ততক্ষণ সুকুমার তাকে কোলে রেখেছিল। সেদিন সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এ ব্যাপারে শোভাকে কখনো বলবে না। কারণ তখনো শোভাকে সে ভালোবাসতো এবং তার জীবনে এটি একটি ব্যাপার ছিল যে সে নিজেই সারপ্রাইজ হতে চেয়েছিল।

সুকুমার উঠে তার প্লেট শোভার প্লেটের উপরে নিয়ে প্লেটগুলো সিঙ্কে নিয়ে রাখলো। কিন্তু ট্যাপ না খুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। বাইরের সন্ধ্যা তখনো উষ্ণ এবং ব্র্যাডফোর্ড দম্পতি হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। দম্পতিটির প্রতি লক্ষ্য করার মুহূর্তেই রুম অন্ধকার হয়ে গেল এবং ঘুরে হাত বাড়ালো। শোভা আলো নিভিয়ে দিয়েছে। টেবিলের কাছে এসে সে বসলো। একটু পরই তার সাথে যোগ দিলো সুকুমার। একসাথে তারা কাঁদলো। ইতোমধ্যে তারা যা জানে, সে জন্যে এই কান্না।

মি. পীরজাদা যখন রাতে খেতে আসতেন

১৯৭১ সালের শরৎ কালে এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে আসতেন। তার পকেটে চকোলেট থাকতো এবং তার পরিবারের সদস্যরা বেঁচে আছে কিনা অথবা মারা পড়েছে সে সম্পর্কিত আশা বা হতাশা। তার নাম মি. পীরজাদা। ঢাকা থেকে তিনি এসেছেন, এখন বাংলাদেশের রাজধানী—যা তখন পাকিস্তানের অংশ ছিল। সে বছর পাকিস্তান গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। দেশটির পূর্বাঞ্চল, যেখানে ঢাকা অবস্থিত, সে অংশ পশ্চিমাঞ্চলের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়ছিল স্বাধীনতার জন্যে। মার্চ মাসে ঢাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। পাকিস্তানি বাহিনী শহরে অগ্নিসংযোগ ও গোলাবর্ষণ করে। শিক্ষকদের টেনে রাস্তায় বের করে গুলী করা হয়। মহিলাদের ব্যারাকে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়। গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ তিন লাখ লোক নিহত হয়েছে বলে বলা হয়। ঢাকায় মি. পীরজাদার একটি তিনতলা বাড়ি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার তিনি এবং সেখানে আছে তার বিশ বছর ধরে বিবাহিতা স্ত্রী ও ছয় বছর থেকে ষোল বছর বয়সের সাতটি কন্যা, যাদের প্রত্যেকের নামের আদ্যক্ষর 'আ'। একদিন তিনি বলেছিলেন, 'এটা ওদের মায়ের ইচ্ছা।' পকেট থেকে একটি সাদাকালো ছবি বের করে দেখিয়েছেন। সাত মেয়ের পিকনিকের ছবি, সবার চুল বেনি করে ফিতা দিয়ে বাধা, এক সারিতে পা আড়াআড়ি করে বসে কলার পাতায় মুরগির তরকারি খাচ্ছে। 'কি করে আমি ওদেরকে আলাদা করবো ? আয়েশা, আমিরা, আমিনা, আজিজা—আমার সমস্যাটা নিজেই ভেবে দেখো।'

মি. পীরজাদা প্রতি সপ্তাহে তার স্ত্রীকে চিঠি লিখেন এবং সাত কন্যার প্রত্যেকের জন্যে কমিক বই পাঠান। কিন্তু ঢাকায় অন্যান্য সবকিছুর মতো ডাক ব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছে। ছ'মাসের বেশি হয়ে গেছে পরিবারের কোন খবর তিনি পাননি। ইতোমধ্যে আমেরিকায় পীরজাদার এক বছর কেটেছে। নিউ ইংল্যান্ডে গাছের পাতার উপর পড়াশুনার জন্যে পাকিস্তান সরকার তাকে একটি বৃত্তি দিয়েছে। বসন্ত ও গ্রীষ্মে তিনি ভারমন্টও মেইনে এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ শেষ করেছেন এবং শরতে তিনি বোস্টনের উত্তরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন, যেখানে তিনি তার সংগৃহীত তথ্যগুলো দিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন। আমরা এ এলাকাতেই বাস করি। তিনি যে বৃত্তি লাভ করেছেন সেটি অত্যন্ত সম্মানজনক, কিন্তু ডলারের অংকে হিসাব করলে খুব আকর্ষণীয় নয়। সেজন্যে পীরজাদা

গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্যে নির্ধারিত ডরমিটরির একটি রুমে বাস করেন। সেখানে রান্না করার চুল্লি নেই এবং নিজের টেলিভিশনও নেই। অতএব তিনি রাতে আমাদের বাড়িতে খেতে ও টিভি'র খবর শুনতে আসতেন।

প্রথমে তার আগমনের কারণ সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। আমার বয়স দশ বছর এবং আমার বাবা মা যে মি. পীরজাদাকে আমাদের সাথে খাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাতে আমি বিস্মিত হইনি। বাবা মা ভারতীয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের পরিচিত ভারতীয়ের সংখ্যা অনেক। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি ছোট। ইটের সরু পায়ে চলার পথ, সাদা রং এর পিলার শোভিত অট্টালিকা। অট্টালিকাগুলোর প্রান্তিক অবস্থানের কারণে ক্যাম্পাসকে ছোটখাটো শহরের মতো মনে হয়। সুপারমার্কেটে সরিষার তেল পাওয়া যায় না, ডাক্তাররা বাড়িতে এসে রোগী দেখে না, আমন্ত্রণ ছাড়া প্রতিবেশীরা কারো বাড়ি যায় না এবং এসব বিষয় নিয়ে আমার বাবা মা সুযোগ পেলেই অভিযোগ করেন। দেশী লোকের সন্ধান পেতে তারা প্রতি সেমিস্টারের শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিফোন ডাইরেক্টরির পৃষ্ঠার উপর আঙুল দিয়ে পাতি পাতি করে খোঁজেন, তাদের অংশের পৃথিবীর পরিচিত নাম পেলে তাতে দাগ দিয়ে রাখেন। এই পদ্ধতিতেই তারা মি. পীরজাদাকে আবিষ্কার করে তাকে ফোনে আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করেছেন।

আমাদের বাড়িতে মি. পীরজাদার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারের আগমনের কথা আমার মনে পড়ে না। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমাদের লিভিংরুমে তার উপস্থিতির সাথে আমি এতো পরিচিত ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিলাম যে, এক সন্ধ্যায় আমি যখন পানির পাত্রে বরফের টুকরা তুলে দিচ্ছিলাম তখন মাকে চতুর্থ একটি গ্লাস কাপবোর্ড থেকে আমার হাতে দিতে বললাম, কারণ কাপবোর্ডের তাকটা আমার হাতের নাগালের চাইতে উঁচু ছিল। মা চুলার কাছে ব্যস্ত। মূলার টুকরার সাথে সবজি ভাজছিলেন। আমার কথা তিনি শুনতে পাননি এগজস্ট ফ্যান ও সবজি নাড়াচাড়া করার শব্দের কারণে। বাবার দিকে ফিরলাম। তিনি রেফ্রিজারেটরের সামনে ঝুঁকে মশলা মিশ্রিত কাজু বাদাম চিবুচ্ছেন।

'কি হয়েছে লিলিয়া?'

'ভারতীয় লোকটির জন্যে একটি গ্লাস লাগবে?'

'পীরজাদা সাহেব আজ আসবেন না। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, পীরজাদা সাহেব ভারতীয় নন।' তার কালো দাড়িতে লেগে থাকা লবণের গুড়ো ঝেড়ে বাবা বললেন। দেশ ভাগের পর তিনি আর ভারতীয় নন। ১৯৪৭ সালে আমাদের দেশ বিভক্ত হয়েছে।'

যখন আমি বললাম যে, আমি মনে করেছি তখন বৃটেনের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময়, বাবা বললেন, 'তাও ঠিক। যে মুহূর্তে আমরা স্বাধীন হয়েছি, তখনই আবার আমাদেরকে কেটে টুকরো করা হয়েছে।' তিনি ব্যাখ্যা করলেন আঙুল দিয়ে একটি 'এক্স' এঁকে এবং বললেন 'পিঠা কেটে ভাগ

করার মতো। এখানে হিন্দু, ওখানে মুসলমান। ঢাকা আর আমাদের নয়।' বাবা আমাকে আরো বললেন যে, দেশভাগের সময় হিন্দু ও মুসলমান একে অন্যের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। অনেকের কাছে এখনো পরস্পর একসাথে খাওয়ার কল্পনা অচিন্তনীয় ব্যাপার।

আমার কাছে এটা অর্থহীন মনে হলো। মি. পীরজাদা এবং বাবা একই ভাষায় কথা বলেন, অভিন্ন জোকস শুনে হাসেন, দেখতে প্রায় একই রকম। খাবার সময় আমের আচার খান, প্রতি রাতে হাত দিয়ে তুলে ভাত খান। রুমে প্রবেশের আগে বাবা মা'র মতো মি. পীরজাদা জুতা খুলে রাখেন। খাওয়ার পর হজমি চিবান, কোন ধরনের মদ পান করেন না, চায়ের মধ্যে বিস্কুট ভিজিয়ে খান। তবু বাবা আমাকে পীড়াপীড়ি করেন, যাতে আমি পার্থক্যটা বুঝতে পারি। তার ডেস্কের উপরে দেয়ালে লাগানো বিশ্ব মানচিত্রের কাছে নিয়ে গেলেন আমাকে। তাকে যথার্থই উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল যে, আমি যদি দুর্ঘটনাবশত তাকে ভারতীয় বলে ফেলি তাতে মি. পীরজাদা বিব্রত হতে পারেন, যদিও আমি কখনো কল্পনাও করিনি যে, মি. পীরজাদা কোন ব্যাপারে খুব বিব্রত হতে পারেন। বাবা আমাকে জানালেন, 'পীরজাদা সাহেব বাঙালি, কিন্তু তিনি মুসলিম। সে জন্যে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে বাস করেন, ভারতে নয়।' তার আঙুল আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে ইউরোপ, ভূ-মধ্যসাগর, মধ্যপ্রাচ্যের উপর দিয়ে একটি কমলা রং এর হীরকাকৃতির স্থানে স্থির হলো, যে স্থানটিকে দেখিয়ে একদিন মা বলেছিলেন যেন কোন নারী শাড়ি পরে তার বাম হাত প্রসারিত করে রেখেছে। বিভিন্ন নগরীর অবস্থানের উপর গোল দাগ দেয়া এবং সেগুলোকে রেখা টেনে যুক্ত করা হয়েছে এটা বুঝানোর জন্যে যে, বাবা মা এসব স্থানে গেছেন। তাদের জন্মস্থান কলকাতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে একটি ছোট রূপালি তারকা বসিয়ে। আমি একবার কলকাতায় গেছি এবং সে ভ্রমণের কোনকিছুই আমার মনে নেই। বাবা বললেন, 'তুমি দেখতে পাচ্ছো লিলিয়া, এটি ভিন্ন একটি দেশ, ভিন্ন রং।' মানচিত্রে পাস্তিানের রং হলুদ, কমলা রং নয়। আমি লক্ষ্য করলাম যে, দেশটির দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক অংশ। এক অংশ অন্যটির চাইতে অনেক বড়, মাঝখানে বিশাল ভারতীয় ভূ-খণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন, যেন ক্যালিফোর্নিয়া এবং কানেকটিকাট যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একটি রাষ্ট্র গঠন করেছে।

বাবা আমার মাথার উপর হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আঘাত করে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই এখনকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানো? পূর্ব পাকিস্তান যে সার্বভৌমত্বের জন্যে লড়ছে, তা জানো?"

পরিস্থিতির কিছুই যেহেতু জানি না, সেজন্যে মাথা নাড়লাম।

আমরা কিচেনে গেলাম। ভাতের মাড় গালিয়ে নিচ্ছেন মা। বাবা ক্যান খুলে আবার মুখে কাজু বাদাম পুরে চশমার ফ্রেমের উপর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "স্কুলে আসলে আমাকে কি শিখায়? তুমি কি ইতিহাস পড়ো? ভূগোল? 'লিলিয়াকে স্কুলে অনেক কিছু পড়তে হয়', মা উত্তর দিলেন। 'আমরা এখন এখানে

বাস করছি। আর সে এখানে জন্মেছে।' মনে হলো তিনি এ ব্যাপারে যথার্থই গর্বিত; যেন এসব আমার চরিত্রের প্রতিফলন। তার ধারণা, আমি যা জানি তা হচ্ছে, আমার নিশ্চিত নিরাপদ জীবন, সহজ জীবন, উন্নত পড়াশুনা, সব ধরনের সুযোগ সুবিধা। আমাকে কখনো রেশনের খাবার খেতে হবে না, কারফিউ এর মধ্যে পড়তে হবে না, ছাদের উপর থেকে দাঙ্গা দেখতে হবে না, গুলীর হাত থেকে বাঁচতে পড়শিদের পানির টাংকে লুকিয়ে রাখতে হবে না, যেভাবে মা ও বাবা করেছেন। "ভেবে দেখো, তাকে চমৎকার একটি স্কুলে দিয়েছো। ভেবে দেখো, দেশে বিদ্যুৎ চলে গেলে কেরোসিনের বাতিতে তাকে পড়তে হতো। কি রকম চাপ পড়তো ভেবে দেখেছো, মাস্টার রাখা, একের পর এক পরীক্ষা।" তার চুলের মাঝে একটি হাত চালিয়ে ব্যাংকে তার পার্ট-টাইম চাকুরিটার কথাও স্মরণ করলেন, "তুমি কি করে আশা করতে পারো যে, সে দেশ বিভাগ সম্পর্কে জানবে? বাদামগুলো সরিয়ে রাখো।"

"কিন্তু পৃথিবীটা সম্পর্কে সে কি শিখেছে?" বাবা কাজু বাদামের কৌটায় শব্দ তুলে বললেন। 'আসলে সে কি শিখছে?'

আমরা অবশ্যই আমেরিকান ইতিহাস শিখেছি এবং আমেরিকার ভূগোল। সে বছর এবং প্রতিবছরই আমরা বিপ্লবী যুদ্ধ দিয়ে ইতিহাস পড়া শুরু করি বলে মনে হয়। স্কুলের বাসে করে আমাদেরকে প্লাইমাউথ রক দেখতে নিয়ে যাওয়া হয়। ফ্রিডম ট্রেইল ধরে আমরা হাঁটি এবং বাংকার হিল মনুমেন্টের শীর্ষে আরোহণ করি। আমরা রঙিন কাগজ দিয়ে ছবি তৈরি করি, যাতে দেখানো হয় যে, জর্জ ওয়াশিংটন ডেলাওয়ার নদীর পানি অতিক্রম করছেন এবং আমরা রাজা জর্জের পুতুল বানাই, আঁটোসাটো সাদা পোশাক পরনে এবং চুলে কালো হ্যাট। পরীক্ষার সময় আমাদেরকে তেরটি উপনিবেশের শূন্য মানচিত্র দিয়ে বলা হয় নাম, তারিখ ও রাজধানীর নাম লিখতে। আমি চোখ বন্ধ করে তা করতে পারি।

পরদিন মি. পীরজাদা এলেন, বরাবরের মতো সন্ধ্যা ছ'টায়। যদিও তারা আর অপরিচিত নন, তবু পরস্পর প্রথম শুভেচ্ছা উচ্চারণের পর তিনি এবং বাবা করমর্দনের অভ্যাসটা বজায় রেখেছেন।

'আসুন। লিলিয়া, পীরজাদা সাহেবের কোটটা ধরো তো।"

তিনি রুমে প্রবেশ করেন। পরিপাটি স্যুট পরনে। গলায় সিল্কের টাই বাঁধা। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি আসেন জলপাই, চকোলেট ব্রাউন, বেগুনি লাল রং এর পোশাক পরে। অত্যন্ত ধোপদুরস্ত লোক তিনি। যদিও তার পা স্থায়ীভাবে প্রসারিত এবং উদরে সামান্য স্ফীতি, তবু তিনি সুদক্ষ একটা ভাব বজায় রাখেন। দেখে মনে হবে যেন দু'হাতে দু'টি সমান ওজনের সুটকেস সামলাচ্ছেন। পাক ধরা চুলের গুচ্ছ কানের উপর আবরণ ছড়াচ্ছে, যা দেখে মনে হয় জীবন পথের অস্বস্তির প্রকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। ঘন কালো চোখ। লক্ষণীয় গোঁফ, যার অগ্রভাগ সূঁচালো এবং উপরের দিকে বাঁকানো। বাম গালের ঠিক মাঝখানে চ্যাপ্টা কিসমিসের মতো একটি আঁচিল। পার্সি ভেড়ার লোমে তৈরি একটি কালো ফেজ

টুপি তার মাথায়, যা পিন দিয়ে আটকানো এবং তাকে এই টুপি ছাড়া আমি কখনো দেখিনি। যদিও বাবা সবসময় তাকে ডরমিটরি থেকে আমাদের গাড়িতে করে তুলে আনার কথা বলতেন, কিন্তু তিনি বিশ মিনিট সময় ব্যয় করে হেঁটে আমাদের কাছে আসাকেই প্রাধান্য দিতেন। গাছপালা, লতাগুল্ম দেখতে দেখতে আসতেন এবং যখন আমাদের ঘরে প্রবেশ করতেন তখন শরতের হাওয়ার প্রভাবে তার আঙুলের গিটগুলো গোলাপি হয়ে থাকতো।

"আমার মনে হচ্ছে ভারতীয় ভূ-খণ্ডে আরেকজন শরণার্থীর আবির্ভাব হলো।" "শেষ গণনায় শরণার্থী সংখ্যা নব্বই লাখে উঠেছে বলে ওরা ধারণা করছে।" বাবা বললেন।

মি. পীরজাদা তার কোট আমার হাতে দিলেন। সিঁড়ির নিচে, র‍্যাকে কোটটি ঝুলিয়ে রাখা আমার কাজ। ধূসর ও নীল পশমি কাপড়ে তৈরি চমৎকার কোট। স্ট্রাইপ করা এবং সুন্দর বোতাম লাগানো। লেবুর মৃদু সুগন্ধযুক্ত। কোটের মধ্যে সনাক্তকরণের মতো কোন ট্যাগ নেই। শুধু হাতে সেলাই করে লাগানো লেবেল, যাতে 'জে সাঈদ স্যুট নির্মাতা' নামটি কালো সুতায় এমব্রয়ডারি করা। কোন কোন দিন কোটের কোন পকেটে হয়তো বার্চ বা ম্যাপল গাছের ঝরে পড়া পাতাও থাকে। তিনি জুতা খুলে দেয়াল ঘেঁষে রাখেন। জুতার অগ্রভাগ ও গোড়ালিতে সোনালি রং মাখা, বাড়ির সামনের কুয়াশায় ভেজা লন অতিক্রম করে আসার কারণে এ রং লেগেছে। কোট, জুতা ছেড়ে হালকা হবার পর তিনি তার খাটো ব্যস্ত আঙুলে আমার থুতনি স্পর্শ করেন, যেভাবে কেউ দেয়ালে তারকাটা লাগানোর আগে দেয়ালের দৃঢ়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চেষ্টা করে। এরপর তিনি বাবার সাথে লিভিংরুমে যান, যেখানে টেলিভিশন রাখা আছে। তাদের আসন গ্রহণের পরপরই কিচেন থেকে মার আবির্ভাব ঘটে কিমার কাবাব ও ধনে পাতার চাটনি হাতে। মি. পীরজাদা একটি কাবাব মুখে পুরেন।

"কেউ শুধু আশাই করতে পারে যে, ঢাকার শরণার্থীকে কতো যত্নের সাথে খাওয়ানো হচ্ছে" আরেকটির জন্যে হাত বাড়াতে বাড়াতে তিনি বলেন। স্যুটের পকেট থেকে একটি প্লাস্টিকের ডিম বের করে আমাকে দেন, যাতে হৃৎপিণ্ডের আকৃতির দারুচিনি স্বাদের চকোলেট রয়েছে। ছড়ানো পায়ে মাথা কিছুটা ঝুঁকিয়ে বলেন, "এ বাড়ির ভদ্রমহিলার জন্যে।"

মা মৃদু প্রতিবাদ করেন, "পীরজাদা সাহেব, এভাবে ও বখে যাবে। রাতের পর রাত।"

"যারা কখনো বখে যাবে না, আমি শুধু সে শিশুদেরকেই বখে যেতে সাহায্য করবো।"

আমার জন্যে তখন অস্বস্তিকর মুহূর্ত। একদিকে আমি ভয়ের সাথে অপেক্ষা করি, অন্যদিকে আনন্দের সাথে। আমি মি. পীরজাদার সুগোল জাঁকজমকপূর্ণ উপস্থিতিতে মুগ্ধ এবং তার মনোযোগের নাটুকেপনায় তুষ্ট। তার বিনয়ী প্রকাশের

কাছে তখনো স্বচ্ছ হতে পারিনি, যা তাৎক্ষণিকভাবে নিজ বাড়িতেই নিজেকে আগন্তুকে পরিণত করেছে। এটা আমাদের রীতিতে পরিণত হয়েছিল এবং আমরা একে অন্যের কাছে অধিকতর স্বচ্ছন্দ হবার আগে বেশ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেদিনই তিনি আমাকে সরাসরি কথা বলেন। আমি কিছু বলিনি, সাড়া দেইনি, আমাকে প্রতিদিন যে মধুতে পূর্ণ চকোলেট, রাসবেরী চকোলেট, টক স্বাদযুক্ত লজেন্স দেয়া হচ্ছে তাতে আমি দর্শনীয় কোন প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করিনি। এমনকি তাকে ধন্যবাদ পর্যন্ত জানাইনি। একবার লাল সেলোফেনে মোড়ানো পেপারমিন্ট ললিপপ দেয়ার পর যখন তাকে ধন্যবাদ দিলাম, তখন তিনি জানতে চাইলেন, "এই ধন্যবাদটা কি জন্যে ? ব্যাংকের মহিলা আমাকে ধন্যবাদ দেয়, দোকানের ক্যাশিয়ার ধন্যবাদ দেয়, তারিখ পার হয়ে যাওয়া বই ফেরত দেয়ার পর লাইব্রেরিয়ান ধন্যবাদ দেয়, টেলিফোনে ঢাকার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর অপারেটর আমাকে ধন্যবাদ দেয়, এদেশে আমাকে যদি কবরও দেয়া হয়, সন্দেহ নেই, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমাকে ধন্যবাদ দেয়া হবে।"

মি. পীরজাদা যেভাবে আমাকে চকোলেট উপহার দেন, তাতে সেগুলো খেয়ে শেষ করা আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয়। প্রতি সন্ধ্যায় প্রাপ্ত সম্পদ আমি জড়ো করে রাখি মূল্যবান মণির মতো অথবা মাটির নিচে চাপা পড়া রাজ্যের উদ্ধার করা মুদ্রার মতো। আমার বিছানার পাশে কারুকার্যখচিত চন্দনকাঠের ছোট বাক্সে চকোলেট রেখে দেই। দীর্ঘদিন আগে ভারতে আমার বাবার মা বাক্সটি ব্যবহার করতেন সুপারি রাখার জন্যে, যা তিনি সকালে স্নান করার পর দেখতেন। যদিও ঠাকুরমাকে আমি দেখিনি, কিন্তু এই বাক্সই আমার কাছে তার একমাত্র স্মৃতি। আমাদের পরিবারে মি. পীরজাদার আগমনের পূর্বে এ বাক্সে রাখার মতো কিছুই পাইনি। আমার দাঁত ব্রাশ করার আগে এবং পরবর্তী দিনের জন্যে স্কুলের পোশাক গুছিয়ে রাখার আগে আমি বাক্সটি খুলে তার দেয়া উপহার মুখে পুরে দিতাম।

প্রতি রাতের মতো সে রাতেও আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে খাইনি। কারণ টেবিল থেকে টেলিভিশন স্পষ্ট দেখা যায় না। সেজন্যে আমরা কফি টেবিলে ঘিরে বসি এবং প্লেট থাকে আমাদের হাঁটুর উপর এবং তখন আমরা কথা বলি না। কিচেন থেকে মা খাবারগুলো আনেন; পিঁয়াজ ভাজাসহ ডাল, নারকেল সহযোগে সবুজ বীন, দধির সাথে কিসমিস দিয়ে তৈরি মাছের তরকারি। আমি পানির গ্লাস, লেবু ও ঝাল মরিচ এনে রাখি। প্রতিমাসে একবার চায়নাটাউনে গিয়ে এগুলো আনা হয় এবং ফ্রিজারে যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হয়। অন্যান্য খাবারের সাথে কাঁচা মরিচ ভেঙ্গে খেতে তারা পছন্দ করে।

খাবার শুরু করার আগে মি. পীরজাদা কৌতূহল জাগানো কাজ করেন। বেল্ট ছাড়া একটি সাদামাটা রূপালি ঘড়ি বুক পকেট থেকে বের করে মুহূর্তের জন্যে কানের কাছে ধরেন, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনি দিয়ে তিনবার হালকা টোকা দেন। তার হাতের ঘড়ির মতো নয় এটা। তিনি আমাকে বলেছেন, তার পকেট ঘড়িতে

ঢাকার স্থানীয় সময় নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে। এগার ঘণ্টা এগিয়ে রাখা সময়। খাবার সময় জুড়ে ঘড়িটা কফি টেবিলে তার ভাঁজ করা ন্যাপকিনের উপর রাখেন। কখনো মনে হয়নি যে ঘড়িটির সময় তিনি অনুসরণ করেন।

এখন আমি জানি যে, মি. পীরজাদা ভারতীয় নন। অতএব অতিরিক্ত মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করি, বুঝার চেষ্টা করি যে, তিনি কিভাবে ভিন্ন। মনে হলো, তার পকেট ঘড়ি এক ধরনের ভিন্নতা। সে রাতে ঘড়িটি যখন দেখলাম, যখন তিনি ঘড়িতে তিনটি টোকা দিয়ে টেবিলে রাখলেন, আমার মধ্যে অস্বস্তি জাগলো। প্রথমেই আমার মনে হলো ঢাকার জীবনের কথা। মনে মনে কল্পনা করলাম মি. পীরজাদার কন্যারা ঘুম থেকে উঠছে, চুল বাঁধছে, নাশতা করছে, স্কুলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঢাকায় এরই মধ্যে যা ঘটে গেছে, আমাদের ভোজন, আমাদের কাজকর্ম শুধু তারই ছায়া। মি. পীরজাদা আসলে যেখানে থাকেন, এখানে শুধু তার প্রতিচ্ছায়া বিরাজ করছে। সাড়ে ছ'টায় জাতীয় সংবাদ শুরু হয়, আমার বাবা টেলিভিশনের ভলিউম বাড়িয়ে দেন, এন্টেনা ঠিকঠাক করেন। সাধারণত আমি একটি বই নিয়ে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু সে রাতে বাবা আমাকে বললেন সংবাদ শুনতে। দেখলাম, ধূলিময় রাস্তা দিয়ে ট্যাংক যাচ্ছে, বিধ্বস্ত ভবন, অপরিচিত গাছপালাপূর্ণ বনে আশ্রয় নিয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীরা। তারা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূ-খণ্ডে আশ্রয় নিয়েছে নিরাপত্তার আশায়। সুবিস্তৃত কফি বর্ণের নদীতে পাখার আকৃতির নৌকা দেখলাম, সেনা বেষ্টনীর মাঝে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। মি. পীরজাদার দিকে তাকালাম। তার চোখের মাঝে যেন টেলিভিশনের পর্দায় প্রদর্শিত দৃশ্যগুলোর ক্ষুদ্রাকৃতির প্রতিচ্ছবি। স্থির অচঞ্চল ভঙ্গিমা তার মুখে। তিনি সতর্ক সচকিত, যেন কেউ তাকে অজ্ঞাত গন্তব্যের দিকে যেতে নির্দেশ দিচ্ছে।

বিজ্ঞাপনের বিরতির সময় আমার মা কিচেনে গেলেন আরো ভাত আনতে। বাবা ও মি. পীরজাদা ইয়াহিয়া খান নামে একজন জেনারেলের নীতির সমালোচনায় মুখর হলেন। তারা ষড়যন্ত্রের কথা বললেন, যা আমি জানি না, বিপর্যয় নিয়ে আলোচনা করলেন, যা আমার উপলব্ধির বাইরে। বাবা আমাকে আরেক টুকরা মাছ দিতে দিতে বললেন, "দেখো, তোমার বয়সী বাচ্চারা বেঁচে থাকার জন্যে কি করে ?' কিন্তু আমি আর খেতে পারছিলাম না। আমি শুধু আড়চোখে মি. পীরজাদাকে দেখছিলাম। আমার পাশেই তিনি বসা। গায়ে জলপাই সবুজ জ্যাকেট। প্লেটে ভাতের মধ্যে শান্তভাবে গর্ত করছেন সেখানে দ্বিতীয় দফা ডাল নেয়ার জন্যে। আমার ধারণা, তিনি এমন ধাঁচের লোক নন, যিনি এ ধরনের গুরুতর উদ্বেগে বিচলিত হবেন। আমার বিস্ময় লাগে, যে কোন সংবাদ মর্যাদার সাথে মোকাবিলার জন্যেই তিনি সবসময় চমৎকার পোশাক পরিধান করেন কিনা। এমনকি মুহূর্তের নোটিশে তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়ও উপস্থিত হতে পারেন। আমার আরো বিস্ময় লাগে যে, সহসা টেলিভিশনে যদি তার সাত কন্যার

আবির্ভাব ঘটে, হাসিখুশি এবং একটি ব্যালকনি থেকে মি. পীরজাদার উদ্দেশ্যে চুমু ছুঁড়ে দিচ্ছে। কল্পনা করলাম, তিনি কতোটা স্বস্তি লাভ করবেন। কিন্তু কখনো এমন ঘটনা ঘটলো না।

সেই রাতে আমি যখন বিছানার পাশের বাক্সটিতে চকোলেটপূর্ণ প্লাস্টিকের ডিমটি রাখছিলাম, তখন বরাবরের মতো পরিতৃপ্তি লাভ করিনি। কয়েক ঘন্টা আগে আমাদের কার্পেট মোড়া উজ্জ্বল লিভিংরুমে যে নির্মম, শ্বাসরুদ্ধকর পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছি তার প্রেক্ষিতে আমি মি. পীরজাদাকে তার লেবুগন্ধী ওভারকোটসহ না ভাবতেই চেষ্টা করলাম। তার স্ত্রী ও সাতটি কন্যা টিভি পর্দায় দেখানো ভয়তাড়িত জনতার শোরগোলপূর্ণ ভিড়ের মধ্যে আছে কিনা সে উদ্বেগে আমার পেট শক্ত হয়ে গেল। এই প্রতিচ্ছবি মুছে ফেলার জন্যে আমার রুমের চারদিকে তাকালাম। হলুদ শামিয়ানায় সাজানো বিছানার দিকে, যার সাথে মিলিয়ে টানানো হয়েছে পর্দা, সাদা ও বেগুনি প্রাচীরে ফ্রেমে বাঁধানো আমার সহপাঠীদের ছবির দিকে, আমার আলমিরার দরজার উপর পেন্সিল দিয়ে দেয়া দাগ ও লিখাগুলোর দিকে, যেখানে বাবা আমার প্রতি জন্মদিনে আমার উচ্চতা চিহ্নিত করে রাখেন। নিজেকে যত সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম, আমার মন তত নিশ্চিত হতে শুরু করলো যে, মি. পীরজাদার পরিবারের মৃত্যুবরণ করার সম্ভাবনাই অধিক। শেষ পর্যন্ত বাক্স থেকে একটি সাদা চকোলেট বের করে মোড়ক খোলার পর আমি যা করলাম, আগে তা কখনো করিনি। চকোলেটটা মুখে পুরে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুখের মধ্যে নরম হতে দিলাম এবং এরপর আস্তে আস্তে চিবানোর সময় প্রার্থনা করলাম যে, মি. পীরজাদার পরিবার নিরাপদে এবং ভালো আছে। এর আগে আমি কখনো কোনকিছুর জন্যে প্রার্থনা করিনি, আমাকে প্রার্থনা শিখানো হয়নি বা প্রার্থনা করতে বলাও হয়নি। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, প্রার্থনা এমন কিছু, যা আমার করা উচিত। সে রাতে যখন বাথরুমে গেলাম, তখন শুধু দাঁত মাজার ভান করলাম। কারণ আমার ভয় হচ্ছিল যে, মুখ ধোঁয়ার সাথে আমার প্রার্থনাও বেরিয়ে যাবে। আমি ব্রাশ ভিজালাম, পেস্টের টিউব গুছিয়ে রাখলাম, যাতে আমার বাবা মা এ নিয়ে কোন প্রশ্ন না করেন। জিহবায় মিষ্টি স্বাদ নিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার লিভিংরুমে এতো মনোযোগের সাথে যে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করি, স্কুলে কেউ তা নিয়ে আলোচনা করে না। আমরা আমেরিকান বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ অব্যাহত রেখেছি এবং প্রতিনিধিত্ব ছাড়া করের বোঝা চাপানোর বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছি, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ধারাগুলো মুখস্ত করছি। বিরতির সময় ছেলেরা দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দোলনার চারপাশ জুড়ে পরস্পরকে বিপুল বিক্রমে ধাওয়া করে ফিরে। উপনিবেশগুলোর বিরুদ্ধে লালকোটধারীদের লড়াই এর মহড়া। ক্লাসে আমাদের শিক্ষিকা মিসেস কেনিয়ন বোর্ডের উপর সাটানো মুভি স্ক্রিনের মতো বিশালাকৃতির একটি মানচিত্রের দিকে প্রায়ই 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজের গতিপথ দেখান অথবা লিবার্টি বেলের অবস্থান নির্দেশ করেন। প্রতি সপ্তাহে ক্লাসের দু'জন

সদস্য আমেরিকান বিপ্লবের কোন একটি বিশেষ দিকের উপর রিপোর্ট পেশ করে। এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে একদিন আমাকে আমার বান্ধবী ডোরার সাথে স্কুল লাইব্রেরিতে পাঠানো হলো ইয়র্কটাউনে আত্মসমর্পণ সম্পর্কে জানতে। মিসেস কেনিয়ন আমাদের হাতে একটুকরা কাগজ দিলেন, যাতে তিনটি বই এর নাম লিখা। লাইব্রেরির কার্ড ক্যাটালগ খুঁজে বইগুলো বের করতে হবে। বইগুলো আমরা সহজেই পেলাম এবং নিচু গোলাকৃতির টেবিলে বসে পড়তে ও নোট নিতে শুরু করলাম। কিন্তু আমি মন বসাতে পারছিলাম না। আমি লাইব্রেরির 'এশিয়া' চিহ্নিত শেলফগুলোর কাছে ফিরে গেলাম। আমি চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া সম্পর্কিত বই দেখলাম। এক পর্যায়ে 'পাকিস্তান : অ্যা ল্যান্ড এন্ড ইটস পিপল' শিরোনামে একটি বই চোখে পড়লো। কাছেই একটি টুলের উপর বসে বইটি খুললাম। আমার হাতে বইটির লেমিনেটেড কভারে শব্দ উঠছে। বই এর পৃষ্ঠা উল্টাতে শুরু করেছি, নদী ও ধানক্ষেতের ছবি, সামরিক পোশাক পরা মানুষের ছবিতে পূর্ণ পৃষ্ঠাগুলো। ঢাকার উপর একটি অধ্যায়। সেখানে বৃষ্টিপাত এবং পাট উৎপাদন সম্পর্কে পড়া শেষ করে যখন জনসংখ্যা বিষয়ক চার্টের উপর চোখ বুলাচ্ছিলাম তখনই শেলফের সারির মাঝে আবির্ভূত হলো ডোরা।

"তুমি এখানে বসে কি করছো ? মিসেস কেনিয়ন লাইব্রেরিতে এসেছেন আমরা কি করছি, তা দেখতে।"

আমি শব্দ করে বই বন্ধ করলাম। মিসেস কেনিয়নকে দেখা গেল। তার শরীরে পারফিউমের সুবাসে সরু সারি সুরভিত। বইটি তার হাতে তুলে নিলেন আমার সোয়েটারে লেগে থাকা চুল টেনে ছাড়ানোর মতো টেনে। কভারে চোখ বুলিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

"লিলিয়া, এই বইটি কি তোমার রিপোর্টের অংশ ?"

"না, মিসেস কেনিয়ন।"

"তাহলে এই বই পড়ার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না।" বইটি শেলফের ফাঁকা স্থানে রাখতে রাখতে বললেন, "তোমার কি মনে হয় ?"

* * *

সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়িয়ে যাওয়ার সাথে টেলিভিশনের সংবাদ শিরোনামে ঢাকার কোন সংবাদ ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠছে। কখনো কোন সংবাদ থাকলেও তা দেয়া হয় বিজ্ঞাপন সম্প্রচারের পর। কখনো বা দ্বিতীয় শিরোনাম হিসেবে আসে। সংবাদপত্রে সেন্সরশিপ আরোপিত, সংবাদ পুরোপুরি বাতিল, কখনো নিয়ন্ত্রিত, কখনো বা ঘোরাপথে প্রেরিত। কোন কোন দিন, অথবা বহু দিন শুধু প্রচার করা হয় নিহতের সংখ্যা। শুরুতে থাকে বিদ্যমান পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি। আরো অনেক কবিকে হত্যা করা হয়েছে, অনেক গ্রামে আগুন লাগানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও রাতের পর রাত, আমার বাবা মা, এবং মি. পীরজাদা দীর্ঘসময় ধরে খাবার গ্রহণ করেন। টেলিভিশন বন্ধ করার পর থালাবাসন ধোয়া হয়, শুকানো হয়। তারা

হাসিঠাট্টা করেন, গল্প করেন, চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে খান। রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনায় ক্লান্ত হয়ে পড়লে তারা নিউ ইংল্যান্ডের গাছের পাতা ঝরা সম্পর্কিত মি. পীরজাদার বই এর অগ্রগতি, আমার বাবার কাজের মেয়াদ বৃদ্ধি, ব্যাংকে আমার মায়ের আমেরিকান সহকর্মীদের অদ্ভুত খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা বলেন। এক সময়ে আমাকে উপরে পাঠিয়ে দেয়া হয় হোমওয়ার্ক শেষ করার জন্যে। কিন্তু কার্পেট ভেদ করে আসে তাদের কথাবার্তা। তারা আরো চা পান করছেন, ক্যাসেটে কিশোর কুমারের গান শুনছেন, কফি টেবিলে তাদের হাতের শব্দ, ইংরেজি শব্দের বানান নিয়ে হাসি ও যুক্তিতর্ক। আমার ইচ্ছে হয়, তাদের সাথে যোগ দিতে, বিশেষ করে মি. পীরজাদাকে কোনভাবে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু তার পরিবারের জন্যে একটি চকোলেট মুখে নিয়ে তাদের নিরাপত্তার জন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি না আমি। রাত এগারটার সংবাদের পূর্ব পর্যন্ত তারা কথাবার্তা বলেন এবং কখনো কখনো মাঝরাত পর্যন্ত। এরপর মি. পীরজাদা হেঁটে ফিরে যান তার ডরমিটরিতে। সেজন্যে আমি কখনো তাকে চলে যেতে দেখিনি। কিন্তু প্রতি রাতে ঘুমের আচ্ছন্ন ভাবের মাঝেও আমি তাদের কথা শুনতে পাই, পৃথিবীর অপর প্রান্তে একটি জাতির অভ্যুদয় প্রত্যাশা করছেন তারা।

অক্টোবরের এক দিন মি. পীরজাদা আমাদের বাড়িতে এসে জানতে চাইলেন, "লোকদের বাড়ির সামনে রাখা বড় বড় কমলা রং এর সবজিগুলো কি? ওগুলো কি এক ধরনের লাউ?'

আমার মা বললেন, 'ওগুলো মিষ্টি কুমড়ো। লিলিয়া, সুপারমার্কেটে গেলে আমাকে মনে করিয়ে দিও, একটা কিনতে হবে।"

"এর কারণ কি? কি জন্যে এটি রাখা হয়?"

"এটা দিয়ে একটি লণ্ঠন তৈরি করা হয়।" চেহারায় ভীতির প্রকাশ ঘটিয়ে বললাম, "ঠিক এভাবে, লোকদের ভয় দেখানোর জন্যে।"

'ও তাই।' মি. পীরজাদা বিড়বিড় করলেন, 'খুব কার্যকর।'

পরদিন মা দশ পাউন্ড ওজনের একটি মিষ্টিকুমড়ো কিনলেন। মোটা, গোলাকৃতির এবং ডাইনিং টেবিলের উপর রাখলেন। রাতের খাবার আগে বাবা ও মি. পীরজাদা যখন স্থানীয় সংবাদ দেখছিলেন, তখন মা আমাকে বললেন, মার্কার দিয়ে মিষ্টি কুমড়োটাকে সাজাতে। কিন্তু আমি চাইছিলাম আশেপাশের বাড়িগুলোতে যেমন দেখেছি, ঠিক সেভাবে মিষ্টি কুমড়োটি কেটে সাজাতে।

'ঠিক আছে, চলো, আমরা এটি কাটি' মি. পীরজাদা সম্মতি প্রকাশ করে সোফা থেকে উঠলেন। "আজ রাতের সংবাদ থাক।" কোন প্রশ্ন না করে তিনি কিচেনে গেলেন, ড্রয়ার খুলে একটি দীর্ঘ খাঁজকাটা ছুরি নিয়ে এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে অনুমতি চাইলেন। "আমি কি কাটবো?"

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে সাড়া দিলাম। প্রথম বারের মতো আমরা সবাই ডাইনিং টেবিল ঘিরে দাঁড়ালাম আমার মা, বাবা, মি. পীরজাদা ও আমি। টেলিভিশনের সামনে কেউ নেই। টেবিলের উপর সংবাদপত্র বিছিয়ে দিয়েছি। মি. পীরজাদা তার জ্যাকেট খুলে পিছনের চেয়ারে রাখলেন। শার্টের কাফ লিংক খুলে হাতা গুটিয়ে নিলেন।

আমি নির্দেশ দিচ্ছিলাম, 'প্রথমে উপরের অংশ এভাবে গোল করে কাটুন।' আমার তর্জনি দিয়ে দেখাচ্ছিলাম।

তিনি প্রথমে একটি জায়গা কাটলেন এবং ছুরিটি চারদিকে ঘুরিয়ে আনলেন। বৃত্ত পুরো হয়ে গেলে বোটা ধরে কাটা অংশটা তুললেন। সহজে উঠে এলো সেটি। মি. পীরজাদা মিষ্টি কুমড়োর উপরে ঝুঁকে মুহূর্তের জন্যে ভিতরটা দেখলেন এবং গন্ধ শুকলেন। আমার মা তার হাতে একটি দীর্ঘ চামচ দিলেন। যা দিয়ে তিনি ভিতরটা আঁচড়ে বীজসহ অপ্রয়োজনীয় অংশ বের করে আনলেন। বাবা ইতোমধ্যে বীজগুলোকে পৃথক করে একটি কাগজের উপর ছড়িয়ে রাখলেন শুকানোর জন্যে, যাতে সেগুলো পরে ভেজে খেতে পারি। মিষ্টি কুমড়োর গায়ে চোখ খোদাই করার জন্যে আমি দু'টি ত্রিভুজ আঁকলাম, যা অনুসরণ করে মি. পীরজাদা একাগ্রতার সাথে কাটলেন, বাঁকা করে কাটলেন ভুরু এবং নাকের জন্যে আরেকটি ত্রিভুজ। মুখ কাটা বাকি ছিল এবং দাঁত নিয়েও সমস্যা দাঁড়ালো। আমি দ্বিধান্বিত।

"হাসি মুখ না মুখ বাঁকানো থাকবে?' জানতে চাইলাম।

"তুমিই বলো।" মি. পীরজাদা বললেন।

সমঝোতা হিসেবে আমি এক ধরনের বিকৃত মুখ আঁকলাম, একেবারে সোজা, দুঃখপূর্ণ বা বন্ধুভাবের নয়। মি. পীরজাদা কাটছিলেন কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই, যেন তিনি তার গোটা জীবন ধরেই এ রকম আলেয়ার লণ্ঠন তৈরি করে আসছেন। তিনি যখন কাটার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন ঠিক তখনই জাতীয় সংবাদ শুরু হলো। রিপোর্টার ঢাকার কথা উল্লেখ করতেই আমরা সবাই টিভির দিকে ফিরলাম। একজন ভারতীয় কর্মকর্তা ঘোষণা করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থীদের বোঝা লাঘবে বিশ্ব যদি এগিয়ে না আসে তাহলে ভারতকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। রিপোর্টারের মুখ গড়িয়ে ঘাম ঝরছিল এ তথ্য প্রেরণের সময়। তার গলায় টাই অথবা গায়ে জ্যাকেট নেই, দেখে মনে হচ্ছে তিনি নিজেই যুদ্ধে অংশ নিতে যাচ্ছেন। ক্যামেরাম্যানের দিকে তারস্বরে পরিস্থিতি বর্ণনা করার সময় তার দগ্ধ মুখ আড়াল করে রেখেছেন। মি. পীরজাদার হাতের ছুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো এবং মিষ্টিকুমড়োর তলার দিকে গভীরভাবে কেটে গেল।

"আমাকে ক্ষমা করো।" তিনি একটি হাত তার মুখের পাশে তুললেন, যেন কেউ তার গালে চড় বসিয়েছে। 'আমি কি বলবো...মস্তো বড় ভুল হয়ে গেছে। আমি আরেকটি মিষ্টিকুমড়ো কিনবো। আবার আমরা কাটতে চেষ্টা করবো।"

'না না, ঠিক আছে।' আমার বাবা বললেন। মি. পীরজাদার হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে কাটা অংশের চারদিকে আস্তে আস্তে কাটলেন। আমার আঁকা দাঁতসহ

সবকিছু বাদ পড়লো। যার ফলে জায়গাটায় একটি লেবুর আকৃতির বড় গর্তের সৃষ্টি হলো। অতএব আমাদের আলেয়ার বাতি স্থির অচঞ্চল কিম্ভূতদর্শন ধারণ করলো। এর ভুরু ভীতি উদ্রেককর নয়, শূন্য জ্যামিতিক দৃষ্টির উপর ভাসমান বিস্ময়ের মতো।

হ্যালোইন উৎসবে আমি ডাইনির সাজ নিয়েছিলাম। আমার 'ট্রিক অর ট্রিট' (হ্যালোইনের সন্ধ্যায় আমেরিকান শিশুরা ছদ্মবেশ ধারণ করে পড়শিদের দরজায় গিয়ে উচ্চারণ করে এ শব্দ এবং চকোলেটসহ উপহার সামগ্রী সংগ্রহ করে বেড়ায়) পার্টনার ডোরাও ডাইনি সেজেছে। বালিশের কভার কালো করে পরে মাথায় দিয়েছি চোঙা টুপি। মুখে মেখেছি সবুজ রং। ডোরার মায়ের কাছ থেকে নিয়ে চোখের উপর ঠোলা পরেছি। মা আমাদের দু'জনকে দু'টি চটের ব্যাগ দিয়েছেন, চকোলেট সংগ্রহের জন্যে। ব্যাগ দু'টোতে আগে বাসমতি চাল ছিল। সে বছর আমাদের দু'জনেরই বাবা মা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমরা আমাদের পাড়ায় কারো তত্ত্বাবধান ছাড়াই ঘোরার মতো বড়ো হয়েছি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল আমাদের বাড়ি থেকে ডোরার বাড়ি পর্যন্ত যাবো এবং সেখান থেকে বাড়িতে ফোন করে জানাবো যে, আমি নিরাপদে পৌঁছেছি এবং ডোরার মা আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। বাবা আমাদেরকে ফ্লাশলাইট দিয়েছেন। আমাকে ঘড়ি পরতে হয়েছে। রাত নটার মধ্যে আমাদের ফিরতে হবে।

সেই সন্ধ্যায় মি. পীরজাদা আমাকে এক বাক্স মিন্ট চকোলেট উপহার দিলেন। তাকে বললাম, "এখানে দিন" এবং চটের ব্যাগের মুখ খুলে ধরলাম। "ট্রিক অর ট্রিট!"

বাক্সটি ব্যাগে দেয়ার সময় বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, আজ সন্ধ্যায় আমার কোনকিছুর প্রয়োজন নেই তোমার।" আমার সবুজ মুখের দিকে তাকালেন এবং থুতনির নিচে সুতা দিয়ে যে টুপি আটকে রাখা ছিল সেদিকে।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমার পরনের বালিশের কভারের প্রান্ত তুললেন, যার নিচে পরেছিলাম একটি সোয়েটার এবং জিপার লাগানো জ্যাকেট। "তুমি কি যথেষ্ট উষ্ণতা বোধ করছো?" তিনি জানতে চাইলেন।

আমি মাথা নাড়লাম। এর ফলে আমার টুপি একদিকে হেলে পড়লো। তিনি সেটি সোজা করে দিলেন। "সম্ভবত সোজা দাঁড়িয়ে থাকাই উত্তম।"

আমাদের সিঁড়ির নিচে বেশ ক'টি ঝুঁড়িতে ছোট ছোট চকোলেট। মি. পীরজাদা যখন তার জুতা খুললেন, তিনি সেগুলো সাধারণত যেখানে রাখেন সেখানে না রেখে ক্লোজেটের মধ্যে রাখলেন। তার ওভারকোটের বোতাম খুলতে শুরু করলেন এবং আমি তার কাছ থেকে কোট নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু ডোরা বাথরুম থেকে আমাকে ডাকলো তার থুতনিতে একটি আঁচিল আঁকতে

সাহায্য করার জন্যে। আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত হওয়ার পর মা ফায়ার প্লেসের সামনে দাঁড় করিয়ে আমাদের ছবি নিলেন। এরপর বের হওয়ার জন্যে সামনের দরজা খুললাম। মি. পীরজাদা এবং বাবা তখনো লিভিংরুমে যাননি, যাওয়ার জন্যে পা বাড়াবেন। ইতোমধ্যে বাইরে অন্ধকার নেমেছে। বাতাসে ভিজা পাতার গন্ধ। দরজার পাশে আমাদের মিষ্টিকুমড়োর মাঝে আলোর শিখা দাপাদাপি করছে বাতাসে। দূরে মানুষের পদশব্দ, বয়স্ক ছেলেদের হল্লা, যারা মুখে রবারের মুখোশ পরা ছাড়া কোন কস্ট্যুম পরেনি। শিশুদের পরনে উজ্জ্বল চকচকে জামা। অনেকে এতো ছোট্ট যে, তাদের বাবা মা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে দ্বারে দ্বারে।

বাবা সতর্ক করে দিলেন, "যাদেরকে তোমরা জানো না, এমন কারো বাড়িতে যেও না।"

মি. পীরজাদা ভ্রু কুঞ্চিত করলেন, "কেন কোন বিপদের ভয় আছে?"

"না না, তা নয়।" মা তাকে আশ্বস্ত করলেন। "সব ছেলেমেয়েরা বাইরে ঘুরবে। এটা একটা রীতি।"

"সম্ভবত ওদের সাথে আমার যাওয়া উচিত।" মি. পীরজাদা বললেন। সহসা তাকে ক্লান্ত ও ছোট মনে হলো। পা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। তার চোখে ভীতির চিহ্ন, যা আগে কখনো দেখিনি। ঠাণ্ডা সত্ত্বেও বালিশের কভারের মাঝে আমি ঘামতে শুরু করলাম। মা বললেন, "পীরজাদা সাহেব, লিলিয়া তার বন্ধুর সাথে অত্যন্ত নিরাপদে থাকবে।"

"কিন্তু যদি বৃষ্টি আসে? ওরা যদি পথ হারিয়ে ফেলে?"

"আপনি চিন্তা করবেন না।" আমি বললাম। প্রথমবারের মতো আমি মি. পীরজাদাকে কথাগুলো বললাম। খুব সাধারণ কথা। তাকে বলতে চেষ্টা করেছি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে। কিন্তু বলতে পারিনি। যা শুধু প্রার্থনার সময় মনে মনে উচ্চারণ করেছি। আমি লজ্জিত হলাম এই ভেবে যে, এখন কথাগুলো বলতে হলো আমার নিজের জন্যেই।

তিনি তার একটি মোটা আঙুল আমার গালে স্থাপন করলেন এবং এরপর সেটি নিয়ে নিজের হাতে চাপ দিলেন। হালকা সবুজ দাগ লেগে রইলো। তিনি মেনে নিলেন, "ভদ্রমহিলা যদি না চান।" এবং মাথা ঝাঁকালেন।

আমরা পা বাড়ালাম। সুঁচালো মাথার কালো জুতা পরে আস্তে হাঁটতে হচ্ছিল। রাস্তার পাশে পৌঁছে পিছন ফিরলাম হাত নাড়াতে। দরজায় বাবা মা'র মাঝখানে মি. পীরজাদা দাঁড়ানো। তারাও হাত নাড়ছেন। "ওই লোকটি আমাদের সাথে আসতে চাইছিল কেন?" ডোরা জানতে চাইলো।

"তার কন্যারা হারিয়ে গেছে।" কথাটা বলেই মনে হলো, একথা বলা ঠিক হয়নি। আমি অনুভব করলাম, আমার কথাটা সত্যে পরিণত হবে যে, মি. পীরজাদার কন্যারা সত্যিসত্যি নিখোঁজ হয়েছে এবং তিনি আর কখনো তাদের দেখবেন না।

"তুমি কি বলতে চাও যে, তাদের অপহরণ করা হয়েছে ?" ডোরা বললো। "কোন পার্ক অথবা অন্য কোথাও থেকে ?"

"তারা হারিয়ে গেছে, আমি তা বুঝাতে চাইনি। আমার কথার অর্থ হলো, তিনি তাদের শূন্যতা অনুভব করছেন। ভিন্ন এক দেশে তারা বাস করে এবং ইচ্ছে করলেই তিনি তাদের দেখতে পারেন না।"

আমরা বাড়ি বাড়ি গেলাম। দরজার বেল বাজালাম। কিছু লোক তাদের সব বাতি নিভিয়ে দিয়েছে আলেয়ার যথার্থ প্রকাশ ঘটাতে অথবা জানালায় রবারের বাঁদুর ঝুলিয়ে রেখেছে। এক বাড়ির সামনের দরজায় স্থাপন করা হয়েছে কফিন এবং একজন লোক নীরবে কফিন থেকে উঠলেন তার মুখ চকের গুড়ো মেখে সাদা করা। মুঠি ভরে লোকটি ছোট ছোট চকোলেট আমাদের ব্যাগে দিলো বেশ কিছু লোক আমাকে বললো যে, তারা আগে কখনো ভারতীয় ডাইনি দেখেনি। অন্যেরা কোন মন্তব্য না করেই তাদের উপহার দিলো। ফ্লাশলাইট জ্বালিয়ে অগ্রসর হওয়ার পথে আমরা রাস্তার মাঝখানে ভাঙ্গা ডিম, শেভিংক্রিম মাখা গাড়ি, গাছের ডাল থেকে ঝুলানো টয়লেট পেপার দেখতে পেলাম। যখন ডোরার বাড়িতে পৌছলাম তখন চকোলেট ভর্তি ব্যাগের ওজনে আমাদের হাতে দাগ পড়েছে, পা ব্যথা করছে এবং ফুলে গেছে। ডোরার মা আমাদের হাতের ফোস্কার উপর ব্যান্ডেজ বেঁধে আপেলের রস ও পপকর্ণ খেতে দিলেন। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন বাড়িতে টেলিফোন করে জানাতে যে, আমি নিরাপদে পৌছেছি। ফোন করার পর আমি টেলিভিশনের শব্দ শুনতে পেলাম। আমার কণ্ঠ শুনে মা স্বস্তি বোধ করেছেন বলে মনে হলো না। রিসিভার রাখার পর মনে হলে টেলিভিশনের শব্দ নিশ্চয়ই ডোরাদের বাড়িতে ছিল না। তার বাবা সোফায় হেলান দিয়ে ম্যাগাজিন পড়ছেন। কফি টেবিলে মদের গ্লাস এবং স্টেরিওতে স্যাক্সোফোনও বাজছিল না।

ডোরা এবং আমি আমাদের প্রাপ্ত সম্পদ বাছাই ও গণনা করলাম নিজেদের মধ্যে সন্তুষ্টি না আসা পর্যন্ত। একসময় ওর মা আমাকে গাড়িতে তুলে বাড়িতে পৌছে দিলেন। তাকে ধন্যবাদ জানালাম। দরজায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত তিনি গাড়িতে বসে তাকিয়ে ছিলেন। তার গাড়ির হেডলাইটের আলোয় লক্ষ্য করলাম যে, আমাদের মিষ্টিকুমড়োটা চৌচির হয়ে গেছে এবং মোটা মোটা টুকরোগুলো ঘাসের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হলো চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়বে। হঠাৎ গলায় ব্যথা অনুভব করলাম, যেন গলায় সূঁচোলো নুড়িপাথর জমেছে এবং ব্যথাক্লিষ্ট পায়ের প্রতিটি পদক্ষেপে গলায় পাথর কুচির খোঁচা লাগছে। আশা করেছিলাম দরজা খুলে দেখবো, তিনজনই দাঁড়িয়ে আছে আমাকে স্বাগত জানাতে এবং বিধ্বস্ত মিষ্টিকুমড়োর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতে। কিন্তু কেউ অপেক্ষায় ছিল

না। লিভিংরুমে মি. পীরজাদা, বাবা ও মা পাশাপাশি সোফায় বসা। টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং মি. পীরজাদা দু'হাতে মাথা ধরে আছেন।

সে সন্ধ্যায় এবং তারপরের অনেকগুলো সন্ধ্যায় তারা যে খবরটি শুনেছেন তা হলো, ভারত ও পাকিস্তান ক্রমেই যুদ্ধের দিকে এগুচ্ছে। উভয় দেশের সৈন্যরা সীমান্তে অবস্থান এবং ঢাকা স্বাধীনতার মতো কোন বিষয়ের তোয়াক্কা করছে না। যুদ্ধ পরিচালিত হবে পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে। যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়েছে ভারতের এবং যা খুব শীঘ্র বাংলাদেশ হবে তার পক্ষ। ৪ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সরবরাহ উৎস হতে বহু দূরে অবস্থান করার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ায় মাত্র বার দিন পর ঢাকায় আত্মসমর্পণ করলো। এসব খবর আমি জানতে পেরেছি এখন। কারণ যে কোন লাইব্রেরির যে কোন ইতিহাস বই-এ তা পাওয়া যায়। কিন্তু তখন এই তথ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমার কাছে ছিল দূরবর্তী রহস্যের বিক্ষিপ্ত সূত্রের মতো। যুদ্ধের সেই বার দিনের কথা আমি যা স্মরণ করতে পারি তা হলো, বাবা আমাকে আর তাদের সাথে সংবাদ দেখার জন্যে ডাকতেন না এবং মি. পীরজাদা আমার জন্যে চকোলেট আনা বন্ধ করেছিলেন এবং মা রাতের খাবারে ভাতের সাথে ডিম সিদ্ধ ছাড়া আর কিছুই পরিবেশন করতেন না। আমার মনে আছে, কোন কোন রাতে আমি মাকে সাহায্য করেছি সোফার উপর চাদর ও কম্বল বিছিয়ে দিতে, যাতে সেখানে মি. পীরজাদা ঘুমোতে পারেন। মাঝরাতে বাবা মা'র উচ্চকণ্ঠ শুনেছি যখন তারা কলকাতায় আমাদের আত্মীয়দের ফোন করে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করতেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার যা আমার মনে আছে যে, তারা তিনজন সে সময়ে যেন একজন ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। একই খাবার ভাগ করে খাচ্ছেন, তাদের এক দেহ, এক নীরবতা এবং অভিন্ন ভীতি।

জানুয়ারি মাসে মিঃ পীরজাদা ঢাকায় তার তিনতলা বাড়িতে ফিরে গেলেন, সেখানে কি অবশিষ্ট আছে তা আবিষ্কার করার জন্যে। সে বছরের শেষ সপ্তাহগুলোতে আমরা তাকে খুব বেশি দেখিনি। তিনি তার ম্যানিউস্ক্রিপ্ট শেষ করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং আমরা আমার বাবা মা'র বন্ধুদের সাথে ক্রিসমাসের ছুটি কাটাতে ফিলাডেলফিয়া চলে গিয়েছিলাম। আমাদের বাড়িতে তার প্রথম আগমনের স্মৃতিও যেমন আমার মনে নেই, তার শেষ আগমনের কথাও তেমনি স্মরণে নেই। একদিন বিকেলে বাবা তাকে এয়ারপোর্টে পৌছে দিয়ে আসেন, যখন আমি স্কুলে ছিলাম। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমরা তার আর কোন খবর পাইনি। আমাদের সন্ধ্যা বরাবরের মতোই কাটছিল, রাতের খাবারের সময় টিভির খবর দেখা। শুধু পার্থক্য ছিল, মি. পীরজাদা তার অতিরিক্ত ঘড়িটিসহ আমাদের সঙ্গ দেন না। খবর অনুযায়ী একটি নতুন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠন করে

ঢাকা ধীরে ধীরে ধ্বংসস্তুপ থেকে সংস্কার চালিয়ে যাচ্ছে। নতুন নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সম্প্রতি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। তিনি যুদ্ধে বিধ্বস্ত দশ লক্ষাধিক বাড়ি পুনঃনির্মাণের জন্যে দাতা দেশগুলোর কাছে নির্মাণ সামগ্রী সাহায্য করতে বলেছেন। অসংখ্য শরণার্থী ভারত থেকে দেশে ফিরছে, বেকারত্ব ও দুর্ভিক্ষের হুমকির কবলে পড়ছে বলে আমরা জানতে পারলাম। যখন তখন আমি আমার বাবার ডেস্কের উপর দেয়ালে টানানো মানচিত্র অবলোকন করি এবং একটি ছোট্ট হলুদ চিহ্নিত স্থানে মি. পীরজাদাকে দেখতে পাই। আমি কল্পনা করি তার স্যুটগুলোর একটি পরে তিনি ভীষণ ঘামছেন তার পরিবারকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে। যদিও সেই মানচিত্রটা ততোদিনে পুরনো হয়ে গেছে।

অবশেষে আমরা মি. পীরজাদার পাঠানো একটি কার্ড পেলাম কয়েক মাস পর। মুসলিম নববর্ষ উপলক্ষে পাঠানো কার্ডের সাথে ছোট একটি চিঠি তিনি লিখেছেন, তার স্ত্রী ও সাত সন্তানের সাথে পুনর্মিলন ঘটেছে। সবাই ভালো ছিল। শিলং এর পর্বতে তার স্ত্রীর দাদার বাড়িতে অবস্থান করে তারা গত বছর ঘটে যাওয়া পরিস্থিতি থেকে নিজেদের রক্ষা করেছেন। তার সাত কন্যার উচ্চতা সামান্য বেড়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তাদের আর সবকিছু আগের মতোই, কিন্তু এখনো তাদের নাম ক্রমানুসারে রাখতে তার সমস্যা হয়। চিঠির শেষে তিনি আমাদের আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদ দিয়েছেন। সাথে যোগ করেছেন যে, যদিও তিনি 'থ্যাংক ইউ' শব্দের অর্থ বুঝেন, কিন্তু আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে তা যথেষ্ট নয়। এই সুখবরটি সেলিব্রেট করতে সে সন্ধ্যায় মা বিশেষ খাবারের আয়োজন করলেন এবং যখন আমরা কফি টেবিল ঘিরে খেতে বসলাম, আমাদের পানির তিনটি গ্লাস মিলিয়ে টোস্ট করলাম। কিন্তু আমার মন এই আনন্দ অনুভবে সাড়া দিচ্ছিল না। যদিও কয়েকমাস ধরে মি. পীরজাদাকে দেখিনি, কিন্তু তখনই শুধু তার অনুপস্থিতি অনুভব করলাম। তার নামে গ্লাস উঁচু করে ধরে শুধু তখনই উপলব্ধি করলাম যে, বহু মাইল এবং বহু ঘণ্টার দূরত্বে কাউকে হারানোর অর্থ কি, ঠিক যেভাবে অনেকগুলো মাস তিনি তার স্ত্রী ও কন্যাদের অনুপস্থিতির যন্ত্রণা নিয়ে আমাদের মাঝে ছিলেন। আমাদের কাছে তার ফিরে আসার কোন কারণ নেই এবং আমার বাবা মা সঠিক অর্থেই বলেছেন যে, আমরা আর কখনো তাকে দেখবো না। জানুয়ারি থেকেই প্রতি রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে, আমি হ্যালোইনের পাওয়া চকোলেটগুলো থেকে একটি করে খেতাম, মি. পীরজাদার পরিবারের কল্যাণ কামনা করে। তার কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর এর আর প্রয়োজন ছিল না। আমি চকোলেটগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

ইন্টারপ্রেটার অব ম্যালাডিজ

চায়ের দোকানে দাশবাবু এবং তার স্ত্রী বিবাদ করছিলেন যে, টিনাকে কে টয়লেটে নিয়ে যাবে। দাশবাবু যখন উল্লেখ করলেন যে, আগের রাতে তিনিই টিনাকে স্নান করিয়েছেন, তখন মিসেস দাশ নরম হলেন। মস্তো সাদা অ্যামবেসেডর গাড়ির পিছনের সিট থেকে মিসেস দাশ যখন তার লোম কামানো অনাবৃত পা টেনে ধীরে ধীরে নামছিলেন রিয়ার ভিউ মিররে মি. কাপাসি তা প্রত্যক্ষ করেন। তারা যখন রেস্টরুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তখন ছোট্ট মেয়েটির হাত মিসেস দাশের হাতে ধরা ছিল না।

তারা কোনারকের সান টেম্পল দেখতে যাচ্ছেন। শুষ্ক রৌদ্রোজ্জ্বল শনিবার। সমুদ্র থেকে আসা মৃদু বায়ু মধ্য জুলাই এর তাপকে সহনীয় করেছে। দর্শনীয় স্থানে ঘুরে বেড়ানোর জন্যে উত্তম আবহাওয়া। মি. কাপাসি সাধারণত পথে এতো শীঘ্র গাড়ি থামান না। কিন্তু সেদিন সকালে হোটেল স্যান্ডি ভিলার সামনে থেকে পরিবারটিকে গাড়িতে উঠানোর পর পাঁচ মিনিটও হয়নি, ছোট মেয়েটি বললো, সে টয়লেটে যাবে। মি. কাপাসি হোটেলের পোর্টিকোর নিচে দাশবাবু ও তার স্ত্রীকে তাদের সন্তানদের সাথে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রথম যা লক্ষ করেন, তা হলো তারা তরুণ, বয়স হয়তো ত্রিশও হয়নি। টিনা ছাড়াও তাদের দু'টি ছেলে—রনি ও ববি, যাদের দেখে কাছাকাছি বয়সের মনে হয়, দাঁতের উপর উজ্জ্বল রূপালি তারের আবরণ। পরিবারটি ভারতীয় মনে হলেও বিদেশীদের মতো পোশাক পরা। ছেলে দু'টো পরেছে মোটা উজ্জ্বল রং এর জামা এবং মাথায় ক্যাপের সাথে মুখের উপর পড়ে এমন অস্বচ্ছ একটি মুখোশ। মি. কাপাসি বিদেশী পর্যটকদের ব্যাপারে অভ্যস্ত। তাদের সাথে তাকে পাঠানো হয়, কারণ তিনি ইংরেজি বলতে পারেন। গতকাল তিনি স্কটল্যান্ডের এক বয়োবৃদ্ধ দম্পতিকে গাড়িতে তুলেছিলেন, দু'জনেরই দাগভর্তি মুখ, শনের মতো সাদা সামান্য চুল, যার ফলে তাদের রোদে পোড়া মাথা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তাদের তুলনায় দাশবাবু ও তার স্ত্রীর চামড়া পাকানো, মুখ তারুণ্যদীপ্ত, সর্বোপরি আকর্ষণীয়। পরিচিত হবার সময়ে কাপাসি হাত জোড় করে নমস্কার জানান, কিন্তু দাশবাবু একজন আমেরিকানের মতো তার হাতে চাপ দেন, যা তিনি কনুই পর্যন্ত অনুভব করেন। মিসেস দাশ তার পক্ষ থেকে মুখের এক পাশে হাসির রেখা তুলে কাপাসি বাবুর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন, তার প্রতি

কোন আগ্রহ না দেখিয়েই। চায়ের দোকানে তাদের অপেক্ষার সময়ে, দু'জনের মধ্যে বড় দেখায় যে ছেলেটিকে, রনি, হঠাৎ করেই পিছনের সিট থেকে বের হলো। অদূরে খোটায় বাঁধা একটি ছাগল তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

হলুদ অক্ষরে 'INDIA' লিখা ভ্রমণ সংক্রান্ত সম্ভবত বিদেশে মুদ্রিত পেপার ব্যাক বই এর পৃষ্ঠা থেকে চোখ তুলে দাশবাবু বললেন, 'ওকে ধরো না।' তার কণ্ঠে শাসনের সুর এবং সামান্য তীক্ষ্ণ, মনে হলো উচ্চারিত শব্দ তখনো পরিপূর্ণতা লাভ করেনি।

ছেলেটি এগুতে এগুতে বললো, 'ছাগলটিকে আমি একটি চুইংগাম দিতে চাই।"

দাশবাবু গাড়ি থেকে নামলেন এবং পায়ের আড়ষ্টতা কাটাতে টান টান করলেন। দাড়িগোঁফ কামানো পরিপাটি চেহারা, যেন রনিরই পূর্ণ বয়সের আরেক রূপ। চোখে উজ্জ্বল নীল সানগ্লাস। শর্টস পরা। পায়ে টেনিস জুতা, গায়ে টি-শার্ট। আকর্ষণীয় টেলিলেন্স এবং অসংখ্য বোতাম ও চিহ্নসহ গলায় ঝুলানো ক্যামেরাটিই তার পরনের একমাত্র জটিল বস্তু। তিনি ভ্রু কুঁচকে রনির ছাগলের দিকে এগিয়ে যাওয়া লক্ষ করলেও এর মধ্যে তার বাধা দেয়ার ইচ্ছা আছে এমন মনে হলো না। গাড়িতে বসা দ্বিতীয় ছেলেকে বললেন, 'ববি, দেখতো তোমার ভাই যাতে বোকার মতো কোন কাজ করে না বসে।" ববি গাড়িতে বসেই বললো, 'আমার ইচ্ছে করছে না।' সামনের সিটে মি. কাপাসির পাশে বসেছে। একটি গণেশ মূর্তির ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখছিল সে।

'ঘাবড়ানোর কিছু নেই।' মি. কাপাসি বললেন। 'ছাগল অত্যন্ত শান্ত প্রাণী। মি. কাপাসির বয়স ছেচল্লিশ বছর। চুল পড়ে যা অবশিষ্ট আছে তা পুরোপুরি রূপালি। কিন্তু তার মাখন বর্ণের চেহারা এবং অবসরের মুহূর্তে পদ্ম তেলের মলম ব্যবহারে উজ্জ্বল ভুরু দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, যৌবনে তিনি দেখতে কেমন ছিলেন। ধূসর রং এর ট্রাউজারের সাথে ম্যাচ করে জ্যাকেটের মতো শার্ট পরেছেন, যার দৈর্ঘ্য কোমর পর্যন্ত, হাফ হাতা এবং কোনা তোলা বড় কলারবিশিষ্ট। হালকা, কিন্তু টেকসই সিনথেটিকের উপাদানে তৈরি। তিনি নিজেই দর্জিকে কাপড় কাটা ও কাপড় সম্পর্কে বলে দিয়েছিলেন। পর্যটকদের নিয়ে বেড়ানোর সময় তার পছন্দের পোশাক এটি। কারণ গাড়িতে দীর্ঘ সফরে এটি কুঁচকে যায় না। উইন্ডশিল্ড দিয়ে তিনি দেখলেন, রনি ছাগলটির চারপাশে ঘুরে, ছাগলের গায়ে দ্রুত স্পর্শ করে গাড়িতে ফিরে এলো।

দাশবাবু আবার গাড়িতে এসে বসলে মি. কাপাসি জানতে চাইলেন, 'আপনি কি শৈশবেই ভারত ছেড়ে গিয়েছিলেন?'

দাশবাবু এক ধরনের আস্থার সাথে ঘোষণা করলেন, "মিনা এবং আমি, দু'জনই আমেরিকায় জন্মেছি। এবং বড়ও হয়েছি সেখানে। আমাদের বাবা মা এখনো বেঁচে আছেন, তারা আসানসোলে থাকেন। অবসর জীবন কাটাচ্ছেন।

আমরা দু'বছর পরপরই তাদের কাছে বেড়াতে আসি।" তিনি ঘাড় ফিরিয়ে ছোট্ট মেয়েটিকে দৌড়ে গাড়ির দিকে আসতে লক্ষ করলেন। তার মাথায় বাঁধা বেগুনি লালচে বো ঝুলে পড়েছে সরু বাদামি কাঁধ পর্যন্ত। বুকের সাথে আঁকড়ে রেখেছে হলুদ চুলবিশিষ্ট একটি পুতুল, মনে হচ্ছিল যেন শাস্তি হিসেবে একটি ভোতা কাঁচি দিয়ে চুলগুলো কাটা হয়েছে। দাশবাবু বললেন, "টিনা, এবারই প্রথম ভারতে এলো, তাই না, টিনা?"

"আমাকে আর বাথরুমে যেতে হবে না" টিনা ঘোষণা করলো।

"মিনা কোথায়?" দাশবাবু জানতে চাইলেন।

ছোট্ট মেয়ের সাথে কথা বলতে দাশবাবু স্ত্রীর নাম ধরে বলায় মি. কাপাসি বিস্মিত হলেন। টিনা আঙুল দিয়ে দেখালো যে তার মা চায়ের দোকানের খালি গা লোকদের একজনের কাছে কিছু কিনছে। মি. কাপাসির কানে এলো লোকগুলোর মধ্যে একজন একটি জনপ্রিয় হিন্দি প্রেমের গানের কলি ভাজছে মিসেস দাশের গাড়িতে ফিরে আসার সময়ে। কিন্তু গানের শব্দের অর্থ তিনি বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হলো না। কারণ তার মুখে কোন বিরক্তি, বিব্রত ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল না অথবা লোকটির কথায় অনাভাবেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখালেন না।

তিনি মিসেস দাশের দিকে তাকালেন। লাল ও সাদা চেকের স্কার্ট পরেছেন তিনি, যা হাঁটুর উপরে এসেই থেমে গেছে। চৌকোনো কাঠের হিলের জুতা পায়ে এবং গায়ে পুরুষদের গেঞ্জির মতো আঁটসাট ব্লাউজ। স্ট্রবেরির আকৃতির একটি আলগা উজ্জ্বল ডিজাইন বুকের উপর লাগানো। খাটো মহিলা, ছোট ছোট হাত, আঙুলের নখে ঠোঁটের লিপস্টিকের রং এর সাথে ম্যাচ করে গোলাপি নেল পালিশ লাগিয়েছেন। আকৃতির চাইতে একটু বেশি মোটা তিনি। তার চুল স্বামীর চাইতে সামান্য লম্বা করে ছাঁটা, এক পাশে সিঁথি কাটা। তার চোখে ঘন ধূসর রং এর বড় সানগ্লাস, যার উপর গোলাপি আঁচড় দেয়া। তার হাতে একটি ব্যাগ, অনেকটা লামলার আকৃতির। তাতে পানির বোতলের খানিকটা বের হয়ে আছে। সংবাদপত্র দিয়ে বানানো বড় একটি ঠোঙ্গায় মুড়ি, বাদাম ও মরিচ মিশিয়ে নিয়েছেন। মি. কাপাসি দাশবাবুর দিকে ফিরলেন।

"আমেরিকার কোথায় থাকেন আপনারা?"

"নিউজার্সির নিউ ব্রানসউইকে।"

"নিউইয়র্কের পাশেই?"

'হ্যাঁ, আমি ওখানকার এক মিডল স্কুলে পড়াই।'

"কি পড়ান?"

"আমি বিজ্ঞান পড়াই। প্রতি বছর আমি আমার ছাত্রদের নিউইয়র্কের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে নিয়ে যাই। এক অর্থে আমাদের মধ্যে অনেক মিল আছে, আমার এবং আপনার মধ্যে। আপনি কতোদিন ধরে ট্যুর গাইডের কাজ করছেন মি. কাপাসি?'

"পাঁচ বছর যাবত।"

মিসেস দাশ গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে জানতে চাইলেন, "আমাদেরকে কতো দূরে যেতে হবে।"

মি. কাপাসি উত্তর দিলেন, "প্রায় আড়াই ঘন্টার দূরত্ব।"

মিসেস দাশ অধৈর্যের দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, যেন তার পুরো জীবন কোন বিরতি ছাড়াই সফর করছেন। বোম্বের একটি ইংরেজি ফিল্ম ম্যাগাজিন ভাঁজ করে নিজেকে বাতাস করতে শুরু করলেন।

দাশবাবু তার ট্যুর বই এর উপর হাত রেখে বললেন, "আমার ধারণা ছিল সান টেম্পল পুরী থেকে মাত্র আঠার মাইল উত্তরে।"

"কোনারকের দিকের রাস্তাগুলোর অবস্থা খুব খারাপ। এখান থেকে দূরত্ব বায়ান্ন মাইল।" মি. কাপাসি বললেন।

ঘাড়ে ক্যামেরার বেল্ট ঠিক করতে করতে মাথা ঝুঁকালেন। গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আগে মি. কাপাসি পিছনে হাত দিয়ে নিশ্চিত হতে চাইলেন যে, পিছনের দরজা দু'টো ঠিকভাবে লাগানো আছে। গাড়ি চলতে শুরু করলে ছোট্ট মেয়েটি তার পাশের দরজার লক নিয়ে খেলতে শুরু করলো; একবার সামনে ঠেলে দিচ্ছিল, আবার পিছনে টানছিল। তাকে থামাতে মিসেস দাশ কিছুই বললেন না। পিছনের সিটের একপাশে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিলেন তিনি এবং ঠোঙ্গায় করে আনা ঝালমুড়ি কাউকে সাধছিলেন না। রনি এবং টিনা তার দু'পাশে। দু'জনই উজ্জ্বল সবুজ চুইংগাম খাচ্ছে।

গাড়ি জোরে চলতে শুরু করেছে। রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ দীর্ঘ গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ববি বললো,

"লুক, লুক!"

'মাংকি!' রনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, "ওয়াও!"

বানরগুলো দল বেঁধে গাছের ডালে বসে ছিল, চকচকে কালো মুখ, রূপালি শরীর, সমান্তরাল ভুরু এবং মাথায় ঝুঁটি। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বানরের লেজ ঝুলছে দড়ির সারির মতো। কিছু বানর নিজেদের গা চুলকাচ্ছে কালো পুরু হাত দিয়ে অথবা পা দিয়ে ডাল আঁকড়ে ঝুলছে অতিক্রান্ত গাড়ির দিকে তাকিয়ে।

"আমরা ওদেরকে হনুমান বলি" মি. কাপাসি বললেন, "এ এলাকার সর্বত্র দেখা যায়।"

তার কথা বলার সময়ে একটি বানরকে দেখা গেল রাস্তার মাঝখানে বসে পড়েছে। মি. কাপাসিকে জোরে ব্রেক কষতে হলো। একটি বানর গাড়ির বনেটে লাফ দিয়ে উঠে চলে গেল। মি. কাপাসি হর্ণ বাজালেন। বাচ্চাগুলো মজা পেতে শুরু করেছে এবং কিছুটা ভীত। শ্বাসরুদ্ধ করে এবং হাত দিয়ে মুখ খানিকটা ঢেকে রেখেছে। চিড়িয়াখানার বাইরে তারা কখনো বানর দেখেনি। মি. কাপাসিকে দাশবাবু বললেন গাড়ি থামাতে, যাতে তিনি একটি ছবি তুলতে পারেন।

দাশবাবু যখন তার টেলিলেন্স এডজাস্ট করছিলেন তখন মিসেস দাস তার ব্যাগ থেকে রং বিহীন নেলপলিশের বোতল বের করে তার তর্জনীর নখে লাগানোর উদ্যোগ নিতেই মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলো, "আমারটাও মাম্মি, আমার নখেও লাগিয়ে দাও।"

মিসেস দাশ তার নখ উঁচু করে ধরে এবং শরীরটা একটু ঘুরিয়ে বললেন, "আমাকে বিরক্ত করো না। তুমি সব নষ্ট করে দেবে।"

মেয়েটি তার পুতুলের জামার বোতাম লাগানো ও বন্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

লেন্স এডজাস্ট করে দাশবাবু বললেন, "সব ঠিক আছে।"

ধূলিময় এবড়োথেবড়ো রাস্তায় গাড়িটি মোটামুটি গতিতে এগুচ্ছিল। তাতে যাত্রীরা যখন তখন ঝাঁকুনির মোকাবিলা করলেও মিসেস দাশ তার নখে পলিশ লাগানো অব্যাহত রেখেছিলেন। মি. কাপাসি একসিলেটর সহজে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। গিয়ার পরিবর্তনের জন্যে তিনি হাত বাড়ালে সামনে বসা ছেলেটি তার লোমহীন হাঁটু সরিয়ে তার কাজ সহজ করে দিয়েছে। মি. কাপাসি লক্ষ করেছেন যে, এই ছেলেটি অন্য দুই বাচ্চার চাইতে কিছুটা ফ্যাকাসে বর্ণের। ছেলেটি হঠাৎ জানতে চাইলো, "ড্যাডি, এই গাড়িতেও ড্রাইভার রং সাইডে বসেছে কেন?"

"আরে 'ডামি', এখানে নিয়মই এরকম।" পিছন থেকে রনি বলে উঠলো। দাশগুপ্ত বললেন, "ভাইকে ডামি বলো না।" মি. কাপাসির দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আপনি তো জানেন, আমেরিকায় গাড়ির ড্রাইভার বামদিকে বসে। এর ফলে ওদের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে।" "জি, জি, আমি তা জানি।" মি. কাপাসি বললেন। একটি পাহাড়ের কাছে পৌঁছে তিনি আবার গিয়ার পাল্টালেন। "ডাল্লাসে আমি দেখেছি, গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল বাম দিকে।"

"ডাল্লাস কি?" টিনা জানতে চাইলো তার নগ্ন পুতুলটিকে মি. কাপাসির সিটের পিছনে আঘাত করতে করতে।

"এটা একটি টেলিভিশন শো।" দাশগুপ্ত ব্যাখ্যা করলেন। একসারি খেজুর গাছ অতিক্রম করার সময় মি. কাপাসির মনে হলো এরা সবাই আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত। দাশবাবু এবং তার স্ত্রীর ব্যবহার বড় ভাই বোনের মতো, বাবা মা'র মতো নয়। মনে হচ্ছিল, সেদিনের জন্যেই ছেলেমেয়েগুলোর দায়িত্ব তাদের উপর। বিশ্বাস করা কঠিন যে, তারা নিয়মিত যে কোন কিছুর জন্যে নিজেদের উপর নির্ভরশীল। মি. দাশের হাত ক্যামেরার লেন্স ক্যাপ ও ট্যুর বই এর উপর। মাঝে মাঝে বই এর পৃষ্ঠায় বৃদ্ধাঙ্গুলি নখ টেনে নিচ্ছেন, যা আঁচড় কাটার মতো শব্দ তুলছে। মিসেস দাশ তখনো নখে পলিশ লাগাচ্ছেন। তখনো চোখ থেকে সানগ্লাস নামান নি।

মাঝে মধ্যে টিনা আবদার করছে যে সেও তার নখে পলিশ লাগাতে চায়। এক পর্যায়ে বোতলটা ব্যাগে ভরে রাখার আগে তিনি ছোট্ট মেয়ের নখের উপর এক ফোঁটা পলিশ লাগিয়ে দিলেন।

"এটা কি এয়ারকন্ডিশণ্ড গাড়ি নয় ?" সে প্রশ্ন করলো, তখনো সে নখে ফুঁ দিচ্ছে। টিনার পাশের জানালা ভাঙ্গা এবং কাঁচ নামানো যায় না।

"অভিযোগ করার অভ্যাস ছাড়ো।" দাশবাবু বললেন। "এখন তেমন গরম নয়।"

"আমি তোমাকে বলেছিলাম একটি এয়ারকন্ডিশণ্ড গাড়ি নিতে" মিসেস দাশ বললেন। "তুমি এটা করো কেন, রাজ ? সামান্য ক'টা টাকা বাঁচাবার জন্যে ? এতে আমাদের কতোটা সাশ্রয় হবে, পঞ্চাশ সেন্ট ?"

তাদের ইংরেজি উচ্চারণ মি. কাপাসির কাছে আমেরিকান টেলিভিশন প্রোগ্রামে শোনা উচ্চারণের মতো মনে হলো, যদিও তা 'ডাল্লাসে'র মতো নয়।

"মি. কাপাসি, আপনার কাছে কি খুব বিরক্তিকর লাগে না যে, প্রতিদিন লোকদের একই জিনিস দেখাতে ?" দাশবাবু জানতে চাইলেন। তার পাশের কাঁচটি সারা পথ নামানো ছিল। "গাড়ি থামালে তোমরা কি কিছু মনে করবে। আমি ওই লোকটির ছবি তুলতে চাই।"

রাস্তার পাশে গাড়ি থামালেন মি. কাপাসি। গরুর গাড়িতে গমের বস্তার উপরে মাথায় নোংরা পাগড়ি জড়ানো খালি পায়ে বসা লোকটির ছবি তুললেন দাশবাবু। লোকটি এবং গরু দু'টি সমান হাড্ডিসার। পিছনের সিটে বসে মিসেস দাশ আরেকটি জানালা দেখছিলেন আকাশে, যেখানে প্রায় স্বচ্ছ মেঘ একটি আরেকটি অতিক্রম করে যাচ্ছে।

গাড়ি চলতে শুরু করলে মি. কাপাসি বললেন, "দীর্ঘদিন থেকেই আমি অপেক্ষা করছিলাম এখানে আসতে। সান টেম্পল আমার প্রিয় জায়গাগুলোর একটি। সেক্ষেত্রে এটা আমার জন্যে বিরাট প্রাপ্তি। শুক্র ও শনিবার আমি ট্যুরিস্টদের নিয়ে বের হই। সপ্তাহের অবশিষ্ট দিনগুলোতে আমি অন্য একটি চাকুরি করি।"

"তাই নাকি ? কোথায় ?" দাশবাবু জানতে চাইলেন।

"একজন ডাক্তারের অফিসে কাজ করি।"

"আপনি কি ডাক্তার ?"

"আমি ডাক্তার নই। তবে এক ডাক্তারের সাথে কাজ করি। দোভাষী হিসেবে।"

"একজন ডাক্তারের দোভাষীর প্রয়োজন কেন ?"

"তার অনেক গুজরাটি রোগী। আমার বাবাও গুজরাটি ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারসহ এ এলাকার খুব বেশি লোক গুজরাটি ভাষায় কথা বলে না। সেজন্যে ডাক্তার আমাকে তার অফিসে কাজ করতে বললেন। রোগীদের কি সমস্যা তা শুনে আমি ডাক্তারকে বলি।"

"বেশ মজার কাজ তো। আমি কখনো এ ধরনের কোনকিছুর কথা শুনিনি।" দাশবাবু বললেন।

মি. কাপাসি কাঁধ ঝাঁকালেন, "অন্য যে কোন চাকুরির মতোই এটা।"

"কিন্তু বেশ রোমান্টিক", মিসেস দাশ স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বললেন, তার দীর্ঘ নীরবতা ভেঙ্গে তিনি তার গোলাপি-ধূসর সানগ্লাস চোখ থেকে তুলে তার মাথার উপরে রাখলেন টিয়ারার মতো। প্রথম বার মি. কাপাসি রিয়ার ভিউ মিররে তার চোখ দেখলেন, ম্লান ছোট চোখ। তার দৃষ্টি স্থির, কিন্তু তন্দ্রাভাবের। দাশবাবুর স্ত্রীর দিকে তাকালেন, "এর মধ্যে রোমান্টিক কি দেখলে ?" "আমি জানি না। একটা কিছু হতে পারে।" তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন মুহূর্তের জন্যে ভ্রু কুচকে। "মি. কাপাসি, আপনাকে কি একটা চুইংগাম দেব ?" মিসেস দাস আন্তরিকতার সুরে বললেন। ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে সবুজ ও সাদা স্ট্রাইপের কাগজে মোড়ানো একটি ছোট চৌকোনো চুইংগাম তাকে দিলেন। মি. কাপাসি চুইংগাম মুখে দেয়ার সাথে সাথে তার জিহবা দিয়ে মিষ্টি তরল ছড়িয়ে পড়লো।

"আপনার চাকুরিটা সম্পর্কে আমাকে আরো কিছু বলুন মি. কাপাসি", মিসেস দাশ বললেন।

"আপনি কি জানতে চান, ম্যাডাম ?"

আবার কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। "আমি জানি না।" ঝালমুড়ি চিবুতে চিবুতে এবং মুখের এক পাশে লেগে যাওয়া সর্ষের তেল চাটতে চাটতে তিনি বললেন। "আমাদেরকে একটি বিশেষ পরিস্থিতির কথা বলুন।" নড়েচড়ে বসলেন মিসেস দাশ, তার মাথায় রোদ পড়ছিল। তিনি চোখ বন্ধ করলেন। "আমি উপলব্ধি করতে চাই যে, কি ঘটতে পারে।"

"শুনুন তাহলে। সেদিন এক লোক এলো তার গলার ব্যথা নিয়ে।"

"লোকটি কি সিগারেট টানে ?"

"না। ব্যাপারটা অদ্ভুত। তিনি বললেন যে, তার সবসময় মনে হয় গলার মধ্যে লম্বা খড়ের টুকরা আটকে আছে। ডাক্তারকে সমস্যা বুঝিয়ে বলার পর তিনি যথাযথ ওষুধ লিখে দিলেন।"

"ভালোই তো।"

"জি", মি. কাপাসি খানিক দ্বিধার পর বললেন।

"তাহলে এসব রোগী পুরোপুরি আপনার উপর নির্ভরশীল।" মিসেস দাশ বললেন ধীরে ধীরে, যেন তিনি চিন্তা করছেন। "বলতে গেলে রোগীগুলো ডাক্তারের চাইতে আপনার উপরই বেশি নির্ভরশীল। আপনি কিভাবে বুঝাবেন ? কিভাবে তা হতে পারে ?"

"ধরুন, আপনি ডাক্তারকে বলতে পারেন যে, ব্যথাটা জ্বলুনির মতো অনুভূত হচ্ছে, খড়ের খোঁচার মতো নয়। রোগী কখনো জানতে পারবে না যে, আপনি ডাক্তারকে কি বলেছেন এবং ডাক্তারের পক্ষেও জানা সম্ভব নয় যে, আপনি তাকে ভুল বলেছেন। আপনার দায়িত্বটা বিরাট।"

"হ্যাঁ, মি. কাপাসি, এক্ষেত্রে আপনার বিরাট দায়িত্ব।" দাশবাবু সম্মতি প্রকাশ করলেন।

মি. কাপাসি কখনো তার চাকুরিতে শুভেচ্ছা লাভের মতো কিছু আছে এমন ভাবেননি। তার কাছে কাজটা ধন্যবাদ পাওয়ার অযোগ্য। মানুষের রোগব্যাধি ভাষান্তর করে দেয়া, অস্থি ফুলে যাওয়ার লক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করা, পেটের খিচুনি ও পায়খানার অবস্থা বলা, রোগীদের হাতের তালুর পরিবর্তিত রং বা তালুর উপর দাগের আকৃতি ইত্যাদি বর্ণনা করার মধ্যে মহান কিছু দেখতে পাননি। ডাক্তারের বয়স তার বয়সের প্রায় অর্ধেক। বেলবটম প্যান্টের প্রতি তার দুর্বলতা আছে। কংগ্রেস পার্টি সম্পর্কে তিনি মজার মজার কৌতুক তৈরি করেন। ছোট্ট এক হাসপাতালে তারা দু'জন মিলে কাজ করেন, যেখানে মি. কাপাসি তার তৈরি চৌকস কাপড়গুলো মাথার উপর সিলিং ফ্যানের বাতাসে শুকানোর পরিবর্তে রোদে শুকান।

চাকুরিটা মি. কাপাসির ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত। যৌবনে তিনি বিদেশী ভাষার ব্যাপারে আত্মনিবেদিত পণ্ডিত ছিলেন। তার সংগ্রহে দুর্লভ সব ডিকশনারি ছিল। তার স্বপ্ন ছিল কূটনীতিক ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দোভাষী হবেন, মানুষ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করবেন, কারণ সে ধরনের পরিস্থিতিতে দু'পক্ষের কথা একমাত্র তিনিই বুঝবেন। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত মানুষ। বাবা মা তার বিয়ে ঠিক করার আগের সন্ধ্যাগুলোতে তিনি তার নোটবইগুলোতে শব্দের অভিন্ন প্রকৃতি সম্পর্কিত তালিকা তৈরি করছিলেন এবং এক পর্যায়ে তিনি আস্থাশীল হয়ে উঠেন যে, তাকে সুযোগ দেয়া হলে তিনি ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, পর্তুগিজ ও ইটালীয় ভাষায় কথা বলতে পারবেন। এর বাইরে হিন্দি, বাংলা, উড়িয়া ও গুজরাটি তো আছেই। এখনো তিনি স্মৃতিতে শুধু যে অনেক ইউরোপীয় বাগধারা ধরে রেখেছেন তাই নয়, সসার এবং চেয়ারের মতো জিনিসের বিক্ষিপ্ত অনেক শব্দ তার মনে আছে। ভারতের বাইরের ভাষার মধ্যে একমাত্র ইংরেজিই তিনি অনর্গল বলতে পারেন। মি. কাপাসি জানেন যে, এটা তেমন কোন মেধা নয়। কখনো তার ভয় হয় যে, তার সন্তানরা শুধু টেলিভিশন দেখেই তার চাইতে ভালো ইংরেজি জানে। তবু এখনো ট্যুর পরিচালনায় ইংরেজিতে তার দক্ষতা বেশ কাজে লাগে।

তার প্রথম সন্তান সাত বছর বয়সে টাইফয়েডে আক্রান্ত হবার পর তিনি দোভাষীর চাকুরি নেন—সন্তানের চিকিৎসা করাতে গিয়েই ডাক্তারের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। তখন মি. কাপাসি একটি গ্রামার স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন এবং দোভাষী হিসেবে তার দক্ষতার বিনিময় করতেন সন্তানের চিকিৎসার ক্রমবর্ধমান ব্যয় পরিশোধে। শেষ পর্যন্ত এক সন্ধ্যায় মায়ের কোলেই ছেলেটি মারা গেল। প্রচণ্ড জ্বরে মি. কাপাসির শরীর পুড়ছিল। কিন্তু সন্তানের দাহ করার খরচ আছে। অন্য যে সন্তানদের শীঘ্র আগমন ঘটবে, নতুন বড় বাড়ি, ভালো স্কুল

ও শিক্ষক, সুন্দর জুতা, টেলিভিশন এবং আরো অনেকভাবে তিনি চেষ্টা করেছেন তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে, রাতে কেঁদে উঠা থামাতে। ডাক্তার যখন তাকে গ্রামার স্কুলের বেতনের চাইতে দ্বিগুণ বেতন দিতে চাইলেন, তখন মি. কাপাসি চাকুরিটা পাকাপাকি গ্রহণ করলেন। তিনি জানেন, দোভাষীর পেশার প্রতি তার স্ত্রীর সামান্য শ্রদ্ধাও নেই। তিনি জানেন, তার চাকুরি তার স্ত্রীকে পুত্র হারানোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অন্যদের জীবন বাঁচাতে তিনি যে সহায়তা করেন তা নিয়ে সে ক্ষুব্ধ। কখনো যদি তাকে স্বামীর পদবি সম্পর্কে উল্লেখ করতে হয় তাহলে তার স্ত্রী 'ডাক্তারের সহকারী' শব্দটি ব্যবহার করেন এমনভাবে যেন দোভাষীর প্রক্রিয়াটা কারো তাপমাত্রা নেয়া অথবা বেডপ্যান পাল্টে দেয়ার মতো ব্যাপার। ডাক্তারের কাছে যারা আসে সেসব রোগী সম্পর্কে তিনি কখনো স্বামীর কাছে জানতে চান নি অথবা বলেন নি যে, তার কাজটা একটি বিরাট দায়িত্ব।

এ কারণে মি. কাপাসি আত্মতৃপ্তি অনুভব করলেন যে, মিসেস দাশ তার চাকুরির ব্যাপারে এতোটা ঔৎসুক। তার কাজের যে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক দিকও আছে তিনি তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যা তার স্ত্রী করেন না। তিনি 'রোমান্টিক' শব্দটিও ব্যবহার করেছেন। স্বামীর প্রতি রোমান্টিক আচরণ না করলেও তাকে বর্ণনা করতে তিনি এই শব্দটি প্রয়োগ করলেন। তিনি ভাবলেন যে, দাশবাবু ও তার স্ত্রী বাজে সম্পর্কের জুটি কিনা, যা তার নিজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সম্ভবত তাদের তিনটি সন্তান এবং এক দশকের জীবন ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সামান্যই অভিন্নতা আছে। নিজের বিবাহিত জীবন থেকে তিনি যে লক্ষণগুলো সনাক্ত করতে পারেন তা হলো—বিতর্ক, নৈর্ব্যক্তিক বা উদাসীন ভাব এবং সুদীর্ঘ নীরবতা। তার ব্যাপারে সহসা আগ্রহ, যা তিনি স্বামী বা সন্তান কারো ক্ষেত্রেই প্রকাশ করেন নি, তা একটু হলেও বাড়াবাড়ি মনে হলো। মি. কাপাসি আরেকবার ভাবলেন যে, কিভাবে তিনি 'রোমান্টিক' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, তখন তার মধ্যে আবেগের অনুভূতি আরো বাড়লো।

গাড়ি চালাতে চালাতে মি. কাপাসি রিয়ার ভিউ মিররে নিজের চেহারার প্রতিফলন লক্ষ করে কৃতজ্ঞতা অনুভব করলেন যে, সকালে তিনি ধূসর স্যুট পছন্দ করেছিলেন, বাদামিটা নয়। মাঝে মাঝেই তিনি মিররে মিসেস দাশকে দেখছিলেন। মুখ দেখা ছাড়াও তিনি তার দুই স্তনের মাঝখানে স্ট্রবেরির দিকেও তাকাচ্ছিলেন এবং তার গলার সোনালি বাদামি গর্তটার উপর চোখ পড়ছিল। তিনি মিসেস দাশকে আরেকজন রোগীর কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং পরে আরেকটি ঃ এক তরুণীর কথা, যে তার মেরুদণ্ডে বৃষ্টির ফোটা পড়ার মতো অনুভূতি নিয়ে এসেছিল এবং এক ভদ্রলোকের কথা, যার জন্মদাগে লোম গজাতে শুরু করেছিল। মিসেস দাশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন প্লাস্টিকের ব্রাশ দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছিলেন এবং আরো রোগী সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন। বাচ্চাগুলো শান্তভাবে বসে গাছের ডালে আরো বানর দেখার জন্যে

উদগ্রীব হয়ে তাকাচ্ছে। দাশবাবু তার ট্যুর বই-এ ডুবে আছেন। অতএব আলোচনাটা মনে হচ্ছিল মি. কাপাসি ও মিসেস দাশের মধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ের আলোচনা। এভাবে পরবর্তী আধ ঘণ্টা কাটলো এবং তারা যখন দুপুরের খাবার খেতে রাস্তার পাশে একটি রেস্টুরেন্টে থামলেন এবং সাধারণত ট্যুরে তিনি যা খেতে পছন্দ করেন, বেগুনি, ওমলেট ও স্যান্ডউইচ এগুলো নিয়ে কোথাও শান্তিতে বসবেন এবং গরম চা পান করবেন। কিন্তু তিনি হতাশ হলেন। দাশ পরিবার একটি সাদা ও কমলা ঝালরওয়ালা লাল ছাতার নিচে বসেছে। একজন ওয়েটারকে খাবারের অর্ডার দিয়েছে। মি. কাপাসি অনিচ্ছার সাথে পাশের একটি টেবিলের দিকে এগুলেন।

"মি. কাপাসি, এদিকে আসুন। এখানেই জায়গা আছে।" মিসেস দাশ ডাকলেন। টিনাকে কোলে তুলে নিলেন তার বসার জায়গা করে দিতে। তারা একসাথে ম্যাঙ্গো জুস, স্যান্ডউইচ, পটেটো ফ্রাই নিয়ে বসলো। দাশবাবু দু'টি ওমলেট স্যান্ডউইচ শেষ করে উঠে সবার ছবি তুললেন।

"আর কতদূর ?" তিনি নতুন ফিল্ম ক্যামেরায় ভরতে ভরতে মিঃ কাপাসিকে বললেন।

"আর আধ ঘণ্টা লাগবে।"

বাচ্চাগুলো খাবার সেরে টেবিল থেকে উঠে গেছে নিকটস্থ গাছে ঝুলে থাকা বানর দেখতে। মিসেস দাশ ও মি. কাপাসির মধ্যে ব্যবধান বেশ। দাশবাবু ক্যামেরা মুখের সামনে নিয়ে এক চোখ বন্ধ করেছেন, তার জিহবা মুখের এক কোনায় বের হয়ে আছে। "মিনা, দেখতে ভালো লাগছে না। তুমি মি. কাপাসির দিকে আরো একটু ঘেঁসে বসো।"

মিসেস দাশ তাই করলেন। তার ত্বকের সুবাস পেলেন মি. কাপাসি। হুইস্কি ও গোলাপজলের গন্ধ। সহসা তার মনে আশঙ্কা জাগলো যে, তার ঘামের গন্ধ মিসেস দাশের নাকে যাবে। কারণ তিনি জানেন, তার সিনথেটিক কাপড়ের শার্টের নিচে ঘাম জমেছে। এক চুমুকে তিনি তার ম্যাঙ্গো জুস পান করে হাত দিয়ে রূপালি চুল ঠিক করলেন। এক ফোটা জুস থুতনিতে লেগে আছে। মিসেস দাশ কি তা লক্ষ করেছেন।

না তিনি লক্ষ করেননি। "আপনার ঠিকানাটা বলুন তো, মি. কাপাসি।" তিনি জানতে চাইলেন। ব্যাগের মধ্যে কি যেন হাতড়াচ্ছেন।

"আমার ঠিকানা দিয়ে কি হবে ?"

"যাতে আপনাকে ছবির কপিগুলো পাঠাতে পারি।" তিনি বললেন মি. কাপাসির হাতে একট টুকরা কাগজ দিয়ে। তার ফিল্ম ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা থেকে ছেঁড়া। তাতে লিখার জায়গা সামান্য। ইউক্যালিপটাস গাছের নিচে নায়ক ও নায়িকার জড়াজড়ি করে ধরা ছবির নিচে বর্ণনা লিখায় মার্জিনের জায়গা কমে গেছে।

মি. কাপাসি কাগজের টুকরায় পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে ঠিকানা লিখলেন। মিসেস দাশ তাকে লিখবেন ডাক্তারের অফিসে তার দোভাষীর কাজ কেমন চলছে তা জানতে এবং অলংকারপূর্ণ ভাষায় সাড়া দেবেন মি. কাপাসি। সবচাইতে মজার কাহিনী বাছাই করে লিখবেন, যেগুলো মিসেস দাশকে সশব্দে হাসাবে যখন তিনি তার নিউজার্সির বাড়িতে চিঠি পড়বেন। এক পর্যায়ে মিসেস দাশ তার হতাশাপূর্ণ বিয়ের কথা প্রকাশ করবেন এবং মি. কাপাসি লিখবেন নিজেরটা। এভাবে তাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে, গভীর হবে। তিনি তাদের দু'জনের একসাথে তোলা ছবি, যেটি লাল ছাতার নিচে বসে ফ্রায়েড অনিয়ন খাওয়ার সময় তোলা হয়েছে, সেটি তার রুশ গ্রামার বই এর পৃষ্ঠার ফাঁকে রাখবেন বলে স্থির করলেন। মনের দৌড়ের সাথে মি. কাপাসির মৃদু আনন্দময় অনুভূতির অভিজ্ঞতা হলো। এ অনুভূতি দীর্ঘদিন আগেও তার হতো, যখন তিনি একটি ডিকশনারির সহায়তায় মাসের পর মাস ধরে অনুবাদ করার পর শেষ পর্যন্ত একটি ফরাসি উপন্যাসের অংশবিশেষ পাঠ করতে অথবা একটি ইটালিয়ান সনেট পড়তে সক্ষম হতেন। নিজের চেষ্টায় একটির পর একটি শব্দের মর্ম উদ্ধার করতেন। সেই মুহূর্তগুলোকে মি. কাপাসি বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বের সবকিছুই সঠিক, সকল সংগ্রামের পুরস্কার অর্জিত হয় এবং শেষপর্যন্ত জীবনের সকল ভুলভ্রান্তির একটি অর্থ আবিষ্কৃত হয়। মিসেস দাসের কাছে থেকে যে প্রতিশ্রুতি তিনি শুনলেন তা পূর্বের সেই বিশ্বাসের মতোই তাকে পূর্ণ করলো।

ঠিকানা লিখা শেষ হলে মি. কাপাসি তার হাতে কাগজটি তুলে দিলেন এবং সাথে সাথে তার ভয় হলো যে, তিনি হয় নিজের নামের বানানে ভুল করেছেন, অথবা তার পোস্টাল কোড নম্বর উল্টো লিখেছেন। তার মনে আরো আশংকার সৃষ্টি হলো যে, মিসেস দাশের চিঠি হারিয়ে যেতে পারে, পাঠানো ছবি হয়তো কোনদিন তার কাছে পৌছবে না। উড়িষ্যার কোথাও ঘুরতে থাকবে চিঠি; কাছেই, কিন্তু পাওয়ার মতো নয়। তিনি আবার ঠিকানা লিখা কাগজের টুকরাটি চাওয়ার কথা ভাবলেন; শুধু নিশ্চিত হওয়ার জন্যে যে, ঠিকানা সঠিকভাবে লিখা হয়েছে। কিন্তু মিসেস দাশ ইতোমধ্যে সেটি তার ব্যাগের অনেক সামগ্রীর মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

বেলা আড়াইটায় তারা কোনারকে পৌছলেন। বেলেপাথরে তৈরি মন্দিরটি একটি রথের আকৃতি বিশিষ্ট পিরামিডের মতো বিশাল এক সৌধ। এই মন্দির নিবেদিত হয়েছে জীবনের মহান প্রভু সূর্যের নামে। সূর্য প্রতিদিন আকাশে যাত্রা শুরুর সময় সৌধের তিন পাশে আলোয় উদ্ভাসিত করে। স্তম্ভমূলের উত্তর ও দক্ষিণ পাশে চব্বিশটি বিশালাকৃতির চাকা খোদাই করে তৈরি। পুরো মন্দিরকে টানছে সাতটি ঘোড়া, যেন স্বর্গের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে। মন্দিরের কাছাকাছি উপনীত

হতেই মি. কাপাসি বললেন যে, ১২৪৩ থেকে ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে। নির্মাণকাজে নিয়োজিত ছিলেন বারশত নির্মাণকর্মী ও শিল্পী এবং গঙ্গা রাজবংশের মহান শাসক রাজা প্রথম নরসিংহদেবের দ্বারা বিখ্যাত সান টেম্পল বা সূর্য মন্দির নির্মিত হয়েছিল মুসলিম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয়ের স্মরণে।

দাশবাবু তার বই পাঠ করে বললেন, "প্রায় একশ' সত্তর একর জমির উপর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত।"

"জায়গাটা মরুভূমির মতো", রনি মন্দিরের অদূরে সর্বত্র বিস্তৃত বালিরাশি দেখে মন্তব্য করলো।

"একসময় চন্দ্রভাগা নদী এখান থেকে এক মাইল উত্তর দিয়ে প্রবাহিত হতো। নদী এখন শুকিয়ে গেছে।" গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে মি. কাপাসি বললেন।

তারা গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরের দিকে পা বাড়ালো। সিঁড়ির পাশে একজোড়া সিংহমূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে ছবির জন্যে পোজ দিলো। মি. কাপাসি তাদেরকে নিয়ে গেলেন রথের একটি চাকার কাছে, যে কোন আকৃতির মানুষের চাইতে উঁচু, ব্যাস নয় ফুট। দাশবাবু বই দেখে বললেন, "এই চাকাগুলোকে বিবেচনা করা হয় জীবন চক্রের প্রতীক হিসেবে। সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও উপলব্ধিগত অর্জনের প্রতিচ্ছবি। কি শান্ত।" বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টালেন তিনি। "প্রতিটি চাকা আটটি পুরু ও হালকা দণ্ড দ্বারা বিভক্ত, যা দিনকে আটটি সমান অংশে ভাগ করার বিষয় বুঝানো হয়েছে। চাকার প্রান্ত জুড়ে পশুপাখির চিত্র খোদাই করা। চাকার দণ্ডগুলোতে খোদাই করা হয়েছে অনুপম ভঙ্গির নারীমূর্তি, অধিকাংশই যৌন আবেদনমূলক।"

তিনি যে বর্ণনা পড়ছিলেন তা অসংখ্য নগ্ন দেহের জড়াজড়ি অবস্থার খোদাই করা দৃশ্য। বিভিন্ন আসনে সঙ্গমরত নরনারী, নারীরা ঝুলে আছে পুরুষদের গলায়, তাদের হাঁটু চিরন্তনভাবে প্রেমিকের উরুর মাঝে ঢাকা পড়েছে। এছাড়া আছে দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্য, শিকার, ব্যবসা, তীরধনুক দিয়ে হরিণ শিকার করা হচ্ছে এবং সৈন্যরা হাতে তলোয়ার নিয়ে কুচকাওয়াজ করছে।

এখন আর মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। কারণ বহুবর্ষ পূর্বে পাথরের স্তূপ দিয়ে প্রবেশদ্বার বন্ধ করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু তারা মন্দিরের বহিরাবরণের প্রশংসা করলেন, যা মি. কাপাসির নিয়ে আসা সব পর্যটকই করে থাকে মন্দিরের চারপাশ ঘুরে দেখতে দেখতে। মি. দাশ পিছনে পড়ে গেছেন, ছবি তুলছেন তিনি। বাচ্চাগুলো বেশ আগে, নগ্নচিত্র আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। নাগমিথুন, অর্ধেকটা মানুষও বাকি অর্ধেকটা সাপের আকৃতির দম্পতির দৃশ্য তাদেরকে কৌতূহলী করে তুলেছে, যেগুলো মি. কাপাসির মতে, সমুদ্রের গভীরতম অংশে বাস করে। মি. কাপাসি খুশি যে, মন্দিরটি তাদের ভালো লেগেছে। তিনি বিশেষভাবে খুশি যে, মিসেস দাশ মন্দির পছন্দ করেছেন। তিনি চার পা ফেলেই

তিনি থামছেন, খোদিত প্রেমিক প্রেমিকাদের, হাতির শোভাযাত্রা, নগ্নবক্ষা মহিলা বাদ্যবাদকের ঢোল বাজানোর দৃশ্য নীরবে অবলোকন করছেন।

বহুবার মন্দিরে এসেছেন মি. কাপাসি। তিনিও নগ্নবক্ষা নারীদের দিকে দেখছিলেন। অথচ তিনি নিজের স্ত্রীকেও কখনো পুরোপুরি নগ্ন অবস্থায় দেখেননি। এমনকি যখন তারা সঙ্গমে লিপ্ত হয়, তখনো তার স্ত্রী ব্লাউজের হুক আটকে রাখে। পেটিকোটের ফিতা তখনো গিট দেয়া থাকে। মিসেস দাশের পায়ের পিছনের অংশ মি. কাপাসি যতোটা মুগ্ধ নিজের স্ত্রীর পায়ের দিকে তাকিয়ে কখনো তার মনে প্রশংসার ভাব জাগেনি। মিসেস দাশ যেন কাপাসির সুবিধার জন্যেই হাঁটছেন। তার আগেও তিনি বহু নারীর নগ্নপদ ও অন্যান্য অঙ্গের নগ্ন অংশ দেখেছেন, বিশেষ করে তাকে ট্যুর গাইড হিসেবে নিয়েছে যেসব ইউরোপীয় ও আমেরিকান মহিলা, তাদের। অন্যান্য মহিলাদের আগ্রহ ছিল শুধু মন্দিরের ব্যাপারে এবং তারা গাইড বইয়ের মধ্যে তাদের নাক ডুবিয়ে রেখেছে অথবা তাদের চোখ রেখেছে ক্যামেরার লেন্সের পিছনে, কিন্তু মিসেস দাশ তার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন।

মিসেস দাশের সাথে একান্ত হবার ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন মি. কাপাসি, তাদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা বিনিময় করার জন্যে। যদিও তার পাশাপাশি হাঁটতে তিনি কিছুটা বিচলিত বোধ করছেন। মিসেস দাশ সানগ্লাসের আড়ালে হারিয়ে গেছেন, আরেকটি ছবি তোলার জন্যে দাঁড়াতে স্বামীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন তিনি, নিজের সন্তানদের পাশ কেটে সামনে গেলেন, যেন তারা তার অপরিচিত। তিনি তাকে বিরক্ত করছেন কিনা দ্বিধা নিয়ে মি. কাপাসি এগিয়ে গেলেন সূর্যের তিনটি পূর্ণ আকৃতির ব্রোঞ্জ নির্মিত অবতারের প্রশংসা করার জন্যে, যা তিনি সব পর্যটকের ক্ষেত্রেই করেন। প্রতিটি সূর্য দেবতা মন্দির গাত্রের কোটর থেকে উত্থিত প্রভাত, মধ্যাহ্ন এবং সন্ধ্যায় সূর্যকে অভিবাদন জানানোর জন্যে। তাদের মাথায় বিশাল পাগড়ি নিমীলিত আয়ত চোখ, খোলা বুকের উপর ঝুলে আছে খোদাই করা চেন ও মাদুলি। ধূসর-সবুজ পদপ্রান্তে ছড়িয়ে আছে দর্শকদের নিবেদন করা জবাফুলের পাপড়ি। শেষ মূর্তিটি মন্দিরের উত্তর দিকের প্রাচীরে; মি. কাপাসির প্রিয় মূর্তি এটি। সূর্যদেবের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। অশ্বপৃষ্ঠে আসীন দেবতা পা ভাঁজ করে আছেন সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে। তার ঘোড়ার চোখেও ঘুম ঘুম ভাব দেহজুড়ে জুটিবদ্ধ ছোট ছোট নারী ভাস্কর্য, তাদের নিতম্ব একদিকে প্রবলভাবে বের করা।

'ওটা কার মূর্তি' ? মিসেস দাশ প্রশ্ন করলেন। তাকে তার পাশে দাঁড়ানো দেখে মি. কাপাসি কিছুটা চমকে উঠলেন।

"অস্তাচেলা সূর্যের মূর্তি।" মি. কাপাসি বললেন। "অস্তায়মান সূর্য।"

"কয়েক ঘন্টার মধ্যে সূর্য তাহলে ঠিক এখানেই অস্ত যাবে ?" হিলজুতা থেকে একটি পা বের করে আরেক পায়ের পিছনে ঘষলেন।

"জ্বি, ঠিক বলেছেন।"

মুহূর্তের জন্যে তিনি চোখ থেকে সানগ্লাস তুললেন। আবার চোখে বসিয়ে বললেন, "পরিচ্ছন্ন।"

মি. কাপাসি নিশ্চিত হতে পারলেন না যে, এ শব্দ দিয়ে তিনি কি বুঝাতে চান। কিন্তু তার কাছে ইতিবাচক সাড়া বলেই মনে হলো। তিনি আশা করলেন যে, মিসেস দাশ সূর্যের সৌন্দর্যতার ক্ষমতা উপলব্ধি করেছেন। হয়তো চিঠিতে তারা এ ব্যাপারে আরো আলোচনা করতে পারবেন। মি. কাপাসি তাকে ভারতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করবেন এবং মিসেস দাশ ব্যাখ্যা করবেন আমেরিকা সম্পর্কে। এই যোগাযোগ নিজস্ব গতিতে দু'টি দেশের মধ্যে দোভাষী হিসেবে তার দায়িত্ব পালনের স্বপ্ন পূরণ করবে। তিনি মিসেস দাশের ব্যাগের দিকে তাকালেন, উৎফুল্ল বোধ করলেন যে, ব্যাগের অন্যান্য জিনিসের মধ্যে তার ঠিকানাটিও আছে। তাকে যখন বহু সহস্র মাইল দূরে কল্পনা করলেন তখন এতো আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলেন যে, দু'হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরার আকাঙ্ক্ষা জাগলো তার, মুহূর্তের জন্যে হলেও তাকে তার প্রিয় সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে আলিঙ্গন করে জমাটবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা হলো। কিন্তু মিসেস দাশ হাঁটতে শুরু করেছেন। "আপনারা কবে নাগাদ আমেরিকায় ফিরে যাবেন?" তিনি জানতে চাইলেন। কণ্ঠকে শান্ত করার চেষ্টা তার মধ্যে।

"দিন দশেকের মধ্যে।"

মনে মনে হিসাব কষছেন মি. কাপাসি : গুছিয়ে নিতে এক সপ্তাহ, ছবিগুলো প্রিন্ট করাতে এক সপ্তাহ, চিঠি লিখতে কয়েকটা দিন এবং বিমান ডাকে ভারতে চিঠি পৌঁছতে আরো দুই সপ্তাহ। তার হিসাব অনুসারে অনিবার্য বিলম্বগুলো ধরেও মিসেস দাশের চিঠি পেতে প্রায় ছ'সপ্তাহ লেগে যাবে।

মি. কাপাসি যখন তাদের ফিরিয়ে আনছিলেন তখন গাড়িতে সবাই নীরব ছিল। সাড়ে চারটার পর তারা হোটেল স্যান্ডি ভিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। বাচ্চারা সুভেনির হিসেবে কিনেছে গ্রানাইটে তৈরি রথের চাকার প্রতিকৃতি এবং একে অন্যের হাতে দিচ্ছে। দাশবাবু তখনো ট্যুর বই পড়ছেন। মিসেস দাশ টিনার চুল খুলে ব্রাশ করে দু'টি বেণী করে নিলেন।

তাদেরকে নামিয়ে দেয়ার চিন্তায় মি. কাপাসির মধ্যে এক ধরনের ভয় জাগতে শুরু হয়েছে। মিসেস দাশের চিঠি পাওয়ার জন্যে ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা শুরু করতে তিনি প্রস্তুত নন। রিয়ার ভিউ মিররে তার দিকে তাকালেন। টিনার চুলে ইলাস্টিক ব্যান্ড লাগিয়ে দিচ্ছেন। তিনি ভাবছেন কি করে ফেরার সময়কে আরো একটু প্রলম্বিত করা যায়। সাধারণত তিনি শর্টকাট রাস্তা ধরে পুরী ফিরে আসেন। বাড়িতে দ্রুত ফেরার তাগিদ থাকে। হাত পা চন্দন সাবান দিয়ে ধুয়ে সান্ধ্য দৈনিক

পাঠ এবং নীরবে তার স্ত্রীর দিয়ে যাওয়া এক কাপ চা পান উপভোগ করেন। স্ত্রীর নীরবতার চিন্তা মাথায় এলো তার। এ ব্যাপারে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন, এখন নিজেকে বিড়ম্বিত মনে হয়। তিনি দাশবাবুকে পরামর্শ দিলেন উদয়গিরি ও খন্দগিরি পাহাড় পরিদর্শন করতে, যেখানে সন্ন্যাসীদের মঠের মতো মাটির তৈরি বেশ কিছু ঘর, মুখোমুখি ও সারিবাঁধা। মি. কাপাসি বললেন, এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে হলেও বেশ দর্শনীয়।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ সম্পর্কে এই বইটায়ও কিছু লিখা আছে।" দাশবাবু বললেন। "একজন জৈন রাজার দ্বারা নির্মিত বা ঐ ধরনের কিছু।"

"তাহলে কি আমরা যাবো?" মি. কাপাসি প্রশ্ন করলেন। একটি মোড়ে থামলেন। "এখান থেকে বামে যেতে হবে।"

দাশবাবু স্ত্রীর দিকে ফিরলেন। দু'জনই কাঁধ ঝাঁকালেন।

"বামে, বামে।" বাচ্চারা কোরাস তুললো।

মি. কাপাসি গাড়ি ঘুরালেন। স্বস্তির উত্তেজনা তার মধ্যে। তিনি জানেন না যে, পাহাড়ে পৌঁছার পর তিনি কি করবেন বা মিসেস দাসকে কি বলবেন। সম্ভবত তাকে বলবেন যে, তার হাসি কি মধুর। হয়তো তার স্ট্রবেরিযুক্ত শার্টের প্রশংসা করবেন, যা তার কাছে অত্যন্ত সুন্দর মনে হয়েছে। দাশবাবু যখন ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকবেন তখন হয়তো তিনি মিসেস দাশের হাত ধরবেন।

তাকে ভাবতে হবে না। তারা পাহাড়ে পৌঁছলেন। দু'পাশে ঘন গাছের সারিসমৃদ্ধ খাড়া পথ দ্বারা পাহাড় দু'টি বিভক্ত। মিসেস দাশ গাড়ি থেকে নামতে চাইলেন না। পথ জুড়ে পাথরের উপর বসে আছে অনেক বানর, গাছের ডালেও। তাদের পিছনের পা দু'টি সামনে ছড়ানো এবং কাঁধ পর্যন্ত তোলা। হাত দু'টি হাঁটুতে রাখা।

"আমার পা দু'টি খুবই ক্লান্ত" সিটে গা এলিয়ে দিতে তিনি বললেন। "আমি এখানেই থাকবো।"

"তুমি কেন ওই উদ্ভট জুতা পরেছিলে?" দাশবাবু বললেন। "তুমি তো তাহলে ছবিতে থাকবে না।"

"মনে করো, আমি আছি।"

"আমরা হয়তো এ বছরের ক্রিসমাস কার্ডে এখানকার ছবির কোন একটা ব্যবহার করতে পারবো। সান টেম্পলেও তো আমাদের পাঁচজনের একসঙ্গে ছবি তোলা হয়নি। মি. কাপাসি ছবি তুলে দেবেন।

"আমি আসছি না। ওই বানর দেখেও আমার গা ভয়ে শিরশির করে।"

"কিন্তু ওরা তো কারো ক্ষতি করে না।" মি. কাপাসির দিকে ফিরে দাশবাবু বললেন। "তাই না?"

"ওরা বিপজ্জনকের চাইতে বরং বেশি ক্ষুধার্ত।" মি. কাপাসি বললেন। "খাবার দিয়ে ওদের প্ররোচিত না করলে, কাউকে বিরক্ত করবে না।" দাশবাবু

বাচ্চাদের সাথে নিয়ে মঠের দিকে এগুলেন। দুই ছেলে তার দু'পাশে। ছোট্ট মেয়েটা কাঁধে। মি. কাপাসি তাদেরকে এক জাপানি পুরুষ ও মহিলাকে অতিক্রম করতে দেখলেন। অন্য টুরিস্ট বলতে ওরা দু'জনই, যারা তাদের শেষ ছবি তোলার জন্যে থেমেছিল। কাছেই দাঁড়ানো গাড়িতে উঠে তারা চলে গেল। গাড়ি দৃষ্টির আড়াল হতেই কিছু বানর ডেকে উঠলো, কোমল আনন্দধ্বনির মতো। এরপর তারা তাদের চ্যাপ্টা হাত ও পায়ে ভর করে খাড়া পথ বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করলো। এক পর্যায়ে বানরগুলোর একটি দল দাশবাবু ও বাচ্চাদের ঘিরে একটি ছোট্ট বেষ্টনী রচনা করলো। টিনা চিৎকার করে উঠলো আনন্দে। রনি তার বাবাকে ঘিরে দৌড়াচ্ছে। ববি ঝুঁকে মাটি থেকে একটি মোটা লাঠি তুললো। লাঠিটি বাড়িয়ে ধরতেই একটি বানর এগিয়ে এসে সেটি কেড়ে নিয়ে মাটিতে কয়েক দফা আঘাত করলো।

"আমি তাদের সাথে যাচ্ছি", মি. কাপাসি তার পাশের দরজা খুলে বললেন। "গুহাগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে।"

"না যাবেন না। একটু অপেক্ষা করুন।" মিসেস দাশ পিছনের সিট থেকে বের হয়ে এসে মি. কাপাসির পাশে বসলেন। "রাজের কাছে তো বোবা বইটি আছে।" তারা দু'জনে উইন্ডশিল্ড দিয়ে দেখছেন ববি এবং বানর একে অন্যকে লাঠি দিচ্ছে ও নিচ্ছে।

"ছেলেটা ছোট্ট, কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী" মি. কাপাসি মন্তব্য করলেন।

"এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।" মিসেস দাশ বললেন।

"কেন?"

"ওতো তার নয়।"

"ক্ষমা করবেন। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"ওতো রাজের ছেলে নয়।"

মি. কাপাসি তার ত্বকে কাঁটার খোঁচা অনুভব করলেন। শার্টের পকেটে হাত দিলেন পদ্মের তেলের মলমের কৌটাটি বের করার জন্যে। এটি সবসময় সঙ্গে রাখেন এবং কপালের তিনটি জায়গায় প্রয়োগ করেন। তিনি বুঝতে পারছেন যে মিসেস দাশ তাকে লক্ষ করছেন। কিন্তু তার দিকে ফিরলেন না তিনি। বরং দেখছেন ক্রমেই ছোট হয়ে আসা দাশবাবু ও বাচ্চাদের দিকে। খাড়া পথ ধরে উঠছেন। একটু পরপর থামছেন, ছবি নিচ্ছেন। তাদেরকে ঘিরে ধরা বানরের সংখ্যা বাড়ছে।

"আপনার কি অবাক লাগছে?" যেভাবে তিনি উচ্চারণ করলেন, তাতে মনে হলো শব্দগুলো সতর্কতার সাথে বাছাই করেছেন।

"কারো ধারণা করার মতো বিষয় নয় এগুলো", মি. কাপাসি ধীরে ধীরে বললেন। মলমের কৌটা আবার পকেটে রাখলেন তিনি।

"তা অবশ্যই নয় এবং কেউ জানেও না। একেবারে কেউ না। পুরো আটটি বছর ধরে আমি গোপন করে রেখেছি।" মি. কাপসির দিকে তাকালেন তিনি থুতনিটা তার দিকে এগিয়ে, যেন নতুন কোনকিছুর অবতারণা হচ্ছে। "কিন্তু এখন আপনাকে বললাম।"

মি. কাপাসি মাথা ঝুঁকালেন। সহসা তার গরম বোধ হলো এবং মলম প্রয়োগের কারণে কপাল কিছুটা উষ্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি ভাবলেন, মিসেস দাশের কাছে এক পানি চেয়ে নিবেন, পরক্ষণেই সিদ্ধান্তটা বাতিল করলেন।

"খুব কম বয়সে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল।" তিনি বললেন। ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে কিছু খুঁজছেন। এরপর ঝালমুড়ির প্যাকেট বের করে আনলেন।

"একটু নেবেন?"

"জি না, ধন্যবাদ।"

মুঠি ভরে ঝালমুড়ি মুখে তুললেন। সিটে খানিকটা হেলান দিয়ে তার পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। "কলেজে পড়ার সময়েই আমরা বিয়ে করে ফেলি। স্কুলে পড়ার সময়ে সে আমাকে প্রথম প্রস্তাব দিয়েছিল। একই কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম আমরা। তখনই আমরা একজন আরেকজনকে ছাড়া থাকার কথা কল্পনাও করতে পারতাম না। একদিন, এমনকি এক মুহূর্তের জন্যেও না। আমাদের দু'জনের বাবা বন্ধু এবং একই শহরে থাকতেন। আমি সব সময় দেখেছি, বাবা প্রত্যেক সাপ্তাহিক ছুটির দিনে হয় আমাদের বাড়িতে অথবা তাদের বাড়িতে কাটিয়েছেন। আমাদের দোতলায় খেলতে পাঠিয়ে তারা আমাদের বিয়ের ব্যাপারে হাসিঠাট্টা করতেন। একবার কল্পনা করুন। আমাদের কোন কিছুতেই তারা বাধা দেননি। আমার মনে হয়, তখনই কমবেশি আমাদের মধ্যে এক ধরনের সংলগ্নতা গড়ে উঠেছিল। তখনকার শুক্রবার ও শনিবার রাতে নিচতলায় আমাদের দু'জনের বাবার চা পান করতে করতে আলাপের সময় আমরা যা করতাম...সে সম্পর্কে আপনাকে বলতে পারি মি. কাপাসি।"

মিসেস দাশ বলে চললেন, কলেজে রাজের সঙ্গে পুরো সময় কাটানোর ফলে তার খুব বেশি ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল না। রাজ সম্পর্কে গোপন কোন কথা কেউ তাকে বলবে অথবা তার কোন দুশ্চিন্তা বা কষ্টের প্রসঙ্গ কারো সাথে আলাপ করার কোন সঙ্গী ছিল না। তার বাবা মা এখন বিশ্বের আরেক প্রান্তে, কিন্তু তিনি কখনো তাদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন না। কম বয়সে বিয়ে করে আনন্দে আত্মহারা ছিলেন তিনি। খুব দ্রুত সন্তানের জন্ম দেয়ার পর তার সেবা, দুধের বোতল গরম করা এবং হাত দিয়ে বোতলের তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হতো তাকে। রাজ তখন থাকতো স্কুলে। সোয়েটার গায়ে এবং জিনসের প্যান্ট পরে। ক্লাসে শিশুদের শিলা ও ডাইনোসর সম্পর্কে পড়াতো। প্রথম বাচ্চা হওয়ার পর রাজ কখনো তার মোটা হয়ে যাওয়া শরীরের দিকে খেয়াল করতো না।

সার্বক্ষণিক ক্লান্তির কারণে তিনি তার কলেজের দু'একজন বান্ধবীর সঙ্গে লাঞ্চ করা বা ম্যানহাটানে শপিং করার আমন্ত্রণ রক্ষায় অস্বীকৃতি জানান। যার ফলে সেই বান্ধবীরাও তার খোঁজ নেয়া বন্ধ করলো। অতএব সারাদিন তাকে বাড়িতে একা থাকতে হতো শিশুকে নিয়ে। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো খেলনার মধ্যে তাকে সাবধানে পা ফেলতে হতো এবং বসতে হতো জড়োসড়ো হয়ে। ক্লান্তি তাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো সারাক্ষণ। রনির জন্মের পর মাঝে মধ্যে তারা বাইরে গেছেন এবং কোন বিনোদনে অংশ নেয়াও দুর্লভ হয়ে গিয়েছিল। রাজের কোন মাথাব্যথা ছিল না এসব নিয়ে। তিনি স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় থাকতেন, টেলিভিশন দেখতেন এবং রনিকে হাঁটুর উপর নিয়ে দোলাতেন। রাজ যখন তাকে একজন পাঞ্জাবি বন্ধুর কথা বললেন, যাকে মিসেস দাশ একবার দেখলেও নাম মনে করতে পারেননি, তিনি নিউ ব্রানসউইক এলাকায় কয়েকটি চাকুরির ইন্টারভিউ দেয়ার জন্যে সপ্তাহখানেক তাদের সাথে থাকবেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন।

সেই সপ্তাহের এক বিকেলে মিসেস দাশ ববিকে গর্ভে ধারণ করেন। ছড়ানো ছিটানো রবারের খেলনার মধ্যে সোফার উপর। পাঞ্জাবি বন্ধুটি যখন জানতে পারে যে, লন্ডনের একটি ওষুধ কোম্পানিতে তার চাকুরি হয়েছে তখন। রনি তার খেলনা বেস্টনী থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে চিৎকার করছিল। কফি তৈরির সময় বন্ধুটি তার পিছনে আস্তে স্পর্শ করে তখন তিনি আপত্তি করেননি। চকচকে নেভি স্যুটের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে। সোফার উপর ফেলে এতো দ্রুত, নীরবে এবং দক্ষতার সাথে সঙ্গম করে, যার অভিজ্ঞতা তার আগে কখনো হয়নি। অর্থপূর্ণ কোন ভাব প্রকাশ এবং সঙ্গম শেষে রাজ যেভাবে হাসতে পীড়াপীড়ি করে সেসব ছাড়াই। পরদিন রাজ তাকে জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে আসে। সেই বন্ধুটি এখন এক পাঞ্জাবি মেয়েকে বিয়ে করেছে এবং তারা লন্ডনেই থাকে। প্রতিবছর তারা রাজ ও মিনাকে ক্রিসমাস কার্ড পাঠায়। এরাও পাঠায়। দুই দম্পতিই এনভেলাপে নিজ নিজ পরিবারের ছবি গুজে দেয়। সে জানে না যে সে-ই ববির বাবা। কখনো জানবে না সে।

"মিসেস দাশ, আমাকে ক্ষমা করবেন। এসব কথা আপনি আমাকে বলছেন কেন?" তিনি শেষ করলে মি. কাপাসি জানতে চাইলেন।

"ভগবানের দোহাই, আমাকে মিসেস দাশ বলে ডাকবেন না। আমার বয়স মাত্র আটাশ বছর। সম্ভবত আমার বয়সী সন্তান আছে আপনার।"

"না, তা নেই।" মিসেস দাশ তাকে পিতৃতুল্য বয়সের বিবেচনা করায় মি. কাপাসি দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তার প্রতি যে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছিল তা যাচাই করার জন্যে গাড়ি চালানোর সময় তিনি রিয়ার ভিউ মিররে নিজের যে প্রতিফলন দেখেছিলেন, তার খানিকটা উবে গেল।

"আপনাকে বললাম, আপনার মেধার কারণে।" ঝালমুড়ির প্যাকেটটা মুখ না মুড়েই ব্যাগে রেখে দিলেন।

"আপনার কথা বুঝলাম না।" মি. কাপাসি বললেন।

"আপনি দেখছেন না? আটটি বছর ধরে আমি কথাটি কারো কাছে প্রকাশ করতে পারিনি। কোন বন্ধুর কাছে নয়, রাজের কাছে তো নয়ই। সে এ ব্যাপারে সন্দেহও করে না। ওর ধারণা, এখনো আমি ওকে ভালোবাসি। যাক, আপনার কি কোনকিছু বলার নেই?"

"কি সম্পর্কে?"

"এইমাত্র আপনাকে যা বললাম, সে সম্পর্কে। আমার একান্ত গোপন কথা, আমি কতোটা দুঃসহভাবে ব্যাপারটা অনুভব করি, সে সম্পর্কে। আমার সন্তান ও রাজের দিকে তাকালেই দুঃসহ বোধ করি। সবসময় আমার মনে হয়, সবকিছু ছুড়ে ফেলে দেই। একদিন আমার জানালা দিয়ে ঘরের সবকিছু বাইরে ছুড়ে ফেলার তীব্র ইচ্ছা জাগে—টেলিভিশন, বাচ্চাদেরকে, সবকিছু। আপনার কি মনে হয় না যে, এটা অসুস্থতা, অস্বাস্থ্যকর?"

মি. কাপাসি নীরব।

"আপনার কি কিছুই বলার নেই, মি. কাপাসি? আমি ভেবেছিলাম, ওটাই আপনার কাজ?

"ট্যুরিস্টদের সঙ্গ দেয়া আমার কাজ, মিসেস দাশ।"

"এটা নয়, আপনার অন্য কাজ, দোভাষীর কাজ।"

"কিন্তু আমাদের মধ্যে তো ভাষার প্রাচীর নেই। সেক্ষেত্রে দোভাষীর কি প্রয়োজন?"

"আমি তা বুঝাতে চাই না। অন্যভাবে হলে আমি কখনো আপনাকে এসব বলতাম না। আপনি কি বুঝতে পারছেন না, আপনাকে বলার মানে কি?"

"আপনি বলুন, এর মানে কি?"

"এর মানে হচ্ছে, আট বছর ধরে সারাক্ষণ এই দুঃসহ অবস্থার অনুভূতি আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। মি. কাপাসি, আট বছর ধরে আমার মাঝে প্রচণ্ড ব্যথা। আমার মনে হয়েছে, আপনি আমাকে সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করতে পারবেন। যা সঠিক আমাকে তাই বলুন। কোনভাবে নিরাময়ের উপায় বলে দিন।"

মি. কাপাসির দিকে তাকালেন তিনি। তার লাল পশমি স্কার্ট, স্ট্রবেরিযুক্ত টি শার্ট পরা মহিলার বয়স এখনো ত্রিশও হয়নি, যিনি তার স্বামী বা সন্তানদের ভালোবাসেন না, জীবনের প্রতি যিনি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছেন। তার স্বীকারোক্তি মি. কাপাসিকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। পাহাড়ি রাস্তার শীর্ষে দাশবাবুর কথা ভেবে তিনি বিষণ্ন হলেন। টিনা তার কাঁধে ঝুলে আছে, আমেরিকায় তার ছাত্রছাত্রীদের দেখানোর জন্যে পাহাড় কেটে তৈরি প্রাচীন মঠের গুহাগুলোর ছবি তুলছেন। তিনি

সন্দেহ করেন না এবং জানেন না যে, ছেলে দু'টির একটি তার নিজের সন্তান নয়। মি. কাপাসি এই ভেবে অপমানিত বোধ করলেন যে, মিসেস দাশ তার সাধারণ, তুচ্ছ একটি গোপন বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতে বলছেন। ডাক্তারের অফিসে আগত রোগীদের মতো দেখায় না তাকে, যারা আসেন ফ্যাকাসে নির্জীব চোখ নিয়ে, বিপর্যস্ত, ঘুমুতে বা শ্বাস নিতে পারেন না, সহজে প্রস্রাব করতে অক্ষম, এমনকি অনেকে তাদের ব্যথা সম্পর্কে গুছিয়ে বলতেও পারেন না। তবুও মি. কাপাসি'র বিশ্বাস যে, মিসেস দাশকে সহায়তা করা তার কর্তব্য। সম্ভবত দাশবাবুর কাছে সত্য স্বীকার করার পরামর্শ দেয়া তার উচিত। তিনি মিসেস দাশকে বুঝিয়ে বলবেন যে, "সততাই সর্বোত্তম পন্থা"। সততা, নিশ্চিতভাবে তাকে স্বস্তিবোধ করতে সাহায্য করবে এবং তিনি নিশ্চয়ই এ পরামর্শ গ্রহণ করবেন। হয়তো তিনি তাদের আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে থাকার প্রস্তাব করবেন। তিনি সবচেয়ে অনিবার্য প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরুর সিদ্ধান্ত নিলেন। সমস্যার ভিতরে পৌঁছতে তিনি প্রশ্ন করলেন, "মিসেস দাশ, আপনি কি সত্যি সত্যি ব্যথা অনুভব করেন, অথবা এটা আপনার অপরাধ বোধ?"

মিসেস দাশ তার দিকে ফিরে জ্বলন্ত চোখে তাকালেন। সর্ষের তেল তার গোলাপি ঠোঁটে চকচক করছে। কিছু বলার জন্যে তিনি মুখ খুললেন। তার দিকে ওভাবে তাকানোর সাথে সাথে মনে হলো কিছু বিশেষ প্রশ্ন তার চোখে এবং তিনি থামলেন। মি. কাপাসি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সে মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, মিসেস দাশ তাকে উপযুক্তভাবে অপমান করার মতো গুরুত্বপূর্ণও বিবেচনা করেন না। তিনি গাড়ির দরজা খুলে খাড়া পথ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। চৌকোনো কাঠের হিলে তার পা সামান্য স্খলিত। ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে এক মুঠো ঝালমুড়ি বের করলেন। আঙুলের ফাঁক দিয়ে মুড়ি মাটিতে পড়ে আঁকাবাঁকা একটি রেখার সৃষ্টি হলো। একটি বানর তাতে আকৃষ্ট হয়ে গাছ থেকে নেমে ছোট্ট সাদা খাদ্যকণা কুড়িয়ে মুখে পুরতে লাগলো। আরো খাবারের আশায় বানর মিসেস দাশকে অনুসরণ করছিল। অন্য বানরগুলোও তার সাথে যোগ দিলো। অল্পক্ষণের মধ্যে প্রায় আধ ডজন বানরকে দেখা গেল তাকে অনুসরণ করতে।

মি. কাপাসি গাড়ি থেকে নামলেন। কোনভাবে তাকে সতর্ক করার জন্যে চিৎকার করতে চাইলেন। কিন্তু তিনি ভীত হলেন যে, যদি তিনি জানতে পারেন যে, বানরের দল তার পিছু নিয়েছে তাহলে তিনি ঘাবড়ে যাবেন। হয়তো ভারসাম্য হারাবেন। বানরগুলো তার ব্যাগ অথবা চুল ধরে টানাটানি করতে পারে। বানর তাড়ানোর জন্যে পড়ে থাকা একটি ডাল হাতে নিয়ে তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন। মিসেস দাশ অনেকটা বেখেয়ালি মানুষের মতো হেঁটে চলেছেন। পথ যেখান থেকে আবার নিচে নেমে গেছে সেই চূড়ার কাছে পাথরের মোটা পিলারের মুখোমুখি গুহাগুলোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে দাশবাবু তার ক্যামেরার লেন্স ঠিক করছেন। বাচ্চারা একটি খিলানের নিচে দৌড়াদৌড়ি করছে; একবার দৃষ্টিতে

পড়ছে, আবার হারিয়ে যাচ্ছে। মিসেস দাশ চিৎকার করলেন, "আমার জন্যে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।"

টিনা উৎসাহে লাফিয়ে উঠলো, "মাম্মি আসছে।"

"সাব্বাশ!" দাশবাবু উপরে চোখ না তুলেই বললেন। "ঠিক সময়েই এসে পড়েছো। মি. কাপাসি আমাদের পাঁচজনের একটি ছবি তুলে দিতে পারবেন।"

মি. কাপাসি দ্রুত পা ফেলছেন এবং বানরদের অন্যদিকে সরিয়ে দিতে হাতের ডাল উঁচু করছেন।

"ববি কোথায়?" মিসেস দাশ থেমেই জানতে চাইলেন।

দাশবাবু ক্যামেরা থেকে চোখ তুললেন। "আমি তো জানি না। রনি, ববি কোথায়?"

রনি কাঁধ ঝাঁকালো। "আমার তো মনে হয়েছে, সে এখানেই আছে।"

"সে কোথায়?" তীক্ষ্ম কণ্ঠে আবার জানতে চাইলেন মিসেস দাশ। "তোমাদের সবার কি হয়েছে?"

তারা ববিকে ডাকতে শুরু করলো। পথের খানিক উপরে উঠে এবং খানিকটা নিচের দিকে নেমে। নিজেদের হাঁকডাকের কারণে তারা প্রথমে ববির চিৎকার শুনতে পায়নি। তাকে দেখা গেল আরো একটু ঢালুর দিকে একটি গাছের নিচে এক দল বানর তাকে ঘিরে ধরেছে। সংখ্যায় এক ডজনের বেশি বানরগুলো তাদের লম্বা কালো আঙুল দিয়ে তার টি শার্ট টানছে। মিসেস দাশের হাত থেকে ছিটকে পড়া মুড়ি ববির পায়ের কাছে ছড়ানো। ববি নীরব, তার দেহ যেন জমে স্থির হয়ে গেছে, তার আতংকিত মুখমণ্ডল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। তার খালি পা ধূলিময় এবং আগে সে যে লাঠিটি একটি বানরকে দিয়েছিল সেটি দিয়ে বানর তার পায়ের যেখানে বারবার আঘাত করেছে সে জায়গা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

"ড্যাডি, বানরগুলো ববিকে মারছে।" টিনা বললো।

দাশবাবু হাতের তালু প্যান্টের সামনে মুছলেন। ঘাবড়ে যাওয়ার কারণে হঠাৎ করে সাটারে তার হাতের চাপ পড়েছে এবং ক্যামেরার ভিতরে ফিল্ম এগুনোর ঘূর্ণির মতো শব্দ বানরদের সচকিত করলো। লাঠি হাতে বানরটি আরো আগ্রহের সাথে ববিকে আঘাত করতে শুরু করলো। "আমাদের কি করা উচিত? ওরা হামলা করে বসলে কি করবো?"

"মি. কাপাসি", তাকে একপাশে দাঁড়ানো দেখে মিসেস দাশ বললেন, "ভগবানের দোহাই, কিছু একটা করুন।" মি. কাপাসি ডালটি হাতে নিয়ে মুখে হিস হিস শব্দ তুলে বানর তাড়ালেন, যেগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলোকে ভয় দেখানোর জন্যে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগলেন। বানরগুলো ধীরে ধীরে পিছু হটলো; মাপা পা ফেলে, একান্ত বাধ্যের মতো, ভয়ের কোন লক্ষণ নেই তাদের মধ্যে। মি. কাপাসি ববিকে কোলে তুলে যেখানে তার বাবা মা ও ভাইবোন

দাঁড়ানো সেখানে নিয়ে এলেন। তাকে বয়ে আনার সময় ছেলেটির কানে একটি গোপন কথা বলার জন্যে তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। কিন্তু ববি ভয়ে বিহ্বল এবং কাঁপছে। বানরের আঘাতে পায়ের চামড়া ছড়ে যাওয়ায় সামান্য রক্ত ঝরছে। মি. কাপাসি তাকে তার বাবা মা'র কাছে দেয়ার পর দাশবাবু তার টি শার্টে লেগে থাকা ময়লা ঝেড়ে তখনই মুখোশটা পরিয়ে দিলেন। মিসেস দাশ ব্যাগ হাঁতড়ে ব্যান্ডেজ বের করে হাঁটুর কাছে আঘাতের উপর পেঁচিয়ে দিলেন। রনি তার ভাইকে একটি চুইংগাম দিলো।

"সে ভালো আছে। একটু ভয় পেয়েছে আর কি, তাই না ববি?" দাশবাবু ববির মাথায় চাপড় দিতে দিতে বললেন।

"ভগবান, বাঁচা গেছে। চলো এখান থেকে কেটে পড়ি।" মিসেস দাশ বুকের স্ট্রবেরির উপর আড়াআড়ি হাত রেখে বললেন। "এখানে আসা অবধি আমার ভয় করছে।"

"চলো, আমরা হোটেলে ফিরে যাই।" দাশবাবু সম্মত হলেন। "বেচারা ববি", মিসেস দাশ বললেন। "একটু এদিকে এসো, তোমার চুল ঠিক করে দিচ্ছি।" আবার তিনি ব্যাগে হাত ঢুকালেন ব্রাশ বের করতে এবং অস্বচ্ছ মুখোশের প্রান্ত ঘেঁসে চুলের উপর ব্রাশ চালালেন। তিনি ব্রাশটি ঝাঁকুনি দিতে ব্রাশের সাথে লেগে থাকা মি. কাপাসির ঠিকানা লিখা কাগজের টুকরাটি বাতাসে উড়ে গেল। মি. কাপাসি ছাড়া আর কেউ ব্যাপারটা লক্ষ করলো না। তিনি দেখলেন কাগজের টুকরা বাতাসে ক্রমেই উপরের দিকে উড়ে যাচ্ছে। গাছের ডালে বসে থাকা বানরগুলো গাম্ভীর্যের সাথে নিচের দৃশ্য দেখছে। মি. কাপাসিও দৃশ্যটি দেখলেন। তিনি জানেন যে, দাশ পরিবারের এই ছবিটিই তিনি তার মনের মাঝে চিরদিনের জন্যে সংরক্ষণ করবেন।

একজন খাঁটি দারোয়ান

সিঁড়ির ঝাড়ুদারনী বুড়ি মা দু'রাত ঘুমোতে পারে নি। তৃতীয় রাতের আগের সকালে সে তার বিছানা ঝেড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট বের করলো। লেটার বক্সের নিচে যেখানে সে থাকে সেখানে একবার লেপকাঁথা ঝাড়লো, একবার ঝাড়লো গলির মুখে নিয়ে, সবজির আবর্জনার স্তূপের মধ্যে খাচ্ছিল যে কাকগুলো, সেগুলো বিভিন্ন দিকে উড়ে গেল।

বুড়ি মা চারতলার ছাদে উঠতে শুরু করতেই একটি হাত রাখতে হলো হাঁটুর উপর। প্রতি বর্ষায় তার হাঁটু ফুলে উঠে। এর মানে হচ্ছে তার বালতি, লেপকাঁথা এবং ঝাড়ু সবই একই হাতের নিচে। উঠতে উঠতে বুড়ি মা'র মনে হচ্ছিল সিঁড়ির ধাপগুলো ক্রমেই খাড়া হয়ে আসছে। সিঁড়ির চাইতে বরং মই বেয়ে উপরে উঠার মতো মনে হচ্ছে তার কাছে। তার বয়স চৌষট্টি বছর। মাথার চুল গিট বাঁধলে কাঠবাদামের আকৃতি বিশিষ্ট হয়। সামনে থেকে এবং পাশে থেকে দেখলেও তাকে একই রকম শীর্ণ মনে হয়।

আসলে বুড়ি মা'র একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যকে তিনটি দিক থেকে অভিন্ন মনে হয়, তা হচ্ছে তার কণ্ঠস্বর : দুঃখ ভারাক্রান্ত, দই এর মতো টক এবং নারকেল কোড়ানোর মতো খরখরে। দিনে দু'বার সিঁড়ি ঝাড়ু দেয়ার সময় সে অসংখ্যবার এই কণ্ঠে দেশ ভাগের পর তাকে কলকাতায় পাঠানোর ফলে যে দুর্দশা ও ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে আপন মনে তা বলে। তখন সে বলে, সেই বিপর্যয়ের সময় সে তার স্বামী, চার কন্যা, একটি দোতলা দালান, কালো দামি কাঠের আলমারি, তার সারা জীবনের সঞ্চয়সহ বেশ কিছু বাক্স—সবকিছু হারিয়েছে। বাক্সগুলোর চাবি এখনো তার শাড়ির আঁচলে বাঁধা আছে।

দুর্দশার বর্ণনা ছাড়াও বুড়ি মা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তার সুদিনের কথা বলতেও পছন্দ করে। দ্বিতীয় তলায় পৌঁছার সময়ের মধ্যেই সে তার তৃতীয় মেয়ের বিয়ের রাতের খাদ্য তালিকার প্রতি গোটা ভবনের লোকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে ফেলতে সক্ষম হয়। "স্কুলের এক প্রিন্সিপালের সাথে ওর বিয়ে দিয়েছিলাম। গোলাপ জলে পোলাও রান্না করা হয়েছিল। নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল শহরের মেয়রকে। সবাই হাত ধুয়েছিল দস্তার গামলায়।" বুড়ি মা একটু থামে। দম নেয় এবং হাতের জিনিসগুলো ঠিক করে রাখে। সিঁড়ির ব্যানিস্টারের ফাঁক

থেকে বের হয়ে আসা তেলাপোকাকে তাড়া করে। এরপর মুখ খুলে : "কলাপাতায় ভাঁপ দিয়ে সেদ্ধ করা হয়েছিল সর্ষে বাটা মাখানো চিংড়ি। কোন পদের খাবার বাদ দেওয়া হয়নি। আমাদের পক্ষে এই আয়োজন খুব বেশি কিছু ছিল না, বাড়িতে আমরা সপ্তাহে দু'দিন পাঠার মাংস খেতাম। আমাদের জমির উপর মাছে ভরা একটি পুকুর ছিল।"

সিঁড়িঘরের দরজা দিয়ে আসা আলো বুড়ি মা'র চোখে এসে পড়ে। যদিও তখন মাত্র সকাল আটটা, কিন্তু সূর্যের প্রখর তাপ তার পায়ের নিচে সিঁড়িকে এরই মধ্যে যথেষ্ট উষ্ণ করে তুলেছে। বেশ পুরনো দালান এটি, এখনো স্নানের পানি ড্রামে সংগ্রহ করে রাখতে হয়। জানালাগুলো কাচবিহীন এবং পায়খানা ইটের তৈরি উঁচু মঞ্চের উপর।

"একটি লোক আসতো, আমাদের খেজুর ও পেয়ারা পেড়ে দিতো। আরেকজন এসে জবাফুলের গাছ ছেঁটে দিত। বলতেই হবে, ওখানে জীবনের মজা পেয়েছি। এখানে আমি খাই ভাতের হাড়িতে।" এ পর্যন্ত প্রলাপ বকে বুড়ি মা'র কানেই জ্বালা ধরে। তার ফুলে উঠা হাঁটুতে ব্যথাটা বেশি বোধ হচ্ছে। "আচ্ছা, আমি কি বলেছি যে, বর্ডার পার হবার সময় আমার কবজিতে শুধু দু'টি ব্রেসলেট ছিল ? এমন দিনও ছিল যখন আমার পা শ্বেতপাথর ছাড়া আর কিছুই স্পর্শ করেনি। আমার কথা বিশ্বাস করো, আর নাই করো এতো আরাম-আয়েশ তোমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারো না।"

বুড়ি মা'র প্রলাপের সত্যতা সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত নয়। কারণ প্রতিদিনই তার সাবেক সম্পত্তির পরিসীমা এবং আলমারি ও বাক্সের ধনসম্পদের পরিমাণ দ্বিগুণ হচ্ছিল। কারো সন্দেহ নেই যে, সে একজন রিফিউজি, তার বাংলা উচ্চারণেই তা স্পষ্ট। তবুও সেই বিশেষ ফ্ল্যাট ভবনের বাসিন্দারা বুড়ি মা'র সাবেক জীবনে সম্পদশালী। থাকার দাবি এবং আরো হাজার হাজার মানুষের সাথে ট্রাকে খড়ের বোঝার মাঝখানে বসে পূর্ব বাংলার সীমান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্য বর্ণনার মধ্যে খাপ খাওয়াতে পারে না। তাছাড়া বুড়ি মা কোন কোন দিন এমন বর্ণনাও করে যে সে গরুর গাড়িতে করে কলকাতায় এসেছে।

"কোনটি ঠিক, গরুর গাড়িতে না ট্রাকে উঠে ?" কখনো কখনো গলির মুখে চোর-পুলিশ খেলার জন্যে যাওয়ার পথে ছেলেমেয়েরা তাকে জিজ্ঞাসা করে। বুড়ি মা শাড়ির আঁচল ঝেড়ে চাবিগুলোতে শব্দ তুলে তাদেরকে বলে, "নির্দিষ্ট করে জানতে চাইছো কেন ? পান থেকে চুন খসাতে চাও কেন ? আমার কথা বিশ্বাস করলে করো, আর না করলে না করো। আমার জীবন এতো দুঃখে ভরা যে, তোমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারো না।"

সে ঘটনা চেপে যায়। স্ববিরোধী কথা বলে ফেলে। প্রায় সবকিছু গুছিয়ে ও বাড়িয়ে বলে। কিন্তু তার বর্ণনা এতো আকর্ষণীয় এবং এতো বিস্তারিত যে তার দাবি অগ্রাহ্য করা সহজ নয়। কি ধরনের জমির মালিক পরিণত হলো সিঁড়ির

ঝাড়ুদারনীতে ? চার তলার দালাল বাবু তার অফিসে যেতে বা অফিস থেকে ফিরতে বুড়ি মাকে দেখলে সবসময় বিস্ময়ের সাথে ভাবতেন। কলেজ স্ট্রিটে রবারের পাইপ, পাইপ, ভালব এবং অন্যান্য সেনিটারি ফিটিংস এর পাইকারি দোকানে কাজ করেন তিনি।

'বেচারি', সম্ভবত সে তার পরিবারকে হারাবার শোক প্রকাশের উপায় হিসেবে কাহিনী তৈরি করে বলে ভবনের প্রায় সব মহিলার সম্মিলিত ধারণা।

বয়োবৃদ্ধ চ্যাটার্জি বাবু মনে করেন, বুড়ি মা'র মুখ ছাই এ ভরা হলেও সে পরিবর্তিত পরিস্থিতির শিকার। দেশ ভাগের পর তিনি তার ব্যালকনি ছেড়ে কোথাও যাননি অথবা কোন সংবাদপত্র খুলে দেখেননি। তা সত্ত্বেও অথবা এক কারণেই তার মতামতকে সবসময় অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়।

শেষ পর্যন্ত এমন একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো যে, বুড়ি মা তার ফেলে আসা পূর্ব বাংলায় কোন বিত্তবান জমিদারের অধীনে কাজ করতেন এবং সেকারণে তার অতীত জীবনকে এতো অতিরঞ্জিত করে বলার সামর্থ অর্জন করেছে। তার কথায় তো আর কারো ক্ষতি হচ্ছে না। সকলে ধরে নিলো যে, বুড়ি মা উঁচুমানের মনোরঞ্জনকারী ছিল। লেটার বক্সের নিচে তার আশ্রয়ের বিনিময়ে সে তাদের সিঁড়ি ঝাড়ু দিয়ে ঝকঝকে রাখে। তদুপরি বুড়ি মা যে, প্রতি রাতে কলাপসিবল গেটের পাশে শুয়ে থাকে, ভবনের বাসিন্দারা ব্যাপারটি পছন্দ করে। কারণ সে বাইরের জগত ও তাদের মধ্যে প্রহরী হিসেবে রয়েছে।

এই ফ্ল্যাট ভবনে যারা বাস করে তাদের কারো চুরি হবার মতো মূল্যবান কিছু নেই। তিনতলার বিধবা মিসেস মিশ্র একমাত্র ব্যক্তি যার একটি টেলিফোন আছে। সবকিছুর উপরে বাসিন্দারা বুড়ি মা'র প্রতি কৃতজ্ঞ যে, সে গলিমুখে লোকদের যাতায়াতের উপর নজর রাখে, বিশেষ করে যারা দরজায় দরজায় গিয়ে চিরুনি বা শাল বিক্রি করে। তাকে দিয়ে মুহূর্তেই রিকশা ডাকানো যায় এবং সন্দেহভাজন লোক, যারা এখানে সেখানে থুথু ফেলে, প্রস্রাব করে অথবা অন্য ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে তাদের ঝাড়ুর আঘাত দিয়ে বিতাড়ন করে দেয়।

সংক্ষেপে, বছরের পর বছর ধরে বুড়ি মা'র কাজ একজন প্রকৃত দারোয়ানের কাজে পরিণত হয়েছে। যদিও স্বাভাবিকভাবে এটি কোন মহিলার কাজ নয়, তবু সে কাজটিকে নিজের দায়িত্ব বলে মনে করে এবং এতো নিষ্ঠার সাথে করে যে, যেন সে লোয়ার সার্কুলার রোড অথবা যোধপুর পার্ক এলাকা অথবা অভিজাত কোন এলাকার বাড়ির গেটকিপার।

ছাদের উপর টানানো তারে বুড়ি মা তার লেপকাঁথা ঝুলিয়ে দেয়। তারটি পাঁচিলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আড়াআড়ি করে বাঁধা। তার দৃষ্টিসীমায় পড়ে টেলিভিশন এন্টেনা, বিলবোর্ড এবং আরো দূরে হাওড়া ব্রিজের

খিলান। বুড়ি মা চারপাশের দিগন্তে তাকিয়ে দেখে। সে পানির কল খুলে মুখ ধোয়, পা ধোয় এবং দুই আঙুল দিয়ে দাঁত মাজে। এরপর সে তার ঝাড়ু দিয়ে লেপের দুই পাশে পিটাতে শুরু করে। মাঝে মাঝে পিটানো থামিয়ে সিমেন্টের কণা আটকে আছে কিনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা দেখে এই আশায় যে, তার নিদ্রাহীনতার জন্য দায়ী দুষ্কৃতিকারী শনাক্ত করতে সক্ষম হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে সে কিছু মুহূর্ত এতো আত্মমগ্ন হয়ে পড়েছিল যে তিনতলার দালাল বাবুর স্ত্রীর ছাদে আবির্ভাব লক্ষ করেনি, যিনি ট্রেতে লবণ মাখানো লেবুর খোসা রোদে দিতে এসেছেন।

"এই লেপের মধ্যে কি আছে, যা আমাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখে। বুড়ি মা বললো, "বলুন তো, আপনি কি কোথাও কিছু দেখছেন ?" মিসেস দালাল বুড়ি মা'র প্রতি বেশ নমনীয়। কখনো কখনো তিনি বৃদ্ধাকে আদা বাটা দেন, যা দিয়ে সে তার তরকারিটা একটু উপাদেয় করে। "আমি তো কিছু দেখছি না।" মিসেস দালাল বললেন। তার স্বচ্ছ চোখের মণি এবং পায়ের আঙুলগুলো সরু, যাতে আংটি পরানো।

"তাহলে ওগুলোর ডানা আছে", বুড়ি মা বললো। হাতের ঝাড়ু রেখে দিয়ে একটির পর একটি মেঘখণ্ডের উড়ে যাওয়া দেখলো। "আমি ওদের পিষে ফেলার আগেই ওরা উড়ে গেছে। আমার পিঠের দিকে একটু দেখুন। ওগুলোর কামড়ে নিশ্চয়ই লালচে দাগ পড়েছে।"

মিসেস দালাল বুড়ি মা'র শাড়ির প্রান্ত ধরে তুললেন, নোংরা পুকুরের পানির রং এর মতো পারে সস্তা তাঁতের শাড়ি। তিনি তার ব্লাউজের উপরের দিকে ও নিচের দিকে ত্বক লক্ষ করলেন। এ ধরনের ব্লাউজ এখন আর দোকানে বিক্রি হয় না। এরপর তিনি বললেন, "বুড়ি মা, তুমি বোধহয় মনে মনে এসব কল্পনা করছো।"

"আপনাকে বলছি, মরার পোকাগুলো আমাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে।" "ঘামাচির কারণে এমন হতে পারে", মিসেস দালাল বললেন। বুড়ি মা তার শাড়ির আঁচল ঝাড়লেন এবং চাবির গোছাটা ঝনঝন করে বেজে উঠলো। সে বললো, "আমি তো ঘামাচি চিনি। এটা মোটেই ঘামাচি নয়। আমি তিনদিন, হয়তো চারদিন ধরে ঘুমাইনি। কে শুনবে ? আমি বিছানা সবসময় পরিচ্ছন্ন রাখতাম। আমাদের বিছানার চাদর ছিল মসলিনের। বিশ্বাস করুন; আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। আমাদের মশারি ছিল রেশমি কাপড়ের মতো তুলতুলে। ওরকম আরাম-আয়েশ আপনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবেন না।"

"আমি ওসব কল্পনা করতে পারি না", মিসেস দালাল বুড়ি মা'র কথার প্রতিধ্বনি করলেন। চোখের পাতা নামিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমি ওসবের কল্পনা করতে পারি না, বুড়ি মা। দু'টি ভাঙ্গা রুমে আমি থাকি, এমন এক লোককে বিয়ে করেছি, যিনি টয়লেটের খুঁটিনাটি জিনিস বিক্রি করেন।" মিসেস দালাল ঘুরে রোদে দেওয়া লেপকাঁথার একটি দিকে তাকালেন। সেলাই এর একটি অংশের উপর আঙুল রেখে জানতে চাইলেন, "বুড়ি মা, তুমি কতোদিন ধরে এই

বিছানার উপর শোও ?"সে যেন মনে করতে পারছে না, এই উত্তর দেয়ার আগে বুড়ি মা তার ঠোঁটের উপর একটি আঙুল রেখে ভাবলো।

"তাহলে এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমাদের বলোনি কেন ? তোমার কি মনে হয়, তোমাকে পরিষ্কার বিছানা দেয়ার সাধ্য আমাদের নেই। অন্তত একটি অয়েল ক্লথ ?"

বুড়ি মাকে অপমানিত মনে হলো। "কোন প্রয়োজন নেই। এগুলো এখন পরিষ্কার। ঝাড়ু দিয়ে আচ্ছা করে ঝেড়েছি।"

"আমি কোন কথা শুনছি না", মিসেস দালাল বললেন, "তোমার একটি নতুন বিছানা প্রয়োজন। তোষক, একটি বালিশ। শীত এলে একটি কম্বল।" কথা বলার সময় মিসেস দালাল আঙুলে হিসাব করলেন।

"উৎসবের দিনগুলোতে গরিব লোকজন আমাদের বাড়িতে খেতে আসতো", বুড়ি মা বললো। সে ছাদের আরেক প্রান্তে রাখা কয়লার স্তূপ থেকে বালতিতে কয়লা ভরছিল।

"দালাল বাবু অফিস থেকে ফিরলে এ ব্যাপারে আমি কথা বলবো" মিসেস দালাল সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে বাড়াতে বললেন। বিকেলে এসো। আমি তোমাকে একটু আচার আর পিঠে মাখার জন্যে পাউডার দেব।"

"এগুলো ঘামাচি নয়।" বুড়ি মা বললেন।

এটা ঠিক যে, বর্ষা মওসুমে সচরাচর ঘামাচি হয়ে থাকে। কিন্তু বুড়ি মার ভাবতে ভালো লাগে যে, তার বিছানায় কিছু একটা আছে, কোন কিছু তার নিদ্রা চুরি করেছে, তার ত্বকে কোন কারণে মরিচের মতো জ্বলুনি হচ্ছে, যার সাথে জাগতিক সম্পর্ক সামান্য।

সিঁড়ি ঝাড়ু দিতে দিতে বুড়ি মা স্মৃতি রোমন্থন করে—ঝাড়ু দেয় সবসময় উপর থেকে নিচের দিকে। বৃষ্টির সময় ছাদে থপ থপ শব্দ হয় ঠিক ছোট শিশু তার পায়ের আকৃতির চাইতে বড় মাপের স্যান্ডেল পরে হাঁটলে যেমন শব্দ হয়। বৃষ্টিতে মিসেস দালালের লেবুর খোসা ধুয়ে যায়। পথচারীরা বৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে ছাতা খোলার আগেই তাদের শার্টের কলার, পকেট ও জুতা ভিজে যায়। সেই বিশেষ ফ্ল্যাট ভবন ও আশেপাশের ভবনগুলোর জানালা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলে বন্ধ করে জানালার রডের সাথে পেটিকোটের ফিতা দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়।

তখন বুড়ি মা দ্বিতীয় তলার পাটাতনে কাজ করছিল। মই এর মতো সিঁড়ির দিকে তাকালো সে। বৃষ্টিপাতের শব্দ তার চারপাশকে আচ্ছন্ন করেছে এবং সে জানে যে, তার লেপকাঁথা ভিজে একাকার হয়ে গেছে।

এরপর তার মনে পড়লো মিসেস দালালের সাথে তার আলোচনার কথা। সে নিজের কথা অব্যাহত রাখলো, একই তালে অবশিষ্ট ধাপগুলো থেকে ধূলি সিগারেটের গোড়া, লজেন্সের খোসা ঝাড়তে ঝাড়তে লেটার বক্সের নিচে এসে পৌঁছলো। বাতাসে যাতে ময়লা উড়ে না যায় সেজন্যে সে পুরনো পত্রিকা খুঁজে

এনে ময়লাগুলো তাতে তুলে দলামোচড়া করে কলাপসিবল গেটের হীরকাকৃতির ফাঁকে গুঁজে রাখলো। অতঃপর কয়লার বালতির উপর তার দুপুরের খাবার চড়ালো সিদ্ধ হতে এবং একটি হাতপাখা দিয়ে আগুনে বাতাস দিতে লাগলো।

সেদিন বিকেলে বুড়ি মা তার অভ্যাসবশত তার চুল আবার বাঁধলো। শাড়ির আঁচল জড়ো করে তার সারা জীবনের সঞ্চয় গুনলো। মিনিট বিশেক ঘুমিয়ে সে সবে উঠেছে, পুরনো পত্রিকা বিছিয়ে সাময়িকভাবে শুয়েছিল সে। বৃষ্টি থেমে গেছে এবং গলির মুখে ভেজা আমপাতা থেকে টক গন্ধ উঠছে।

কোন কোন বিকেলে বুড়ি মা ভবনের বাসিন্দাদের কাছে বেড়াতে যায়। এ ঘর ও ঘর বেড়ানো সে উপভোগ করে। বাসিন্দারা তাদের পক্ষ থেকে বুড়ি মাকে আশ্বস্ত করে যে, যখন খুশি সে আসতে পারে। রাত ছাড়া কখনো তারা দরজার ছিটকিনি লাগায় না। তারা নিজেদের কাজ সারতে বের হয়, বাচ্চাদের গালমন্দ করে, ব্যয়ের হিসাব করে অথবা রাতের রান্নার চাল থেকে কাঁকর বাছে। মাঝে মাঝে কেউ তাকে এক গ্লাস চা দেয়, বিস্কুটের টিন এগিয়ে দেয় এবং বুড়ি মা বাচ্চাদেরকে ক্যারম বোর্ডের নেট লাগাতে সাহায্য করে। সে জানে যে, চেয়ারে বসা তার উচিত নয়, সেজন্যে দরজার চৌকাঠে বা করিডোরে বসে এবং বিদেশের কোন শহরে একজন লোকের চলমান যানবাহন লক্ষ করার মতো সে তার প্রতি যাতায়াতকারী বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা ও ব্যবহার প্রত্যক্ষ করে।

সেদিনের বিশেষ বিকেলে বুড়ি মা মিসেস দালালের নিমন্ত্রণ রক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। পুরনো সংবাদপত্রের উপর ঘুমানোর পরও তার পিঠ চুলকাচ্ছিল এবং সে শেষপর্যন্ত ঘামাচির পাউডার চেয়ে নিতে প্রস্তুত হলো। ঝাড়ুটা হাতে তুলে নিল সে। ঝাড়ু হাতে ছাড়া সে নিজেকে স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। বুড়ি মা যখন উপরে উঠতে উদ্যত, ঠিক তখনই কলাপসিবল গেটের সামনে একটি রিকশা থামলো।

রিকশায় বসা দালাল বাবু। বছরের পর বছর ধরে রসিদ পূরণ করতে করতে তার চোখের নিচে লালচে দাগ পড়ে গেছে। কিন্তু আজ তার চোখে আনন্দের উজ্জ্বলতা। জিহবার অগ্রভাগ দাঁতের ফাঁকে নড়ছিল এবং তার উরুর উপর দু'টি ছোট সিরামিক বেসিন।

"বুড়ি মা, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। বেসিন দু'টি উপরে তুলতে আমাকে সাহায্য করো।" একটি ভাঁজ করা রুমাল দিয়ে তিনি কপাল ও গলা মুছে রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিলেন। এরপর তিনি ও বুড়ি মা মিলে বেসিন দু'টি চার তলায় তুললেন। ঘরে প্রবেশ করার পরই তিনি মিসেস দালাল, বুড়ি মা এবং তাদের অনুসরণ করে আগত ঔৎসুক বাসিন্দাদের কয়েকজনের কাছে ঘোষণা করলেন যে, সেনিটারি ওয়্যারের ডিস্ট্রিবিউটরের দোকানে তাকে আর রসিদ লেখার কাজ করতে হবে না। ডিস্ট্রিবিউটরের দ্বিগুণ মুনাফা হয়েছে এবং বর্ধমানে তার দোকানের দ্বিতীয়

শাখা চালু করতে যাচ্ছেন। বিগত বছরগুলোতে তার পরিশ্রমের পুরস্কার হিসেবে ডিস্ট্রিবিউটর দালাল বাবুকে কলেজ স্ট্রিট শাখার ম্যানেজারের পদে উন্নীত করেছেন। পদোন্নতি লাভের আনন্দে বাড়ি ফেরার পথে তিনি বেসিন দু'টি কিনে এনেছেন। "দু'রুমের বাড়িতে দু'টি বেসিন দিয়ে আমরা কি করবো?" মিসেস দালাল জানতে চাইলেন। বৃষ্টির ফলে লেবুর খোসাগুলো নষ্ট হওয়ায় এমনিতেই তার মন খারাপ। "এমন কথা কে কবে শুনেছে? এখনো আমি কেরোসিনের চুলায় রান্না করি। একটা ফোনের জন্যে দরখাস্ত করতে অস্বীকার করেছো। একটা ফ্রিজ কিনবে বলে বিয়ের সময় কথা দিয়েছিলে, এখন পর্যন্ত তা চোখে দেখলাম না। তুমি কি মনে করছো যে, দু'টি বেসিন দিয়ে সব সেরে ফেলবে।"

তাদের কথা কাটাকাটি উপর থেকে লেটার বক্স পর্যন্ত শোনার মতো জোরে ছিল। উচ্চকণ্ঠ অব্যাহত ছিল দীর্ঘক্ষণ ধরে। সন্ধ্যার পর দ্বিতীয় দফা বর্ষণের শব্দ ছাপিয়ে ছিল তাদের কণ্ঠ। সেদিন দ্বিতীয় বার উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সিঁড়ি ঝাড়ু দেবার সময় বুড়ি মা'র মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সেজন্যে সে তার দুর্দশা অথবা সুখের দিনগুলো নিয়েও কথা বলেনি। বুড়ি মা সেই রাতে ঘুমালো পুরনো পত্রিকা বিছিয়ে।

দালাল বাবু ও তার স্ত্রীর মধ্যে তর্কবিতর্ক কমবেশি সকালেও শোনা যাচ্ছিল, যখন খালি পায়ে কয়েকজন মিস্ত্রির আগমন ঘটলো বেসিনটি বসানোর জন্যে। সারারাত ধরে অনেক চিন্তাভাবনার পর দালাল বাবু স্থির করেছেন যে, একটি বেসিন বসাবেন তাদের বসার ঘরে, অপরটি বসাবেন ভবনের নিচ তলায় সিঁড়ির পাশে। "তাহলে সবাই বেসিন ব্যবহার করতে পারবে।" তিনি সকল ফ্ল্যাটে গিয়ে জানিয়ে এলেন। বাসিন্দারা অত্যন্ত আনন্দিত হলো। বছরের পর বছর ধরে তারা সংগ্রহ করে রাখা পানি মগ দিয়ে তুলে মুখ ধোয়।

দালাল বাবু ভাবছেন, সিঁড়ির পাশে একটি বেসিন দেখে দর্শনার্থীরা মুগ্ধ হবে। তিনি এখন একজন কোম্পানি ম্যানেজার। কে জানে, কখন কে এ ভবনে বেড়াতে এসে পড়েন।

মিস্ত্রিরা কয়েক ঘণ্টা ধরে খাটলো। দৌড়ে উপরে উঠলো এবং নামলো। সিঁড়ির ব্যানিস্টারে হেলান দিয়ে বসে দুপুরের খাবার সারলো। তারা হাঁতুড়ি দিয়ে পিটালো, চিৎকার করলো, থুথু ফেললো, খিস্তিখেউড় করলো। পাগড়ির প্রান্ত দিয়ে ঘাম মুছলো। এককথায়, সেদিন বুড়িমা'র পক্ষে সিঁড়ি ঝাড়ু দেয়া অসম্ভব করে তুললো।

সময় কাটানোর জন্যে বুড়ি মা ছাদে উঠলো। পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। পত্রিকা বিছিয়ে ঘুমানোর কারণে তার কোমর ধরে গেছে। চারদিকের দিগন্তে চোখ বুলিয়ে সে তার ভিজা কাঁথা বেশকিছু টুকরায় ছিড়লো, যেগুলো দিয়ে পরে সে সিঁড়ির ব্যানিস্টার মুছবে। সন্ধ্যার মধ্যে ভবনের বাসিন্দারা সারাদিনের কাজের প্রশংসার জন্যে জড়ো হলো। এমনকি বুড়ি মা বেসিনে স্বচ্ছ পানিতে হাত

ধোয়ার প্রয়োজন অনুভব করছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে বললো, "আমাদের স্নানের পানিতে ফুলের পাঁপড়ি ও আতর ছিটিয়ে সুগন্ধি করা হতো। বিশ্বাস করো আর না করো, সেই বিলাসিতার কথা তোমরা ভাবতেও পারো না।"

দালাল বাবু বেসিনের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্যে এগিয়ে গেলেন। তিনি একটি কল পুরোপুরি খুললেন এবং পুরোপুরি বন্ধ করে দেখালেন। এরপর দু'টি কল একসাথে খুলে পানির চাপ দেখালেন। দুই কলের মাঝখানে একটি ছোট্ট লিভার টেনে দেখালেন যে, প্রয়োজন হলে বেসিন পানি ভর্তি করে রাখা যায়। দালাল বাবু তার প্রদর্শন শেষ করলেন, "এর নামই হচ্ছে রুচিশীলতা, সৌন্দর্য।"

"সময় যে বদলে যাচ্ছে, তারই নিশ্চিত প্রমাণ এটি" **বারান্দা থেকে চ্যাটার্জি** স্বীকৃতি জানালেন।

মহিলাদের মধ্যে অচিরেই ক্ষোভ দানা বাঁধলো। সকালে লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করার সময়ে সবাই তার পালা আসার অপেক্ষা করতে, প্রতিবার ব্যবহারের পর কল মুছতে, বেসিনের সংকীর্ণ প্রান্তে তাদের সাবান ও টুথপেস্ট রাখতে না পেড়ে হতাশ হয়ে গেল। দালাল বাবুদের নিজস্ব বেসিন ছিল, ভালো কথা; অন্যেরা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবে কেন?

"নিজেদের জন্যে বেসিন কেনা আমাদের সাধ্যের বাইরে।" বাসিন্দাদের একজন এক সকালে বললো।

"দালাল বাবুর পরিবারই কি শুধু এই ভবনের অবস্থার উন্নতি করতে পারবেন?" আরেকজন বললো।

গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, স্বামী-স্ত্রীর তর্কবিতর্কের পর দালাল বাবু স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে দুই কিলো সরিষার তেল, একটি কাশ্মিরি শাল, এক ডজন চন্দন সাবান কিনে দিয়েছেন। টেলিফোনের জন্যে দরখাস্ত করেছেন। মিসেস দালাল সারাদিন শুধু বেসিনের পানিতে হাত ধোয়া ছাড়া আর কিছু করেন না। এটুকু যথেষ্ট ছিল না, পরদিন সকালে গলির মুখে একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো, সেটি হাওড়া স্টেশনে যাবে। জানা গেল, দালাল বাবু দশ দিনের জন্যে সপরিবারে সিমলা যাচ্ছেন।

"বুড়ি মা, আমি ভুলে যাইনি। আমরা তোমার জন্যে পার্বত্য এলাকায় তৈরি হয়, ভেড়ার লোমে তৈরি এমন কম্বল নিয়ে আসবো।" মিসেস দালাল ট্যাক্সির খোলা জানালা দিয়ে বললেন। আকাশি রং এর শাড়ির পাড়ের সাথে মিলানো চামড়ার পার্স কোলের উপর ধরা। "আমরা দু'টি কম্বল আনবো।" পাশে বসা দালাল বাবু চিৎকার করে বললেন। সেই সাথে পকেট চেক করে নিশ্চিত হলেন যে, মানিব্যাগ যথাস্থানে আছে।

ফ্ল্যাট ভবনটির বাসিন্দাদের মধ্যে একমাত্র বুড়ি মা-ই কলাপসিবল গেটের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নিরাপদ যাত্রা কামনা করে বিদায় জানালেন।

দালাল বাবুরা চলে যাবার পর অন্যান্য মহিলারা তাদের নিজনিজ ঘর সাজানোর পরিকল্পনা করতে শুরু করলো। একজন সিদ্ধান্ত নিলো যে, সে তার বিয়ের সময় বানানো হাতের বালার মধ্যে একটির বিনিময়ে সিঁড়ির দেয়াল হোয়াইট ওয়াশ করবে। একজন তার সেলাই মেশিন বন্ধক দিল ভবনের বাইরের দেয়াল রং করাতে। তৃতীয় একজন রৌপ্যকারের কাছে গিয়ে একসেট রূপার বাটি বিক্রি করে দিল তার জানালা হলুদ রং করানোর জন্যে। মিস্ত্রি ও শ্রমিকরা দখল করে নিল বাড়িটি। বাড়তি লোকের ঝামেলা এড়াতে বুড়ি মা ঘুমানোর জায়গা বেছে নিলো ছাদে। এতো লোক ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাইরে যায় এবং সারাক্ষণ গলির মুখে এতো ভিড় লেগে থাকে যে, তাদের উপর নজর রাখা কঠিন ব্যাপার। কয়েক দিন পর বুড়ি মা তার ঝুড়িগুলো এবং রান্না করার বালতিটিও ছাদে তুললো। নিচতলার বেসিন ব্যবহারের প্রয়োজন নেই তার। বরাবরের মতো সে সহজেই ছাদের ট্যাপ থেকে ধোয়ামোছার কাজ করতে পারবে। তার কাঁথা ছেড়া টুকরোগুলো দিয়ে সিঁড়ির ব্যানিস্টার মোছার কথা তার মনে আছে। পুরনো সংবাদপত্র বিছিয়ে ঘুমোনো শুরু করলো সে।

বৃষ্টি প্রবল হয়ে আসে। বৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাতে মাথার উপর একটি পত্রিকা চেপে ধরে বুড়ি মা। জবুথবু অবস্থায় বুড়ি মা লক্ষ করে বর্ষার পিঁপড়াগুলো মুখে ডিম নিয়ে সার ধরে যাচ্ছে। ভিজা বাতাসে সে তার পিঠে আরাম বোধ করলো। তার পত্রিকা ভিজে নিচে পড়ে গেছে।

বুড়ি মা'র সকালগুলো দীর্ঘ, বিকেলগুলো দীর্ঘতর। কবে সে শেষবার চা পান করেছে তা মনে করতে পারে না। নিজের দুর্দশা ও তার আগের সময় নিয়ে সে ভাবছে না, বরং ভাবছে, দালাল বাবুরা কবে তার নতুন বিছানা নিয়ে ফিরবেন।

ছাদে সে অস্থির হয়ে উঠে এবং সে কারণে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে প্রতিদিন বিকেলে পড়শিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে। তার হাতে শনের ঝাড়ু, শাড়ি নিজউপ্রিন্টের কালিতে মাখামাখি হয়ে থাকে। বাজারে ঘুরাঘুরি করে সে তার সারা জীবনের সঞ্চয় ব্যয় করতে লাগলো ছোটখাট জিনিস কিনতে : আজ এক প্যাকেট মুড়ি, কাল কিছু কাজুবাদাম, এর পরের দিন এক কাপ আখের রস। একদিন সে হাঁটতে হাঁটতে বেশ দূরে কলেজ স্ট্রিটের বই এর দোকানগুলো পর্যন্ত গেল। দাঁড়িয়ে কাঁঠাল ও খেজুর দেখার সময় সে শাড়ির আঁচলে টান অনুভব করলো। যখন সে তাকালো, তখন দেখলো তার জীবনের সঞ্চয়ের অবশিষ্টাংশ এবং চাবির গোছাটি নেই।

সেদিন বিকেলে বুড়ি মা কলাপসিবল গেটে পৌছতেই দেখতে পেল ভবনের বাসিন্দারা তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সিঁড়িতে যেন আর্তধ্বনি উঠলো। সবার

কণ্ঠে একই সংবাদের প্রতিধ্বনি : সিঁড়ির পাশের বেসিনটি চুরি হয়েছে। সদ্য হোয়াইট ওয়াশ করা দেয়ালে একটি বড় গর্ত এবং রবারের নল ও পাইপ বের হয়ে আছে। প্লাস্টার খুলে পড়েছে মেঝের উপর। বুড়ি মা তার ঝাড়ু আঁকড়ে রইলো এবং কিছুই বললো না।

"এসব ওরই কাজ।" একজন চিৎকার করলো বুড়ি মার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে। "ওই ডাকাতদের খবর দিয়েছে। তা না হলে যখন তার গেটে পাহারা দেয়ার কথা তখন সে কোথায় ছিল ?" "কিছুদিন ধরেই সে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, অপরিচিত লোকদের সাথে তাকে কথা বলতে দেখা গেছে।" আরেকজন বললো।

"আমরা ওকে কয়লা দেই, ঘুমোনোর জন্যে জায়গা দিয়েছি। আমাদের সাথে সে এভাবে বেইমানি করে কি করে ?" তৃতীয়জন জানতে চাইলো। যদিও কেউ বুড়ি মা'র সাথে সরাসরি কথা বলছিল না, কিন্তু সে বললো, "বিশ্বাস করুন, আমার কথা বিশ্বাস করুন। আমি ডাকাতদের খবর দেইনি।"

"বহু বছর ধরেই আমরা তোমার মিথ্যা কথা শুনে আসছি" তারা সমস্বরে বললো। "তুমি এখন বলছো, তোমাকে বিশ্বাস করতে ?"

একটার পর একটা অভিযোগ তুলতে লাগলো তারা। কি করে তারা ব্যাপারটা দালাল বাবুদের বুঝাবে ? শেষ পর্যন্ত তারা চ্যাটার্জি বাবুর কাছে পরামর্শ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। তাকে দেখা গেল বারান্দায় বসে রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম দেখছেন।

তৃতীয় তলার একজন বাসিন্দা বললো, "বুড়ি মা এই ভবনের নিরাপত্তা বিপদের সম্মুখীন করেছে। আমাদের দামি জিনিসপত্র আছে। বিধবা মিসেস মিশ্র তার ফোন নিয়ে একা থাকেন। আমাদের কি করা উচিত ?"

চ্যাটার্জি বাবু তাদের যুক্তিগুলো নিয়ে চিন্তা করলেন। ভেবেচিন্তে তিনি কাঁধের উপর ভাঁজ করা শাল ঠিক করে তার বারান্দায় দেয়া বাঁশের নতুন বেস্টনীর দিকে তাকালেন। তার পিছনের যে জানালাগুলো তার স্মরণকালের মধ্যে রং করা হয়নি, সেগুলো সম্প্রতি হলুদ রং করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন : "বুড়ি মার মুখ ছাই এ ভরা। এতে নতুন কিছু নেই। নতুন হচ্ছে, ভবনটি নতুন রূপ পেয়েছে। এ ধরনের একটি ভবনের জন্যে একজন আসল দারোয়ান প্রয়োজন।"

অতএব ভবনের বাসিন্দারা তার বালতি, ছেড়া কাঁথা, ঝুড়ি, শনের ঝাড়ু সিঁড়ি দিয়ে নিচে ছুড়ে ফেললো। লেটার বক্স অতিক্রম করে কলাপসিবল গেটের বাইরে গলি মুখে নিক্ষেপ করলো। এরপর তারা ধাক্কা দিয়ে বুড়ি মাকে বের করে দিল। একজন আসল দারোয়ানের সন্ধান করতে সবাই উদগ্রীব। তার জিনিসপত্রগুলোর মধ্য থেকে বুড়ি মা শুধু তার ঝাড়ুটি রাখলো। "আমাকে বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন" আরেকবার সে বললো। তার চলমান শরীর ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। শাড়ির আঁচল ঝাড়লো বুড়ি মা। কিন্তু কোনকিছুই বাজলো না।

সেক্সি

একজন স্ত্রীর জন্যে এর চাইতে বাজে দুঃস্বপ্ন আর কি হতে পারে। লক্ষ্মী মিরান্ডাকে বললো, ন'বছরের বিবাহিত জীবনের পর তার সম্পর্কিত বোনের স্বামী আরেক মহিলার প্রেমে পড়েছে। দিল্লি থেকে মন্ট্রিলগামী বিমানে মহিলার পাশের আসনেই বসেছিল সে এবং বাড়িতে স্ত্রী ও ছেলের কাছে না ফিরে সে মহিলাটির সাথে হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করে। লন্ডন থেকে স্ত্রীকে ফোন করে জানায় যে, মহিলার সাথে তার যে আলোচনা হয়েছে সে আলোচনা তার জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে এবং এখন তাকে গুছিয়ে নিতে সময়ের প্রয়োজন। এরপরই লক্ষ্মীর বোনটি শয্যাগত হয়ে পড়েছে।

"আমি যে ওকে দোষ দিচ্ছি তা নয়", লক্ষ্মী বললো। সে সারাদিন চানাচুর চিবায়, যা মিরিন্ডার কাছে মনে হয় কমলা রং এর ধূলিময় খাবার বলে। "কল্পনা করো, ওর অর্ধেক বয়েসী ইংরেজ মেয়ে।" লক্ষ্মী মিরান্ডার চাইতে মাত্র কয়েক বছরের বড়, কিন্তু ইতোমধ্যে তার বিয়ে হয়ে গেছে এবং তাজমহলের সামনে শ্বেতপাথরের বেঞ্চে সে ও তার স্বামী যে ছবি তুলেছে সেটি মিরান্ডার পাশের কক্ষে টানানো। লক্ষ্মী কমপক্ষে এক ঘন্টা ধরে টেলিফোনে তার বোনকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছে। কেউ লক্ষ করেনি। তারা একটি সরকারি বেতার কেন্দ্রের তহবিল সংগ্রহ বিভাগে কাজ করে। তাদের চারপাশে অনেক লোকজন, যারা সারাদিন টেলিফোন ধরে কাটায়, চাঁদা বা অনুদান বাড়াতে বলে।

"ছেলেটির জন্যে আমার খারাপ লাগছে।" লক্ষ্মী যোগ করলো। "দিনের পর দিন সে বাড়িতে কাটায়। আমার বোন বলে যে, সে তাকে স্কুলে পর্যন্ত দিয়ে আসতে পারে না।"

"ভয়াবহ ব্যাপার" মিরিন্ডা বললো। লক্ষ্মী সাধারণত টেলিফোনে কথা বলে তার স্বামীর সাথে রাতে কি রান্না করতে হবে সে সম্পর্কে। মিরান্ডা চিঠি টাইপ করে, বেতার কেন্দ্রের সদস্যদেরকে বলে বেতারের নামাংকিত ব্যাগ বা ছাতার বিনিময়ে তাদের বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে। লক্ষ্মীর কথা সে স্পষ্ট শুনতে পায়। তার কথায় যখন তখন একটি ভারতীয় শব্দ থাকবেই। যদিও দু'জনের ডেস্ক একটি দেয়াল দ্বারা বিভক্ত। কিন্তু সেদিন বিকেলে মিরান্ডা কিছু শুনছিল না। সে নিজেই দেব এর সাথে ফোনে ব্যস্ত ছিল এবং সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল যে সন্ধ্যায় তারা

কোথায় মিলিত হবে। "এরপরও, কয়েক দিন বাড়িতে কাটালে ওর কোন ক্ষতি হবে না।" লক্ষ্মী আরো কিছু চানাচুর মুখে পুরে ড্রয়ারে প্যাকেটটা রেখে দিল। "ছেলেটি প্রতিভাসম্পন্ন। তার মা পাঞ্জাবি, বাবা বাঙালি। স্কুলে সে ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজি শিখে বলে এখনই চারটি ভাষায় কথা বলে। আমার মনে হয় সে দুই গ্রেড একসাথে পার হয়ে এসেছে।"

দেবও বাঙালি। প্রথমে মিরান্ডার মনে হয়েছিল এটি একটি ধর্ম। এরপর দেব 'ইকনমিস্টের' একটি সংখ্যায় প্রকাশিত ম্যাপে তাকে দেখিয়ে দেয় যে, ভারতের একটি জায়গার নাম 'বেঙ্গল'। সে ম্যাগাজিনটি এনেছিল মিরান্ডার অ্যাপার্টমেন্টে, কারণ তার কোন অ্যাটলাস অথবা এমন বই ছিল না, যার মধ্যে ম্যাপ আছে। ম্যাপে দেব মিরিন্ডাকে দেখায় যে শহরে সে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং আরেকটি শহর নির্দেশ করে যেখানে তার বাবার জন্ম। একটি শহরের অবস্থান বক্স দিয়ে চিহ্নিত, মনে হয় পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্যে। মিরান্ডা বক্স দিয়ে রাখার কারণ জানতে চাইলে দেব ম্যাগাজিন গুটিয়ে রেখে বলে, "কোন কিছু নিয়েই তোমার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই" এবং তার মাথায় আস্তে চাপ দেয়। মিরান্ডার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে যাওয়ার আগে দেব ম্যাগাজিনটি আবর্জনার মধ্যে রেখে দেয়, তিনটি সিগারেটের শেষাংশের সাথে। বেড়াতে এসে সে সবসময় তিনটি সিগারেট টানে। কমনওয়েলথ এভিনিউ ধরে দেবের গাড়ির চলে যাওয়া লক্ষ করে সে। শহরতলীর বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে দেব, যেখানে সে তার স্ত্রীর সাথে থাকে। ফিরে এসে কভার থেকে ছাই ঝাড়লো এবং উল্টো দিকে গুটিয়ে রাখলো। সে বিছানায় গেল। তাদের জড়াজড়ির কারণে বিছানা দলামোচড়া হয়ে আছে। বেঙ্গলের সীমান্ত রেখা দেখছে সে। নিচের দিকে একটি উপসাগর, উপরের দিকে পর্বতমালা। ম্যাপটি গ্রামীণ ব্যাংক জাতীয় নিবন্ধের সাথে যুক্ত। সে পৃষ্ঠা উল্টালো এবং মনে মনে আশা করছিল যে, দেব যে শহরে জন্মগ্রহণ করেছে সে শহরের ছবি থাকবে। কিন্তু সে দেখলো শুধু ছক এবং রেখা। তবুও সে সেদিকে তাকিয়ে রইলো। দেবের সাথের পুরো সময় কল্পনা করলো। ভাবলো যে, মাত্র পনের মিনিট আগে তার পা দু'টো তোলা ছিল দেবের কাঁধের উপর এবং হাটু ভাঁজ করে এনেছে নিজের বুকের পাশে। তবু দেব বলেছিল যে, তার পুরোটা সে পাচ্ছে না।

দেব এর সাথে মিরান্ডার সাক্ষাৎ এক সপ্তাহ আগে ফিলেন্স শপিং সেন্টারে। লাঞ্চের সময়ে সে বের হয়েছিল নিচতলায় হ্রাসকৃত মূল্যে প্যান্টি কিনতে। এরপর সে এসকেলেটরে উঠে দোকানের মূল অংশ কসমেটিকস সেকশনে, যেখানে সাবান ও ক্রিম সাজিয়ে রাখা হয়েছে অলংকারের মতো এবং আই শ্যাডো, পাউডার জ্বলজ্বল করছিল কাঁচের মধ্যে। যদিও মিরান্ডা লিপস্টিক ছাড়া কখনো কিছু কিনেনি, তবু সে জিনিসপত্রে সাজানো র‍্যাকের সারির মাঝ দিয়ে হাঁটতে পছন্দ করে। জায়গাটা একভাবে তার পরিচিত এবং বোস্টনের অন্য এলাকার সাথে এখনো তার তেমন পরিচয় ঘটেনি। প্রতিটি মোড়ে স্থাপন করা মহিলা মূর্তিগুলোর

সাথে কথা বলতে তার ভালো লাগতো যারা পারফিউমযুক্ত কার্ড বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। কখনো কখনো মিরান্ডা কার্ড খুঁজে পায় তার কোটের পকেটে এবং সুগন্ধ নাকে আসে। কার্ডের সুগন্ধ মৃদু হয়ে গেলেও সেগুলো সে সংরক্ষণ করে। শীতল সকালে তার প্রতীক্ষার মুহূর্তে এই স্মৃতি তাকে উষ্ণ করে তোলে।

সেদিন মিরান্ডা একটি আকর্ষণীয় কার্ডের গন্ধ নেয়ার জন্যে থামলে সে দেখতে পায়, একজন লোক একটি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে এক টুকরো কাগজ, যা নিতে নারীসুলভ একটি হাত প্রসারিত হয়েছে। সেলসওম্যান কাগজের উপর চোখ বুলিয়ে ড্রয়ার খুলতে শুরু করলো। একটি কালো বাক্স থেকে সে বের করলো একটি সাবান, পানি শুষে নেয়ার মুখোশ, ফেস ক্রিমের দু'টি টিউব। লোকটির গায়ের রং তামাটে, আঙুলের গাঁটে কালো চুল দৃশ্যমান। গায়ে গোলাপি শার্ট, পরনে নেভি ব্লু স্যুট। উটের চামড়ার ওভারকোটে চকচকে চামড়ার বোতাম। দাম পরিশোধ করার জন্যে তার হাতে পরা শূকরের চামড়ার গ্লাভস খুলতে হলো। লাল রং এর মানিব্যাগ থেকে সে বের করলে কড়কড়ে নোট। তার আঙুলে বিয়ের আংটি নেই।

"তোমাকে কি দেব, হানি ?" সেলসওম্যান মিরান্ডার দিকে ফিরে বললো। তার চশমার উপর দিয়ে মিরান্ডার চেহারা যাচাই করছে সে।

মিরান্ডা জানে না সে কি চায়। সে শুধু জানে যে, লোকটি চলে যাক, সে তা চায় না। মনে হচ্ছিল, সে বিলম্ব করতে চায় সেলসওম্যানের সাথে কথা বলতে, চায় কিছু সময় কাটাতে। মিরান্ডা কিছু বোতলের দিকে তাকালো, ডিম্বাকৃতির একটি ট্রেতে সাজানো খাটো, দীর্ঘ বোতল, যেন একটি পরিবার ছবির জন্যে পোজ দিচ্ছে।

"একটি ক্রিম", মিরান্ডা শেষ পর্যন্ত বললো।

"আপনার বয়স কতো ?"

"বাইশ বছর।"

সেলসওম্যান মাথা ঝাঁকালো, একটি ঘোলাটে বোতলের মুখ খুলতে খুলতে। "আপনি যেগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত তার চাইতে এটি একটু ভারি মনে হতে পারে। আমি আপনার বয়সেই ব্যবহার শুরু করেছিলাম। পঁচিশ বছর বয়স হলেই চামড়ায় ভাঁজ পরতে শুরু করে। এরপর থেকে ভাঁজগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠে।"

সেলসওম্যান যখন মিরান্ডার মুখে ক্রিম লাগিয়ে দিল, লোকটি দাঁড়িয়ে তা দেখছিল। ক্রিম লাগানোর সঠিক উপায় বলার সময় দ্রুততার সাথে গলা থেকে শুরু করে উপরের দিকে মাখলো। লোকটি তখন লিপস্টিক হাতে নিয়ে নাড়ছিল। একটি টিউবে চাপ দিয়ে জেল বের করলো এবং খোলা হাতটির উল্টোপিঠে মাখলো। সে একটি জারের মুখ খুলে তার উপর এতোটা ঝুঁকে পড়লো যে, এক ফোঁটা ক্রিম তার নাকে লেগে গেল।

মিরান্ডা হেসে ফেললো, কিন্তু সেলসওম্যান তার মুখের উপর বড় একটি ব্রাশ বুলিয়ে দিচ্ছিল বলে হাসি চাপা পড়ে গেল। "এটি দ্বিতীয় আরক্তিম ভাবের সৃষ্টি করে", মহিলা বললো। "আরো উজ্জ্বল রং দেয়।"

মিরান্ডা মাথা নাড়লো। কাউন্টারে সারি করে লাগানো আয়নায় নিজের প্রতিফলন দেখলো। তার চোখ দু'টি রূপালি এবং ত্বক কাগজের মতো ফ্যাকাশে। কিন্তু মাথার চুলগুলো তার গায়ের রং এর বিপরীত; কফি বীনের মতো ঘন কালো ও চকচকে। এ জন্যে লোকজন তাকে সুন্দরী না বললেও আকর্ষণীয় বলে বর্ণনা করে। তার মাথা সরু, ডিম্বাকৃতির এবং খাড়া। তার শারীরিক গঠনও শীর্ণ, নাকের ছিদ্র এতো ক্ষুদ্র যে, মনে হয় শুকোতে দেয়ার কাপড় আটকানোর ক্লিপ দিয়ে নাক চেপে ধরা হয়েছে। এখন তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার ঠোঁট চকচক করছে।

লোকটিও একটি আয়নার দিকে তাকিয়ে দ্রুত নাকে লেগে থাকা ক্রিম মুছে নিল। মিরান্ডা বিস্মিত হলো যে, লোকটি কোত্থেকে আবির্ভূত হলো। তার মনে হলো, লোকটি স্প্যানিশ বা লেবাননি হতে পারে। সে আরেকটি জারের মুখ খুলে, কাউকে লক্ষ্য না করেই বললো, "এটির গন্ধ আনারসের মতো।" মিরান্ডা তার উচ্চারণের টান শনাক্ত করার চেষ্টা করলো।

মিরান্ডার ক্রেডিট কার্ড হাতে নিয়ে সেলসওম্যান বললো, "আপনার জন্যে আজ আর কি করতে পারি?"

"ধন্যবাদ, আর কিছু প্রয়োজন নেই।"

লাল টিস্যু দিয়ে ক্রিমটি পেঁচিয়ে দিলো। "এটি ব্যবহার করে আপনার ভালো লাগবে।" রসিদ সই করার সময় মিরান্ডার হাত একটু কাঁপলো। লোকটি তখনো সেখান থেকে যায়নি। "আমাদের নতুন আই জেলের নমুনা আপনাকে দিচ্ছি।" সেলসওম্যান মিরান্ডাকে একটি ছোট শপিং ব্যাগ দিতে দিতে বললো। ক্রেডিট কার্ডটি ফিরিয়ে দেয়ার আগে সে কার্ডের দিকে তাকালো। "বাই বাই, মিরান্ডা।"

হাঁটতে শুরু করেছে মিরান্ডা। প্রথমে দ্রুত চলছিল সে, কিন্তু যখন দেখলো দরজাগুলো শহরের কেন্দ্রস্থলে যাওয়ার পথে পড়বে, তখন গতি মন্থর করলো।

"আপনার নামের অংশবিশেষ ভারতীয়", লোকটি মিরান্ডার চলার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে।

সোয়েটার স্তূপ করে রাখা একটি গোলাকৃতির টেবিলের কাছে মিরান্ডা দাঁড়ালো। লোকটিও থেমে পড়লো। পাইনের শুকনো ফল ও ভেলভেটের ফিতায় সাজানো টেবিলটি। "মিরান্ডা?"

"মীরা। আমার এক আন্টির নাম মীরা।"

লোকটির নাম দেব। সাউথ স্টেশনের দিকে মাথা কাঁত করে সে বললো যে, এই পথের অদূরে এক বিনিয়োগ ব্যাংকে সে কাজ করে। গোফধারি কোন লোককে এই প্রথম মিরান্ডা হ্যান্ডসাম বলে ভাবলো।

একসাথে তারা পার্ক স্ট্রিট স্টেশনের দিকে হাঁটছিল সস্তা ব্যাগ ও বেল্টের দোকানগুলো অতিক্রম করে। জানুয়ারির প্রবল বাতাস মিরান্ডার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। পকেট থেকে একটি টোকেন বের করার জন্যে হাত ঢুকাতেই তার চোখ পড়লো লোকটির শপিং ব্যাগে। "তাহলো, এসব তার জন্যেই কিনলে?"

"কার জন্যে?"

"তোমার আন্টি মীরার জন্যে।"

"এসব আমার স্ত্রীর জন্যে।" আস্তে আস্তে বললো সে, মিরান্ডার চোখে চোখ রেখে। "সে কয়েক সপ্তাহের জন্যে ভারতে গেছে।" সে তার চোখ ঘুরালো। "এগুলোর প্রতি তার দারুণ আসক্তি।"

যেহেতু স্ত্রী কোন কারণেই হোক অনুপস্থিত, সেজন্যে ব্যাপারটা খারাপ মনে হয়নি। প্রথম দিকে মিরান্ডা ও দেব প্রায় প্রতি রাত একসাথে কাটাতো। দেব ব্যাখ্যা দিয়েছিল যে, মিরান্ডার অ্যাপার্টমেন্টে পুরো রাত সে কাটাতে পারবে না। কারণ তার স্ত্রী প্রতিদিন সকাল ছ'টায় ভারত থেকে তাকে ফোন করে, যখন ভারতে বিকেল চারটা। অতএব, রাত দু'টো, তিনটে এবং ভোর চারটার সময়ও সে মিরান্ডার অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে তার শহরতলীর বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি চালিয়ে চলে যায়। দিনের বেলায় প্রতি ঘন্টায় সে তাকে ফোন করে অফিস থেকে অথবা তার সেলুলার ফোন থেকে। একদিন সে মিরান্ডার সময়সূচি জেনে নিয়েছিল এবং প্রতিদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তার জন্যে ফোনের অ্যানসারিং মেশিনে একটি মেসেজ রেখে দিতো, যখন মিরান্ডা তার অ্যাপার্টমেন্টের পথে। এর কারণ হিসেবে সে বলেছিল যে, মিরান্ডা ঘরে ঢুকেই যাতে তার কণ্ঠ শুনতে পায় সেজন্যে সে এটা করতো। মেসেজে সে বলতো, "আমি তোমাকেই ভাবছি। তোমাকে দেখার জন্যে আর কতোক্ষণ প্রতীক্ষা করবো?" সে তাকে বলতো যে, মিরান্ডার অ্যাপার্টমেন্টে কাটাতে তার ভালো লাগে। যদিও অ্যাপার্টমেন্টের কিচেনের তাক রুটির বাক্সের চাইতে প্রশস্ত নয়। ফ্লোর অমসৃণ এবং ঢালু। করিডোরে যে কলিং বেলটা লাগানো আছে দেব দরজায় সুইচ তুললেই তাতে কিছুটা বিব্রতকর শব্দ উঠে। মিরান্ডার বোস্টনে চলে আসার সিদ্ধান্তকে সে প্রশংসা করে, যেখানে কাউকে সে চেনে না। মিশিগানে বড় হয়েছে মিরান্ডা, সেখানে কলেজে পড়াশুনা করেছে। যখন মিরান্ডা বলে যে, এতে প্রশংসা করার কিছু নেই। সে বোস্টনে এসেছে স্পষ্টত একা থাকার জন্যেই। দেব মাথা নাড়ে, "আমি জানি, নিঃসঙ্গ থাকতে কেমন লাগে। সহসা সে গম্ভীর হয় এবং সে মুহূর্তে মিরান্ডা অনুভব করে যে, দেব তাকে বুঝতে পেরেছে। সে আরো বুঝতে পারে যে, কোন কোন রাতে সে কতো দুঃসহ অনুভব করেছে। একা একা সিনেমা দেখার পর, কোন বুকস্টোরে ম্যাগাজিন পড়তে গিয়ে, অথবা লন্ড্রীর সাথে কোন কিছু পান করার পর তার কতোটা খারাপ লাগতো। লন্ড্রী

অ্যালেওয়াইফ স্টেশনে এক ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টার মধ্যে তার স্বামীর সাথে সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করতো। স্বাভাবিক সময়ে দেব বলতো যে, তার দেহের তুলনায় দীর্ঘ পা তার খুব পছন্দ হয়েছে। অ্যাপার্টমেন্টের রুমে নগ্ন অবস্থায় হাঁটার সময় প্রথমবার তাকে দেখে বিছানা থেকে প্রশংসা করে বলেছিল, "এরকম লম্বা পা বিশিষ্ট মহিলা তোমাকেই প্রথম জানি।"

দেবই তাকে কথাটা প্রথম বলেছে। কলেজে মিরান্ডা যাদের সাথে প্রেম করেছে সেই ছেলেগুলো শুধু লম্বা। হাইস্কুলের ছেলেগুলোর চাইতে স্বাস্থ্যবান। একমাত্র দেবই তাকে সবসময় বিনিময় দেয়। দরজা খুলে ধরে তার জন্যে। রেস্টুরেন্টে টেবিলের পাশে বসে হাতে চুমু দেয়। সেই প্রথম তাকে এতো বড়ো একটি ফুলের তোড়া দিয়েছিল যে, সেটি খুলে ছ'টি গ্লাসে সাজিয়ে রাখতে হয়েছিল এবং দেবই প্রথম ব্যক্তি যে তাকে সঙ্গম করার সময় বারবার ফিসফিস করে তার নাম উচ্চারণ করতো। তার সাথে সাক্ষাতের কয়েকদিনের মধ্যে মিরান্ডা যখন কাজ করছিল তখন তার ইচ্ছা জাগলো যে, তার রুমে দেব ও তার একটি ছবি থাকা প্রয়োজন, ঠিক তাজমহলের সামনে লক্ষ্মী ও তার স্বামীর তোলা ছবির মতো। দেবের কথা সে লক্ষ্মীকে বলেনি। কাউকেই বলেনি সে। তাদের সম্পর্কের খানিকটা লক্ষ্মীকে বলতে চেয়েছিল। কারণ লক্ষ্মীও ভারতীয়। কিন্তু আজকাল লক্ষ্মী তার বোনটির সাথে টেলিফোনে কথা বলতে বেশি ব্যস্ত থাকে, যে এখনো বিছানা ছেড়ে উঠেনি এবং তার স্বামী এখনো লন্ডনে এবং পুত্রের স্কুলে যাওয়া বন্ধ রয়েছে। লক্ষ্মী তাকে পীড়াপীড়ি করে "তোমাকে অবশ্যই খেতে হবে। কোনভাবেই নিজের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করা তোমার উচিত নয়।" সে বোনের সাথে কথা শেষ করে, স্বামীর সাথে কথা বলতে শুরু করে। সংক্ষিপ্ত বাক্য বিনিময়, যা শেষ হয় রাতে মুরগি না ভেড়ার মাংস রান্না হবে সে সম্পর্কে যুক্তিতর্ক করে। এক পর্যায়ে মিরান্ডার কানে আসে, স্বামীর কাছে ক্ষমা চাচ্ছে লক্ষ্মী "আমি দুঃখিত। পুরো ব্যাপারটি আমাকে পাগল করে দিয়েছে।"

মিরান্ডা এবং দেব কোন বিতর্কে যায় না। তারা নিকেলোডিওনে সিনেমা দেখতে যায় এবং পুরো সময় চুম্বন বিনিময়ে ব্যস্ত থাকে। ডেভিস স্কোয়ারে তারা শূকরের মাংসের কাবাব ও ভুট্টার আটার রুটি খায়। তখন দেব কলারে একটি ন্যাপকিন আটকে নেয়, যাতে শার্টে খাবারের দাগ না লাগে। স্প্যানিশ রেস্টুরেন্টের বারে তারা মদের গ্লাসে চুমুক দেয়। সেখান থেকে বেরিয়ে তারা শাপলার ছবির পোস্টার কিনে মিরান্ডার বেডরুমে লাগাবে বলে। এক শনিবার সন্ধ্যায় তারা সিম্ফোনি হলে কনসার্টে যায়। দেব তাকে এই শহরে তার সবচেয়ে প্রিয় স্থান দেখায়। সেটি হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স সেন্টারের মাপ্পারিয়াম, সেখানে তারা একটি রুমের মাঝখানে দাঁড়ায়, রুমটি উজ্জ্বল কাঁচে তৈরি এবং মনে হয় একটি গ্লোবের অভ্যন্তরভাগের মতো। কিন্তু দেখতে বাইরের একটি রুমের মতোই। রুমের ঠিক মাঝখানে একটি স্বচ্ছ সেতু, যাতে তারা অনুভব করে যেন পৃথিবীর

ঠিক কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে তারা। দেব মিরান্ডাকে ভারতের অবস্থান নির্দেশ করে, যা লাল রং এর। 'ইকনমিস্ট' ম্যাগাজিনের ম্যাপের চাইতে অনেক বিস্তারিত। সে ব্যাখ্যা করে যে, শ্যাম (থাইল্যান্ড) ও ইটালিয়ান সোমালীল্যান্ডের মতো বহু দেশ আর আগের অবস্থায় নেই। দেশগুলোর নাম বদলে গেছে। ময়ূরের বুকের মতো ঘন নীল সাগর দৃশ্যমান হয় দু'ভাবে : পানির গভীরতার উপর নির্ভর করে রং এর গাঢ়ত্ব। সে মিরান্ডাকে পৃথিবীর গভীরতম অবস্থানটি দেখায়—সাত মাইল গভীর, মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের ঠিক উপরেই। সেতুর উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে তারা তাদের পদপ্রান্তে এন্টার্কটিক দ্বীপমালা দেখে। গলা বাড়িয়ে দেখতে পায় মাথার উপর বিশাল ধাতব তারকা। দেব যখন তার কথা বললো, তার কণ্ঠ কাঁচের প্রাচীরের দূরে বুনোভাবে বাজলো। কখনো কর্কশ, কখনো কোমল, কখনো মনে হচ্ছিল কথাগুলো নামছে মিরান্ডার বুকে। কখনো তার কানে সব শব্দ একত্রে বাজছিল। একদল পর্যটক যখন স্বচ্ছ সেতুর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল, মিরান্ডা তাদের গলা পরিষ্কার করার শব্দ শুনছিল, যেন মাইক্রোফোনের শব্দ শুনছে। দেব তাকে বললো যে, এটা সম্ভব হয়েছে শব্দবিজ্ঞানের কলাকৌশল প্রয়োগের কারণে।

মিরান্ডা লন্ডন দেখলো, যেখানে লক্ষ্মীর বোনের স্বামী বাস করছে বিমানে পরিচিত মহিলাটির সাথে। মনে মনে ভাবছিল, ভারতের কোন শহরে দেবের স্ত্রী থাকে। মিরান্ডা একবার তার শৈশবে সবচেয়ে দূরবর্তী যে স্থানে গিয়েছিল, সেটি হচ্ছে বাহামা। জায়গাটি সে খুঁজলো, কিন্তু কাঁচের প্যানেলে দেখা গেল না। পর্যটকরা চলে গেলে দেব এবং মিরান্ডা আবার একাকী। দেব মিরান্ডাকে বললো সেতুর এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াতে। যদিও তাদের মধ্যে ত্রিশ ফুটের ব্যবধান, তবুও দেব বললো যে, তারা একে অন্যের ফিসফিস শব্দে কথা বলাও শুনতে পারবে। "তোমার কথা বিশ্বাস করি না" মিরান্ডা বললো। এখানে প্রবেশ করার পর এটি তাদের প্রথম কথা। তার মনে হলো দেব তার কানে মুখ লাগিয়ে কথা বলছে।

"সামনে যাও" দেব বললো তার প্রান্তে পিছিয়ে আসতে আসতে। তার কণ্ঠ ফিসফিসে পরিণত হয়েছে। "কিছু বলো।" মিরান্ডা লক্ষ করলো যে দেব এর ঠোঁট শব্দ তৈরি করছে এবং একই সময়ে সে শব্দগুলো এতো স্পষ্ট শুনলো যে, সে শব্দ সে অনুভব করলো তার ত্বকের নিচে, তার শীতের কোটের নিচে। এতো কাছে এবং উষ্ণতায় এতো পূর্ণ যে সে ভাবলো তার গরম লাগবে। "হাই" সে ধীরে উচ্চারণ করলো। আর কি বলা উচিত সে সম্পর্কে মিরান্ডা বুঝতে পারছিল না।

"তুমি খুব সেক্সি" দেব ফিসফিসিয়ে উত্তর দিল।

পরের সপ্তাহে অফিসে লক্ষ্মী মিরান্ডাকে বললো যে, এটাই তার বোনের স্বামীর প্রথম প্রেমের ঘটনা নয়। "এবার সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনভাবে তার বোধ ফিরিয়ে আনবে।" এক সন্ধ্যায় লক্ষ্মী অফিস ছাড়ার প্রস্তুতি নিতে নিতে বললো।

"সে বলছে শুধু তার ছেলের জন্যেই তা করবে। ছেলের কারণে সে স্বামীকে ক্ষমা করে দিতে চায়।" লক্ষ্মীর কম্পিউটার বন্ধ করে দেয়া পর্যন্ত মিরান্ডা অপেক্ষা করলো। "ওর স্বামী কাঁচুমাচু হয়ে ফিরে আসবে এবং সে তাকে ক্ষমা করে দেবে।" লক্ষ্মী তার মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, "আমি হলে তা কখনো করতাম না। আমার স্বামী যদি এভাবে অন্য মহিলার দিকে তাকায় তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দেবো।" সে তাদের ছবির দিকে তাকালো। লক্ষ্মীর কাঁধের উপর তার স্বামীর হাত, তার হাঁটু স্বামীর হাঁটুর সাথে মিশে আছে। মিরান্ডার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো, "তুমিও কি তাই করবে না?"

সে মাথা নাড়লো। পরদিন দেব এর স্ত্রী ভারত থেকে ফিরে আসছে। সেদিন বিকেলে সে মিরান্ডাকে অফিসে ফোন করেছিল যে, স্ত্রীকে আনতে তাকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। যত শীঘ্র সম্ভব তাকে আবার ফোন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দেব।

"তাজমহল দেখতে কেমন?" লক্ষ্মীর কাছে সে জানতে চায়।

"পৃথিবীর সবচেয়ে রোমান্টিক স্থান" লক্ষ্মীর চোখমুখে স্মৃতি জেগে উঠার উজ্জ্বলতা। "প্রেমের চিরস্থায়ী সৌধ।"

দেব যখন এয়ারপোর্টে তখন মিরান্ডা ফিলেন্স শপিং সেন্টারের বেসমেন্টে গেল নিজের জন্যে কিছু কেনাকাটা করতো যা একজন গৃহকর্ত্রীর থাকা উচিত বলে তার মনে হয়েছিল। সে একজোড়া কালো রং এর হাইহিল জুতা দেখলো, যার বাকলস শিশুদের দাঁতের চাইতে চোট। মখমলের একটি বোতামবিহীন খোলা জামা এবং হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ সিল্কের গাউন পেল। কাজের সময় সে যে আঁটসাট জামা পরে তার পরিবর্তে ব্যবহারের জন্যে সে খুঁজে পেল সেলাইযুক্ত মোজা। জিনিসপত্রের স্তূপে, একটির পর একটি র‍্যাকে এবং হ্যাঙ্গারের পর হ্যাঙ্গার সরিয়ে শেষ পর্যন্ত সে খুঁজে বের করলো হালকা রূপালি উপাদানে তৈরি ককটেল ড্রেস, যা তার রূপালি চোখ এবং গলার নেকলেসের সঙ্গে মানাবে। কেনাকাটার সময় তার মনে পড়লো দেবের কথা এবং মাপ্পারিয়ামে সে তাকে যা বলেছিল সে কথা। সেই প্রথম তাকে কোন লোক সেক্সি বলে উল্লেখ করেছে এবং যখন সে চোখ বন্ধ করে তখনও সে অনুভব করে যে দেব এর ফিসফিস ত্বকের নিচে তার দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। দোকানে পোশাক পরে দেখার ট্রায়াল রুমটি বেশ বড় এবং চারদিকের দেয়ালে আয়না লাগানো। সে তার পাশেই দেখলো এক বৃদ্ধা মহিলা উজ্জ্বল মুখবিশিষ্ট এবং মাথায় মোটা জটপাকানো চুল। খালি পায়ে দাঁড়ানো মহিলার পরনে শুধু অন্তর্বাস। তিনি দেহে পরে নিচ্ছেন কালো নেটের মোজা।

মহিলা পরামর্শ দিলেন, "সবসময় চেক করে দেখবে এসবের মধ্যে গুটি পাকানো আছে কিনা।"

মিরান্ডা খোলা প্রান্তবিশিষ্ট মখমলের জামাটি বুকের কাছে তুলে ধরলো। বৃদ্ধা মহিলা অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, "খুব সুন্দর হয়েছে।"

"আর এটি?" রূপালি ককটেল ড্রেসটি তুলে ধরে বললো। "চমৎকার" বৃদ্ধা বললেন। "সে তো এটি ছিড়ে ফেলে তোমাকে পেতে চাইবে।"

মিরান্ডা তাদের দু'জনকে সাউথ এন্ডের একটি রেস্টুরেন্টে কল্পনা করলো, যেখানে তারা আগেও গেছে। দেব পানীয় এবং শ্যাম্পেন ও রাসবেরী সহযোগে তৈরি এক ধরনের সুপের অর্ডার দেয়। সে নিজেকে ককটেল ড্রেসে এবং দেবকে স্যুট পরা অবস্থায় ভাবে। টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে তার প্রসারিত হাতে চুমু দিচ্ছে। শেষবার তাদের সাক্ষাতের অনেকদিন পর শুধু এক রোববার বিকেলে দেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। দেবের পরনে ছিল ব্যায়ামের পোশাক। তার স্ত্রী ফিরে আসার পর, সেটিই ছিল তার অজুহাত : রোববারগুলোতে সে বোস্টনে আসে এবং চার্লস রোড ধরে গাড়ি হাঁকায়। প্রথম রোববার সে দরজা খুলে তখন তার পরনে ছিল হাঁটু পর্যন্ত দীর্ঘ গাউন। কিন্তু দেব সেদিকে লক্ষও করে না। সে তাকে বিছানা পর্যন্ত তুলে নিয়ে যায় এবং প্যান্টি, জুতা পরা অবস্থায় তাকে সঙ্গম করে একটি কথা না বলেই। পরে সে গাউনটি আবার পরে সিগারেটের ছাই ফেলার জন্যে দেবকে একটি পাত্র এনে দেয়। কিন্তু দেব বরং অভিযোগ করে যে, মিরান্ডা তাকে তার দীর্ঘ পায়ের দর্শন থেকে বঞ্চিত করেছে এবং তাকে গাউন খুলে ফেলতে বলে। পরের রোববার মিরান্ডা পোশাক নিয়ে আর মাথা ঘামালো না। সে জিনস পরলো। তার অন্তর্বাসগুলো একটি ড্রয়ারের পিছনে মোজা ও নিত্যদিনের ব্যবহার্য অন্যান্য অন্তর্বাসের মাঝে রেখে দিল। রূপালি ককটেল ড্রেস ঝুলিয়ে রাখলো আলমারিতে, সেলাই থেকে ট্যাগ ঝুলছিল। মাঝে মাঝে সকালে পোশাকটি ফ্লোরে কাপড়ের স্তূপে পড়ে থাকবে, কখনো হ্যাঙ্গার থেকে খুলে পড়বে। এখনো মিরান্ডা রোববারের প্রতীক্ষা করে। রোববার সকালে সে খাবারের দোকানে যায় এবং দেব যে সব খেতে পছন্দ করে সেগুলো কিনে। হেরিং মাছের শুঁটকি, আলুর সালাদ এবং অন্যান্য খাবার। সাধারণত তারা বিছানায় বসেই খায়, হেরিং মাছ আঙুল দিয়ে তুলে মুখে পুরে। দেব তার শৈশবের গল্প বলেছিল, যখন সে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ট্রেতে করে দেয়া আমের জুস পান করেই লেকের পাশে ক্রিকেট খেলতে ছুটতো। তখন সবার পরনে থাকতো সাদা পোশাক। সে আরো বলেছিল যে, আঠার বছর বয়সে তাকে নিউইয়র্কের একটি কলেজে পাঠানো হয়, যখন দেশে জরুরি অবস্থা জাতীয় কিছু চলছিল এবং সিনেমা দেখে দেখে আমেরিকান উচ্চারণ শিখতে তার বছরের পর বছর সময় লেগেছে। যদিও সে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করে এসেছে। কথা বলতে বলতে দেব তিনটি সিগারেট শেষ করতো, বিছানার পাশে রাখা পাত্রে সিগারেট চেপে নিভিয়ে ফেলতো। কখনো কখনো সে মিরান্ডাকে প্রশ্ন করতো, যেমন, তার কতজন প্রেমিক ছিল (তিনজন) এবং প্রথম যৌন অভিজ্ঞতার সময় তার বয়স কত ছিল (উনিশ বছর)।

দুপুরের খাবার শেষ করে তারা যৌন মিলনে লিপ্ত হতো। বেডকভারে রুটির গুড়ো ছড়িয়ে থাকতো। নিঃশেষিত হবার পর দেব বার মিনিটের মতো ঘুমাতো। মিরান্ডা কোন বয়স্ক লোককে দিনের বেলায় ঘুমুতে দেখেনি। কিন্তু দেব বলেছে যে, ভারতে থাকতেই তার এ ধরনের অভ্যাস হয়েছে। কারণ সেখানে এতো গরম যে, লোকজন সূর্যাস্তের আগে ঘরের বাইরে বেরুতে পারে না। "তাছাড়া আমরা এসময় একত্রে ঘুমুতে পারি।" সে ঠাট্টার সুরে বিড়বিড় করে বলতে বলতে বড় আকৃতির ব্রেসলেটের মতো তার শরীর জড়িয়ে ধরে।

শুধু মিরান্ডা কখনো ঘুমায় না। বিছানার পাশের টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকায় অথবা দেবের আঙুল নিজের আঙুলে তুলে নিয়ে মুখে চাপ দেয়। প্রতিটি আঙুলের গাঁটে আঁধডজন করে লোম। ছয় মিনিট পর সে দেব এর মুখের দিকে ফিরে, হাই তুলে এবং শরীর টানটান করে, বুঝতে চেষ্টা করে যে, আসলেই সে ঘুমুচ্ছে কিনা। সে সবসময় ঘুমেই থাকে। যখন সে শ্বাস নেয় তখন পাঁজরের অস্থিগুলো দৃশ্যমান হয়ে উঠে, যদিও তার উদরে স্ফীতি শুরু হয়েছে। কাঁধের উপর লোম নিয়ে তার নিজেরই আপত্তি। কিন্তু মিরান্ডা তাকে সুপুরুষ বলেই ভাবে এবং অন্য কোনভাবে কল্পনা করতে চায় না।

বার মিনিট শেষ হলেই দেব চোখ খুলে তাকাবে, যেন সারাক্ষণ সে জাগ্রতই ছিল, মিরিন্ডার দিকে তাকিয়ে হাসবে। পূর্ণ পরিতৃপ্তির ছাপ চেহারায়। একই ধরনের পরিতৃপ্তি সেও অনুভব করে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মিরান্ডার পায়ের গোড়ালিতে হাত বুলিয়ে বলে, "সপ্তাহের সেরা বার মিনিট।" এরপর সে লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে, প্যান্ট পরে, জুতার ফিতা বাঁধে। বাথরুমে গিয়ে সে দাঁত ব্রাশ করে তর্জনী দিয়ে। কথাটা সে মিরান্ডাকে বলেছিল যে, সকল ভারতীয় জানে যে, কি করে মুখ থেকে ধোঁয়ার গন্ধ দূর করতে হবে। মিরান্ডা যখন তাকে বিদায়ের চুম্বন দেয় তখন মাঝে মাঝে দেব এর চুলে তার গন্ধই পায়। কিন্তু মিরান্ডা দেব এর চলে যাওয়ার অজুহাত সম্পর্কে জানে—বিকেলে সে জগিং করবে, বাড়ি ফিরেই প্রথমে স্নান করে পরিচ্ছন্ন ও মিরান্ডার গন্ধমুক্ত হবে।

লক্ষ্মী ও দেবকে ছাড়া আর যে ভারতীয়দের মিরান্ডা জানে, সেই পরিবারটি সে যেখানে বড় হয়েছে সেই পাড়ায় থাকতো, দীক্ষিত নামে তারা পরিচিত ছিল। দীক্ষিতদের বাচ্চারা ছাড়া মিরান্ডাসহ পাড়ার ছেলেমেয়েদের কাছে মজার ব্যাপার ছিল যে, প্রতিদিন সন্ধ্যায় মি. দীক্ষিত জগিং করতেন তার সবসময় পরিধানের শার্ট ও ট্রাউজার পরে। ব্যতিক্রম ছিল শুধু একজোড়া সস্তা কাপড়ের জুতা। প্রতি উইকএন্ডে পরিবারটি—মা, বাবা, দুই ছেলে ও এক মেয়ে গাড়িতে গাদাগাদি করে উঠে চলে যেতো; কোথায় যেতো, কেউ জানে না। সব শিশুর বাবারা অভিযোগ করতো যে, মি. দীক্ষিত তার সামনের লন পরিষ্কার করে রাখেন না, ঝরে পড়া

পাতা ঝাড়ু দিয়ে সরান না এবং সকলের অভিন্ন অভিমত যে, দীক্ষিত পরিবারের বাড়িটির প্লাস্টিকের বেষ্টনী পাড়ার অন্য বাড়িগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মায়েরা মিসেস দীক্ষিতকে কখনো তাদের সাথে আর্মসস্ট্রংস সুইমিং পুলের পাশে আমন্ত্রণ জানাতো না। স্কুলের বাসের জন্যে অপেক্ষার সময় দীক্ষিতের ছেলেমেয়েরা একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতো। অন্য ছেলেমেয়েরা সুর করে দীক্ষিতকে (Dixits) উচ্চারণ করতো 'ডিগ শিট' (Dig shit) অর্থাৎ মল খুড়ে বের করো। এরপর তারা হাসিতে ফেটে পড়তো।

একবার মি. দীক্ষিতের মেয়ের জন্মদিনে পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মিরান্ডার এখনো মনে আছে যে বাড়িতে ধূপ ও পিঁয়াজের কড়া গন্ধ এবং সামনের দরজার সামনে জুতার স্তূপের কথা। কিন্তু তার সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে বালিশের কভারের আকৃতির এক টুকরা কাপড়ের কথা, যেটি সিঁড়ির নিচে কাঠের সঙ্গে আটকানো অবস্থায় ঝুলছিল। কাপড়ে একটি নগ্ন নারীর ছবি আঁকা, যার রক্তবর্ণ মুখ রাজপুরুষের হাতে ঢালের মতো দেখাচ্ছিল। তার বিশাল সাদা চোখ তার মন্দিরের দিকে। নারীমূর্তির কেন্দ্রস্থলে দু'টি বৃত্ত এবং বৃত্তের মাঝখানে দু'টি বিন্দু, যা স্তন নির্দেশ করেছে। এক হাতে তার ছোরা। এক পায়ের নিচে ভূপাতিত একজন মানুষ। তার দেহে ঝুলছে কিছু মানুষের সদ্যকর্তিত মস্তকের মালা যা থেকে রক্ত ঝরছে। মিরান্ডার দিকে সে তার জিভ বের করে রেখেছে।

"এটি আমাদের কালী দেবী" মিসেস দীক্ষিত কাপড়টা টান করে ছবিটাকে ভালো করে দেখিয়ে উৎসাহের সাথে বলেছিলেন। তিনি হাতে মেহেদি লাগিয়েছিলেন, তাতে অনেক জটিল আঁকিবুকি ও তারার চিত্র। "তোমরা সবাই এসো, কেক কাটার সময় হয়েছে।"

তখন মিরান্ডার বয়স নয় বছর। কেক খেতে তার ভয় হচ্ছিল। এর পরের কয়েক মাস পর্যন্ত দীক্ষিত পরিবারের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যেতেও তার ভয় লেগেছে। দিনে দু'বার সেদিক দিয়ে অতিক্রম করতে হতো তাকে, একবার বাস স্টপেজে যেতে, আরেক বার বাড়ি ফিরতে। পরবর্তী লনে না পৌঁছা পর্যন্ত এমনকি সে শ্বাস বন্ধ করে রাখতো, ঠিক যেভাবে স্কুল বাস একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় সে দম বন্ধ রাখতো।

এসব স্মৃতি মনে পড়লে এখন তার লজ্জা লাগে। এখন সে এবং দেব যখন যৌন মিলনে লিপ্ত হয়, তখন মিরান্ডা চোখ বন্ধ রাখে এবং মরুভূমি, হাতি, পূর্ণিমার আলোতে লেকে ভাসমান শ্বেতপাথরের প্যাভিলিয়ন দেখতে পায়। এক সকালে কোন কাজ না থাকায় সে সেন্ট্রাল স্কোয়ার পর্যন্ত পুরোটা পথ হেঁটে একটি ভারতীয় রেস্টুরেন্টে গিয়ে এক প্লেট তন্দুরি চিকেনের অর্ডার দেয়। খেতে খেতে মেনুর নিচদিকে মুদ্রিত শব্দগুলো মুখস্থ করতে চেষ্টা করে। যেমন, 'ডেলিশাস', 'ওয়াটার' এবং 'চেক, প্লিজ' এর মতো শব্দগুলোর ভারতীয় প্রতিশব্দ। কিন্তু

শব্দগুলো তার মনে গাঁথলো না। এরপর মাঝে মাঝে সে কেনমোর স্কোয়ারের একটি বুকস্টোরের বিদেশী ভাষা সেকশনে গিয়ে 'টিচ ইয়োরসেলফ' সিরিজের বই থেকে বাংলা অক্ষর পড়ার চেষ্টা করতো। এক পর্যায়ে তার আগ্রহ এতো প্রবল হলো যে, সে তার নামের ভারতীয় অংশ 'মীরা' বাংলায় তার নোট বই এ লিখতে চেষ্টা করলো। তার অনভ্যস্ত হাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছিল, থেমে যাচ্ছিল, কলম ঘুরাতে ও তুলতে হচ্ছিল। বই এর তীর চিহ্ন অনুসরণ করে সে বাম থেকে ডান দিকে একটি রেখা টানলো যেখান থেকে অক্ষর ঝুলে থাকে। একটি অক্ষরকে অক্ষরের চাইতে বরং সংখ্যার মতো মনে হয়, আরেকটিকে মনে হয় ত্রিভুজ। বই এর মধ্যে অক্ষরের যে নমুনা দেখানো হয়েছে তার নাম অনুরূপ অক্ষরে সাজাতে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করতে হলো তাকে। এরপরও সে নিশ্চিত হতে পারলো না যে, সে 'মীরা' লিখেছে না 'মারা'। সে যেনতেনভাবে লিখতেও হঠাৎ এক ধরনের ঝাঁকুনির সাথে সে উপলব্ধি করলো যে, বিশ্বের কোন না কোন স্থানে তার নামের কোন একটা অর্থ আছে।

অফিস খোলা থাকার দিনগুলোতে তার তেমন খারাপ লাগতো না। কাজই তাকে ব্যস্ত রাখতো। লক্ষ্মী এবং সে একসাথে নতুন এক ভারতীয় রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করতে শুরু করেছে এবং তখন লক্ষ্মী তাকে তার বোনের বৈবাহিক সম্পর্কের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানায়। মিরান্ডা কখনো প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গের অবতারণায় একবার কলেজে তার যে অনুভূতি এসেছিল, সেরকম মনে হয়। সে ও তার বয়ফ্রেন্ড একবার এক ব্যস্ত দোকানে খাবার খেয়ে দাম পরিশোধ না করেই চলে এসেছিল, শুধু এটা দেখার জন্যে যে, দাম না দিয়ে তারা পার পেতে পারে কি না। কিন্তু লক্ষ্মী একটি বিষয় ছাড়া আর কিছুই বলে না। "আমি যদি আমার বোন হতাম, তাহলে সোজা লন্ডনে গিয়ে ওদের দু'জনকেই গুলী করতাম।" লক্ষ্মী একদিন ঘোষণা করলো। একটি পাপড় ভেঙ্গে চাটনিতে ভিজিয়ে মুখে পুরলো। "আমি বুঝতে পারি না যে, সে কি করে এভাবে অপেক্ষা করছে।"

মিরান্ডা জানে কিভাবে অপেক্ষা করতে হয়। সন্ধ্যায় সে ডাইনিং টেবিলে বসে তার নখে নতুন করে নেল পালিশ লাগায় এবং প্লেটে না নিয়ে গামলা থেকেই সালাদ খায় ও টেলিভিশন দেখে এবং রোববারের জন্যে প্রতীক্ষা করে। শনিবার সবচেয়ে বাজে দিন কাটে তার, কারণ সেদিন তার মনে হয়, রোববার আর কখনো আসবে না। এক শনিবার গভীর রাতে দেব ফোন করলে সে ফোনে বহু লোকের হাসি ও কথাবার্তা শুনলো। সে দেবকে জিজ্ঞেস করলো যে, সে কি কোন কনসার্টে হলে কি না। কিন্তু সে তার শহরতলীর বাড়ি থেকে ফোন করেছিল। "আমি তোমার কথা ভালোভাবে শুনতে পারছি না", সে বললো, "আমাদের বাড়িতে অনেক অতিথি। তুমি কি আমাকে মিস করছো?" সে টেলিভিশনের দিকে তাকালো। ফোন

বাজতেই রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে সে টেলিভিশনের শব্দ বন্ধ করে দিয়েছিল। মিরান্ডা মনে মনে ভাবলো, দেব উপরতলার একটি রুম থেকে এক হাতে দরজার তালা চেপে ধরে তার সেলুলার ফোন থেকে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। নিচে রুমগুলো অতিথিতে পূর্ণ। "মিরান্ডা, তুমি কি আমাকে মিস করছো?" সে আবার জানতে চাইলো। সে তাকে বললো যে, সত্যিই তাকে মিস করছে।

পরদিন দেব এলে মিরান্ডা জানতে চাইলো যে, তার স্ত্রী দেখতে কেমন? প্রশ্নটা করতে তার অস্বস্তি লাগলেও উত্তরের জন্যে তার শেষ সিগারেট পান করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। সিগারেটের গোড়া পাত্রে পিষে নিভিয়ে ফেললো। সে ভাবলো, তারা কি ঝগড়া করে। কিন্তু মিরান্ডার প্রশ্নে দেব অবাক হয়নি। একটি ক্রেকার বিস্কুটের উপর কিছু সিদ্ধ করা মাছ ছড়িয়ে তাকে বললো যে, তার স্ত্রী দেখতে বোম্বের চিত্রনায়িকা মাধুরী দীক্ষিতের মতো।

মুহূর্তের জন্যে মিরিন্ডার হৃদস্পন্দন থেমে গেল। কিন্তু দীক্ষিত পরিবারের মেয়েটির নাম ভিন্ন কিছু ছিল। সে নামটা এমন ছিল যার আদ্যাক্ষর 'পি'। তবু সে ভাবলো, অভিনেত্রী এবং দীক্ষিত পরিবারের মেয়েটির মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে কি না। সে মেয়েটি ছিল সাদাসিধে, হাইস্কুলের পুরো সময় সে মাথায় দু'টি বেণী বেঁধেছে।

কয়েক দিন পর মিরান্ডা সেন্ট্রাল স্কোয়ারে একটি ভারতীয় দোকানে গেল, যে দোকান থেকে ভিডিও ভাড়া দেয়া হয়। একটি জটিল শব্দ তুলে দরজাটি খুললো। তখন ডিনারের সময় এবং সেই দোকানে একমাত্র গ্রাহক। দোকানের এক কোনায় টেলিভিশনে ভিডিও প্রদর্শিত হচ্ছিল। সমুদ্র সৈকতে একদল তরুণী সংক্ষিপ্ত অন্তর্বাস পরে যুগপৎ তাদের নিতম্ব প্রদর্শন করছে।

'আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?' ক্যাশ কাউন্টারের দাঁড়ানো লোকটি জানতে চাইলো। সমুচা খাচ্ছিল লোকটি, ধূসর বর্ণের সসে ভিজিয়ে। তার কোমরের কাছে কাঁচের নিচে আরো সমুচার ট্রে, সেগুলো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। হীরকাকৃতির সমুচা উজ্জ্বল কাগজে মোড়ানো। এছাড়া সিরার মধ্যে ভাসছে উজ্জ্বল কমলা রং এর কিছু পেস্ট্রি। "আপনি কি ভিডিও নেবেন?" মিরান্ডা তার নোটবই খুললো, যেখানে সে লিখে রেখেছে 'Mottery Dixit'। কাউন্টারের পিছনে শেলফে সাজানো ভিডিও'র দিকে তাকালো সে। দেখলো মহিলারা যে স্কার্ট পরেছে তা সংক্ষিপ্ত এবং নিতম্বের সাথে সেটে বসেছে এবং গায়ের বস্ত্রখণ্ড এমনভাবে লেগেছে যেন তাদের স্তনের মাঝখানে বন্দনা করছে। অনেকে একটি পাথর বা গাছের সাথে হেলান দিয়ে আছে। তারা সুন্দরী। সৈকতে মহিলারা যেভাবে নাচছে তাও চমৎকার। তাদের চোখে কাজল লাগানো, দীর্ঘকালো চুল। তখন সে বুঝতে পারলো মাধুরী দীক্ষিতও সুন্দরী।

"সংলাপের ইংরেজি লিখাসহ ভিডিও আমাদের কাছে আছে" লোকটি বললো। সে আঙুলের ডগাগুলো দ্রুত শার্টে মুছে তিনটি ভিডিও বের করলো।

"না, লাগবে না", মিরান্ডা বললো, "আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।" সে দোকানে ঘুরে দেখতে লাগলো। লেবেল বিহীন প্যাকেট ও টিন সাজানো শেলফগুলো যাচাই করলো। ফ্রিজারে অনেক ধরনের পিঠা এবং সবজি রাখা, যেগুলো সে আগে কখনো দেখেনি। একটিমাত্র জিনিস সে চিনতে পারলো। র‍্যাকে সাজানো চানাচুরের প্যাকেট, যা লক্ষ্মী সবসময় খায়। লক্ষ্মীর জন্যে কিছু চানাচুর কেনার ইচ্ছা হলো তার। এরপর দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়লো। ভাবলো যে, ভারতীয় দোকানে সে কি করছিল, তার কি ব্যাখ্যা দেবে। "খুব মসলাযুক্ত" লোকটি তার মাথা নেড়ে বললো। তার চোখ মিরান্ডার শরীরের উপর দিয়ে ঘুরছে। "আপনার জন্যে খুব বেশি মসলাযুক্ত।"

ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে লক্ষ্মীর বোনের স্বামীর কোন বোধোদয় হয়নি। সে মন্ট্রিলে ফিরেছিল। কিন্তু দু'সপ্তাহ ধরে স্ত্রীর সাথে তিক্ত ঝগড়া-বিবাদের পর দু'টি স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে লন্ডনে চলে গেছে এবং তালাক চেয়েছে।

মিরান্ডা তার ডেস্কে বসে লক্ষ্মীর কথা শুনছে যে, সে তার বোনটিকে বলে চলেছে যে, পৃথিবীতে ভালো মানুষও আছে। যথাসময়েই তাদের সাক্ষাৎ মিলবে। পরদিন তার বোন জানালো, সে এবং তার ছেলে ক্যালিফোর্নিয়ায় তার বাবা মা'র কাছে যাচ্ছে স্বস্তি ফিরে পেতে। লক্ষ্মী তাকে বোস্টনে একটি উইকএন্ড কাটিয়ে যাবার ব্যাপারে সম্মত করলো। "কিছু সময়ের জন্যে স্থান পরিবর্তনে তোমার ভালো লাগবে" লক্ষ্মী নমনীয়তার সাথে তাকে অনুরোধ করে। "তাছাড়া, অনেক বছর ধরে আমি তোমাকে দেখি না।"

মিরান্ডা তার ফোনের দিকে তাকালো। দেবকে ফোন করতে ইচ্ছে হলো তার। তাদের শেষ কথাবার্তার পর চারদিন কেটে গেছে। সে শুনলো, লক্ষ্মী টেলিফোনের 'অনুসন্ধানে' ডায়াল ঘুরিয়ে একটি বিউটি সেলুনের নম্বর চাচ্ছে। "কিছুটা আরামদায়ক হতে হবে" লক্ষ্মী অনুরোধ জানালো। সে মালিশ, ফেসিয়াল, হাত ও নখের সজ্জা এবং পায়ের গোড়ালির যত্নবিধানের জন্যে সময় নির্ধারণ করলো। এরপর সে ফোর সিজনস রেস্টুরেন্টে লাঞ্চের জন্যে একটি টেবিল বুক করলো। স্বামী পরিত্যক্তা বোনকে চাঙ্গা করে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যস্ততায় লক্ষ্মী তার বোনের ছেলেটির কথা বেমালুম ভুলে গেছে। আঙুলের পাঁট দিয়ে দেয়ালে টোকা দিয়ে বললো, "তুমি কি শনিবারে ব্যস্ত থাকবে?"

ছেলেটি শুকনো। তার পিঠে বেল্ট দিয়ে আটকানো একটি ব্যাগ। ধূসর রং এর প্যান্ট, লাল রং এর ভি-গলার সোয়েটার এবং পায়ে চামড়ার কালো জুতা। তার চুল এমনভাবে ছাঁটা হয়েছে যে চোখের উপরে পড়েছে, যার নিচে গোল

কালো বৃত্তের মতো। মিরান্ডা তার প্রথম দৃষ্টিতে এসবই লক্ষ করলো। যদিও তার বয়স মাত্র সাত বছর, কিন্তু এভাবে তাকে অত্যন্ত রাগী রাগী মনে হচ্ছে, যেন সে অতিমাত্রায় ধূমপান করে এবং অল্পক্ষণ ঘুমায়। তার হাতে স্পাইরেল বাঁধাই করা ছবি আঁকার কাগজের একটি বড় প্যাড। ছেলেটির নাম রোহিন।

"আমাকে কোন একটি রাজধানীর নাম বলতে বলো" মিরান্ডার দিকে তাকিয়ে সে বললো।

মিরান্ডা তার দিকে ফিরে তাকালো। তখন শনিবারের সকাল সাড়ে আটটা। কফিতে চুমুক দিলো সে। "ও কি বলে?"

"এটা ওর একটি খেলা।" লক্ষ্মীর বোন ব্যাখ্যা করে। সেও তার ছেলের মতোই শীর্ণ। লম্বাটে মুখ এবং চোখের নিচে একই ধরনের কালো বৃত্ত। তার কাঁধে মরচে রঙা একটি কোট। তার কালো চুলের ফাঁকে সিঁথিতে কিছু পাকা চুল। ব্যালে নর্তকীদের মতো পিছন দিকে চুলগুলো খোপা বাঁধা। আপনি ওকে একটি দেশের নাম বলুন, সে আপনাকে সে দেশের রাজধানীর নাম বলে দেবে।

"ওর কথা গাড়িতেই শোনা উচিত ছিল" লক্ষ্মী বললো। "ওতো ইতোমধ্যে ইউরোপের সব দেশ মুখস্থ করে ফেলেছে।"

"এটা কোন খেলা নয়", রোহিন বললো। "স্কুলে একটি ছেলের সাথে আমার কমপিটিশন চলছে। আমরা সব দেশের রাজধানীর নাম মুখস্থ করার প্রতিযোগিতা করছি। তাকে আমি হারাবোই।" মিরান্ডা মাথা নাড়লো। "ঠিক আছে। ভারতের রাজধানীর নাম বলো।"

"এটা তো কঠিন কিছু নয়।" কুচকাওয়াজ করার মতো করে সে এগিয়ে গেল, হাত দু'টি খেলনা সৈনিকের মতো দুলছিল। এরপর সে তার মায়ের কাছে গিয়ে তার ওভারকোটের একটি পকেটে হাত দিয়ে টানতে লাগলো। "এর চেয়ে কঠিন প্রশ্ন করো।"

"সেনেগাল", সে বললো।

"ডাকার" রোহিন বিজয়ীর আনন্দে বলে উঠে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো। এক পর্যায়ে সে দৌড়ে কিচেনে গেল। মিরান্ডা শুনতে পাচ্ছে যে, সে ফ্রিজ খুলছে ও বন্ধ করছে।

"রোহিন, না বলে কিছু ধরো না" লক্ষ্মীর বোন ক্লান্ত কণ্ঠে বললো। মিরান্ডার দিকে তাকিয়ে কোনমতে হাসলো। "কিছু ভাববেন না। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সে ঘুমিয়ে পড়বে। ওর প্রতি খেয়াল করার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।"

"তিনটায় ফিরে আসবো " লক্ষ্মী ও তার বোন করিডোরের দিকে এগুতে এগুতে বললো। "আমরা দু'টি গাড়ি পার্ক করে এসেছি।" মিরান্ডা দরজার চেন আটকালো। রোহিনকে সামলাতে কিচেনে গেল। কিন্তু এখন সে লিভিং রুমে চলে এসেছে। ডাইনিং টেবিলের পাশে চেয়ারের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছে সে। তার ব্যাগের চেন খুলে মিরান্ডার নেলপালিশের বাক্সেট টেবিলের একপাশে সরিয়ে দিয়ে

টেবিলের উপর রং পেন্সিলগুলো বের করে রাখলো। মিরান্ডা তার পাশে দাঁড়ালো। সে লক্ষ করলো রোহিন নীল রং এর পেন্সিল দিয়ে একটি বিমানের ছবি আঁকতে চেষ্টা করছে।

"খুব সুন্দর হয়েছে", মিরান্ডা বললো। সে উত্তর না দেয়ায় মিরান্ডা কিচেনে গিয়ে নিজের জন্যে আরো কফি নিলো।

"প্লিজ, আমার জন্যে একটু" রোহিন জোরে বললো।

মিরান্ডা লিভিংরুমে ফিরে এলো। "একটু কি?"

"একটু কফি। পাত্রে অনেকখানি আছে। আমি দেখেছি।" সে টেবিলের উল্টোদিকে গিয়ে রোহিনের মুখোমুখি বসলো। তখন সে আরেকটি নতুন পেন্সিলের জন্যে প্রায় উঠে দাঁড়িয়েছে। ফলে চেয়ারে একটি গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

"কফি পানের বয়স তোমার এখনো হয়নি।"

রোহিন তার স্কেচ প্যাডের উপর ঝুঁকে পড়ায় তার ছোট বুক ও কাঁধ প্রায় প্যাড স্পর্শ করেছে, মাথা একদিকে হেলানো। "স্টুয়ার্ডেস আমাকে কফি পান করতে দেয়" সে বললো। "দুধ ও প্রচুর চিনি মিশিয়ে আমাকে কফি বানিয়ে দেয়। সে সোজা হয়ে বসলো এবং বিমানের পাশে আঁকা একটি মহিলার মুখের দিকে তাকালো। দীর্ঘ ঢেউ খেলানো চুল এবং চোখ দু'টো তারকার মতো। "তার চুলগুলো আরো উজ্জ্বল" সে বললো এবং সাথে যোগ করলো, "আমার বাবাও বিমানে এক সুন্দরী মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করেছে।" মিরান্ডার দিকে তাকালো সে। তাকে কফির কাপে চুমুক দিতে দেখে তার মুখ ভারি হয়ে উঠলো। "আমি কি সামান্য একটু কফি পেতে পারি না, প্লিজ!"

মিরান্ডা অবাক হলো, ছেলেটি স্থির, গম্ভীর প্রকাশ সত্ত্বেও তাকে কেমন ক্ষ্যাপাটে, বদমেজাজি ধরনের মনে হচ্ছিল। সে কল্পনা করলো, ছেলেটি চামড়ার জুতা পরা অবস্থায় তাকে লাথি দিচ্ছে, কফির জন্যে চিৎকার করছে এবং তার মা ও লক্ষ্মী ফিরে আসা পর্যন্ত সে কাঁদতেই থাকবে। সে কিচেনে গিয়ে রোহিনের অনুরোধ রক্ষার জন্যে এক কাপ কফি তৈরি করে আনলো। এমন একটি মগে তাকে কফি দিলো, যেটি রোহিন ভেঙ্গে ফেললেও সে গায়ে মাখবে না।

"থ্যাংক ইউ" টেবিলে কফি রাখার পর রোহিন বললো। ছোট চুমুকে পান করতে শুরু করলো দু'হাতে মগ আঁকড়ে ধরে। তার আঁকার সময় মিরান্ডা পাশে বসে থাকলো। কিন্তু যখন সে তার নখে নতুন করে আরেক প্রলেপ পালিশ লাগানোর চেষ্টা করলো তখন রোহিন বাধা দিল। তার পরিবর্তে ব্যাগ থেকে পেপারব্যাক ওয়ার্ল্ড আলমানাক বের করে দিয়ে তাকে প্রশ্ন করতে বললো। মহাদেশ অনুসারে দেশের নাম সাজানো, এক একটি পৃষ্ঠায় ছ'টি করে দেশের নাম। রাজধানীর নাম মোটা অক্ষরে মুদ্রিত। এছাড়া জনসংখ্যা, সরকার এবং অন্যান্য পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মিরান্ডা আফ্রিকা মহাদেশের পৃষ্ঠায় গিয়ে তালিকা দেখলো।

"মালি" মিরান্ডা উচ্চারণ করলো।

"বামাকো" সে ঝটপট উত্তর দিল।

"মালাবী।"

"লিলংউই।"

মিরান্ডার মনে পড়লো মাপ্পারিয়ামে আফ্রিকার দিকে দেখার কথা। তার মনে হলো, আফ্রিকার প্রশস্ত অংশ সবুজ ছিল।

"থামলে কেন? আরো বলো।" রোহিন বললো।

"মৌরিতানিয়া।"

"নোয়াকচোট।"

"মরিশাস।"

সে থামলো। চোখ কুঞ্চিত করে বন্ধ করে আবার খুললো। বলতে পারছে না সে। "আমি মনে করতে পারছি না।"

"পোর্ট লুইস", সে বলে দিল।

"পোর্ট লুইস।" রোহিন বার বার উচ্চারণ করলো। এক দমে কোরাসের মতো।

তারা যখন আফ্রিকার শেষ দেশটিতে পৌছলো, তখন রোহিন বললো, সে কার্টুন দেখতে চায়। মিরান্ডাকেও বললো তার সাথে দেখতে। কার্টুন শেষ হলে সে মিরান্ডার সাথে কিচেনে গেল এবং যখন সে আবার কফি বানাচ্ছিল, তখন তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো। কয়েক মিনিট পর মিরান্ডা বাথরুমে গেলে সে তাকে সেখানে অনুসরণ করলো না। কিন্তু সে দরজা খুলে সামনেই তাকে দাঁড়ানো দেখে একটু চমকে উঠলো।

"তুমিও কি বাথরুমে যাবে?"

সে মাথা নাড়লেও কোন কারণে বাথরুমে ঢুকলো। কমোডের উপর কভার নামিয়ে তার উপর উঠে দাঁড়ালো এবং সিঙ্কের উপর সংকীর্ণ কাঁচের শেলফে চোখ ফেললো, যেখানে মিরান্ডার টুথ ব্রাশ, মেকাপ ইত্যাদি রাখা।

"এটা কি জন্যে?" দেবের সাথে প্রথম সাক্ষাতের দিন সেলসওম্যান তাকে আইজেলের যে স্যাম্পলটি দিয়েছিল সে তুলে জানতে চাইলো।

"এটি চোখ ভিজানোর জন্যে।"

"চোখ ভিজানোর মানে কি?"

"এখানে লাগাতে হয়" চোখে আঙুল তুলে সে ব্যাখ্যা করলো।

"কাঁদলে এটি ব্যবহার করতে হয় বুঝি?"

"অনেকটা তাই।"

রোহিন টিউবের মুখ খুলে ঘ্রাণ নিলো। চাপ দিয়ে আঙুলে এক ফোটা নিল এবং হাতে মাখলো। "জ্বালা করছে।" হাতের পিঠ সে ভালোভাবে দেখলো, যেন এর ফলে রং বদলে যাবে বলে সে ধারণা করছে। "আমার মায়েরও এগুলো

আছে। মা বলে যে, এটা ঠাণ্ডা। কিন্তু আসলেই মা কাঁদে, কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। অনেক সময় ডিনারে বসে কাঁদে। কখনো এতো জোরে জোরে কাঁদে যে তার চোখ কোলা ব্যাঙ এর মতো ফুলে উঠে।"

মিরান্ডা ভাবলো সে ছেলেটিকে খাওয়ানোর চেষ্টা করবে কি না। কিচেনে সে এক প্যাকেট চালের আটার পিঠা এবং কিছু লেটুস পেল। সে তাকে বললো বাইরের দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে আনবে। কিন্তু রোহিন বললো যে, সে খুব একটা ক্ষুধার্ত নয়। এবং একটি পিঠা নিলো। "তুমিও একটা খাও", সে বললো। তারা টেবিলের দু'পাশে বসলো। চালের পিঠা দু'জনের মাঝখানে। স্কেচ প্যাডের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বললো, "তুমি আঁকো। মিরান্ডা একটি নীল পেন্সিল নিলো। "কি আঁকবো?"

রোহিন এক মুহূর্ত ভাবলো। "আমি জানি"। সে তাকে লিভিংরুমের জিনিসগুলো আঁকতে বললো, সোফা, হাতলওয়ালা চেয়ার, টেলিভিশন, টেলিফোন আঁকতে বললো। "এভাবে আমি মনে করতে পারি।"

"কি মনে রাখতে চাও!"

"আমাদের একসাথে থাকার দিনটিকে।" সে আরেকটি পিঠা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো।

"তুমি এটা মনে রাখতে চাও কেন?"

"কারণ আর কোনদিন আমরা একে অন্যকে দেখবো না।"

তার এই স্পষ্ট কথায় মিরান্ডা চমকালো। তার দিকে তাকালো সে। একটু বিষণ্ন বোধ করলো। কিন্তু রোহিনকে বিপন্ন দেখাচ্ছে না। সে পৃষ্ঠার উপর নির্দেশ দিলো, "আঁকো।" অতএব সে জিনিসগুলো যতটা ভালো করে সম্ভব আঁকলো— সোফা, হাতলওয়ালা চেয়ার, টেলিভিশন, টেলিফোন। সে উঠে মিরান্ডার কাছে গেল, এতো কাছে গেল যে, সে কি করছিল মাঝে মাঝে তা দেখাও সমস্যার হয়ে দাঁড়ালো। সে তার ছোট্ট বাদামি হাত তার উপর রাখলো। "এখন আমাকে।"

মিরান্ডা তাকে পেন্সিল দিয়ে দিল।

রোহিন তার মাথা নেড়ে বললো, "না, এখন আমাকে আঁকো।"

"আমি পারবো না," সে বললো। "আমি যা আঁকবো তা তোমার মতো হবে না।"

রোহিনের মুখে আবার ধ্যানমগ্নতার ছাপ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো, ঠিক তাকে কফি দিতে অস্বীকার করার পর চেহারায় যে ছাপ ফুটে উঠেছিল, ঠিক তেমনি। "প্লিজ!"

মিরান্ডা তার মুখ আঁকলো, মাথার আকৃতি নির্দেশক রেখা টানলো এবং চুলের মোটা প্রান্ত। সে স্থির, আনুষ্ঠানিক ও বিষণ্নতা নিয়ে বসে আছে। তার দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ। মিরান্ডা ইচ্ছা করছিল, তার চেহারাটা যাতে সুন্দর করে আঁকতে পারে। তার হাত ও চোখ একতালে চলছে, অজ্ঞাত পদ্ধতিতে, ঠিক সেদিন

বুকস্টোরে বাংলায় নিজের নাম লিখে নেয়ার সময় যেমনটি হয়েছিল। ছবিটা আদৌ রোহিনের মতো হয়নি। ছবিতে নাক আঁকার মাঝ পর্যায়ে রোহিন শরীর বাঁকিয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়লো।

"আমার ক্লান্তি লাগছে", সে মিরান্ডার বেডরুমের দিকে যেতে যেতে বললো। বেডরুমের দরজা ও কেবিনেটের ড্রয়ার খোলার ও বন্ধ করার শব্দ শুনলো মিরান্ডা। সে যখন রুমে ঢুকলো তখন রোহিন তার আলমারির ভিতরে। এক মুহূর্ত পর সে বের হলো। তার চুল এলোমেলো। সে হাতে ধরে আছে রূপালি ককটেল ড্রেসটি। "এটি ফ্লোরে পড়ে ছিল।"

"হ্যাঙ্গার থেকে পড়ে গেছে।"

রোহিন জামাটি ভালো করে দেখে মিরান্ডার শরীরের দিকে তাকালো। "এটি পরো তো।"

"কি বললে?"

"এই জামাটি পরো।"

জামাটি পরার কোন কারণই নেই। ফিলেন্স শপিং সেন্টারের ট্রায়াল রুমে পরে দেখার পর সে আর কখনো সেটি পরেনি এবং দেব এর সঙ্গে যতদিন সম্পর্ক থাকবে সে কখনো এ জামা পরবে না। সে জানে, তারা আর কখনো রেস্টুরেন্টে যাবে না, যেখানে সে টেবিলের উল্টো দিকে বসে তার হাত টেনে নিয়ে চুমু দেয়। রোববারগুলোতে তার অ্যাপার্টমেন্টে তাদের সাক্ষাৎ হবে। দেবের পরনে থাকবে প্যান্ট, তার পরনে জিনস। সে রোহিনের হাত থেকে জামাটি নিয়ে ঝাড়লো, যদিও উজ্জ্বল কাপড়ে কোন ভাঁজ পড়েনি। সে আলমারির কাছে গেল একটি হ্যাঙ্গার খুঁজতে।

"প্লিজ, এটি পরো", রোহিন বললো, তার পিছনে দাঁড়িয়ে। তার মুখ মিরান্ডার গায়ে ঘষতে লাগলো শুকনো দু'হাতে তার কোমর আঁকড়ে ধরে। "প্লিজ।"

"ঠিক আছে", মিরান্ডা বললো। তার আঁকড়ে ধরার জোর দেখে সে অবাক হলো।

রোহিন হাসলো, তৃপ্তির হাসি এবং তার বিছানার প্রান্তে বসলো। "তোমাকে বাইরে অপেক্ষা করতে হবে", দরজার দিকে নির্দেশ করে বললো। পরা শেষ হলেই আমি বের হয়ে আসছি।"

"কিন্তু আমার মা তো আমার সামনেই কাপড় খুলে।"

"কি বলছো, সে তাই করে?"

রোহিন মাথা নাড়লো। "মা তো খোলা কাপড়গুলো তুলেও রাখে না। বিছানার পাশে ফ্লোরেই ফেলে রাখে এলোমেলো করে।"

"একদিন মা আমার রুমে শুয়েছিল" রোহিন বলেই চলেছে। "সে বলেছে তার বিছানার চাইতে আমার বিছানায় সে ভালো বোধ করে। এখন তো আমার বাবা চলে গেছে।"

"আমি তোমার মা নই।" মিরান্ডা বললো। বিছানা থেকে তার বগল তলায় দু'হাতে আলগে তুলতে চেষ্টা করলো। সে দাঁড়াতে অস্বীকার করলে মিরান্ডা তাকে উপরে তুললো। তার ধারণার চাইতে রোহিন ভারি এবং সে তাকে জড়িয়ে ধরে থাকলো। দু'পায়ে শক্ত করে তার নিতম্ব পেঁচিয়ে ধরেছে। মাথা বুকের উপর রাখা। মিরান্ডা তাকে করিডোরে নামিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করলো। অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে সে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। সে কাপড় পাল্টে পূর্ণ দৈর্ঘ আয়নায় নিজেকে দেখলো। তার খাটো মোজা হাস্যকর লাগছে। আলমারির পিছনের দিকে ক্ষুদ্র বাকলসযুক্ত হাইহিলের জুতা খুঁজলো। জামাটির চেনের সারি তার কলারবোনে কাগজের ক্লিপের মতো হালকা লাগছে। শরীরে ঢিলেঢালা মনে হচ্ছে জামাটি। সে নিজে জামার জিপার লাগাতে পারলো না।

রোহিন দরজায় টোকা দিতে শুরু করেছে। "আমি কি এখন ভিতরে আসতে পারি?"

সে দরজা খুললো। রোহিন দু'হাতে আলমানাক ধরে আছে, দম বন্ধ করে কি যেন বিড়বিড় করছে। মিরান্ডাকে দেখে তার চোখ বড় বড় হলো। "জিপারটা লাগাতে একটু সাহায্য করো", মিরান্ডা বললো বিছানার প্রান্তে বসলো।

রোহিন জিপার টেনে উপরে তুলতে মিরান্ডা উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরলো। রোহিন আলমানাক রেখে দিয়েছে।

"তুমি খুব সেক্সি" রোহিন বলে উঠলো।

"কি বললে তুমি?"

"তুমি সেক্সি।"

মিরান্ডা ধপ করে বসে পড়লো। যদিও সে জানে যে, রোহিনের বলায় কিছু আসে যায় না, তবু তার হৃদপিন্ড একটু লাফিয়ে উঠলো। সম্ভবত রোহিন সব মহিলাকেই সেক্সি মনে করে। সম্ভবত শব্দটি সে টেলিভিশনে শুনেছে অথবা ম্যাগাজিনের কভারে দেখেছে। তার মনে পড়লো মাপ্পারিয়ামে দেব থেকে সেতুর ওপারে দাঁড়ানোর কথা। সে সময় তার মনে হয়েছিল সে শব্দটির মানে কি তা সে জানে। তখন তাদের কাছে এ শব্দের অর্থ ছিল।

মিরান্ডা বুকের উপর আড়াআড়ি করে হাত বেঁধে রোহিনের চোখে চোখ রেখে তাকালো। "ব্যাপারটা আমাকে বলো তো।"

রোহিন নীরব।

"এর মানে কি?"

"কি?"

"'সেক্সি' শব্দের অর্থ কি? এ দিয়ে কি বুঝায়?"

সে নিচের দিকে তাকালো। সহসা সে লাজুক হয়ে পড়েছে। "আমি তোমাকে বলতে পারবো না।"

"বলতে পারবে না কেন?"

"এটি গোপনীয় বিষয়।" সে ঠোঁট চেপে রেখেছে, যার ফলে ঠোঁট খানিকটা সাদা হয়ে গেছে।

"গোপন কথাটাই আমাকে বলো। আমি জানতে চাই।"

রোহিন মিরান্ডার পাশে বিছানায় বসলো এবং জুতার গোড়ালি দিয়ে ম্যাট্রেসের উপর লাথি দিতে শুরু করলো। নার্ভাসের মতো হাসলো। কাতুকুতু দিলে শরীর যেন সংকুচিত হয়, তেমন মনে হলো তাকে। "আমাকে বলতে হবে" মিরান্ডা জোর দিয়ে বললো। একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে তার গোড়ালি আঁকড়ে পা দু'টি স্থির করে ধরে রাখলো। রোহিন তার চোখের দিকে তাকালো। তার দৃষ্টি যেন মিরান্ডাকে বিদীর্ণ করবে। ম্যাট্রেসে আবার লাথি দেয়ার জন্যে সে জোর খাটাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু মিরান্ডা তাকে চেপে ধরেছে। সে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। মুখের উপর হাত দু'টি গোল করে ধরে ফিস ফির করে বললো, "এর মানে হলো এমন কাউকে ভালোবাসা, যাকে তুমি জানো না।" মিরান্ডা তার ত্বকের নিচে রোহিনের শব্দগুলো অনুভব করলো। ঠিক যেভাবে সে দেব এর কথাগুলো অনুভব করেছিল। কিন্তু উত্তাপ অনুভব করার পরিবর্তে সে অসাড় অনুভব করলো। তার মনে হলো, ভারতীয় দোকানে ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে সুন্দরী মাধুরী দীক্ষিতের সাথে দেব এর স্ত্রীর চেহারার মিল আছে জানতে পারার মুহূর্তেও তার এমনই অনুভূতি হয়েছিল। "আমার বাবাও তাই করেছে" রোহিন বলছে। "বাবা এমন একজনের পাশে বসেছিল, যাকে সে চিনতো না, কিন্তু দেখতে সেক্সি ছিল, এখন আমার মায়ের পরিবর্তে তাকেই ভালোবাসে।"

সে জুতা খুলে ফ্লোরে পাশাপাশি রাখলো। এরপর গলাবন্ধ পেঁচিয়ে আলমানাক হাতে মিরান্ডার বিছানায় উঠলো। মিনিটখানেক পরই বইটি তার হাত থেকে পড়ে গেল এবং সে তার চোখ বন্ধ করলো। মিরান্ডা তাকে ঘুমাতে লক্ষ করলো। নিঃশ্বাসের সাথে সাথে তার গলাবন্ধ উঠানামা করছে। দেব এর মতো সে বার মিনিট, এমনকি বিশ মিনিট পরও ঘুম থেকে উঠলো না। রূপালি ককটেল ড্রেস খুলে হাইহিল জুতা আলমারির পিছনে রেখে জিনস পরে ফিরে আসার পরও রোহিন চোখ খুললো না। মোজা খুলে ড্রয়ারে রেখে দিলো সে।

সবকিছু রেখে মিরান্ডা আবার বিছানায় বসলো। রোহিনের খুব কাছে ঝুঁকে পড়ে তার মুখের কোনায় লেগে থাকা পিঠার সাদা গুড়াগুলো লক্ষ করলো এবং আলমানাক তুলে নিলো। পৃষ্ঠা উল্টানোর সময় সে কল্পনা করলো যে, রোহিন তদের মন্ত্রিলের বাড়িতে তার বাবা মা'র মধ্যে ঝগড়া শুনে থাকবে। তার মা নিশ্চয়ই তার বাবাকে বলেছে, "সে কি সুন্দরী?" পরনে নিশ্চয়ই ছিল সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে পরার বাথ গাউন। তার সুন্দর মুখ বিষাদক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে। "সে কি সেক্সি?" তার বাবা প্রথমে একথা অস্বীকার করে প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করেছে। "আমাকে বলো।" রোহিনের মা নিশ্চয়ই মুখ ঝামটা দিয়ে আবার জানতে চেয়েছে, "সে সেক্সি কিনা আমাকে বলো।" শেষ পর্যন্ত তার বাবা স্বীকার করেছে

যে, সে সেক্সি এবং তার মা কাঁদতে শুরু করেছে বিছানায় কাপড়ের স্তূপের মধ্যে গড়াগড়ি করে। তার চোখ কোলা ব্যাঙ এর মতো ফুলে উঠেছে। "কি করে তুমি পারলে" কাঁদতে কাঁদতে প্রশ্ন করেছে, "কি করে তুমি একজন মহিলাকে ভালোবাসতে পারো, যাকে তুমি জানো না?"

মিরান্ডা দৃশ্যটি কল্পনা করার সাথে সাথে নিজেও একটু কাঁদলো। সেদিন মাপ্পারিয়ামে সবগুলো দেশই তার স্পর্শের আওতায় ছিল এবং দেব এর কণ্ঠ কাঁচের আবরণ থেকে লাফিয়ে উঠেছে। ত্রিশ ফুট দূরে সেতুর ওপার থেকে। তার কণ্ঠ কানে প্রবেশ করেছে এতো কাছে থেকে এবং এতো উষ্ণতা অনুভব করেছে যে, কয়েকদিন পর্যন্ত তার ত্বকের নিচে সে অনুভূতি ছিল। মিরিন্ডা জোরে জোরে কাঁদলো, কান্না থামাতে পারছিল না সে। রোহিন তখনো ঘুমে। সে ধারণা করলো, রোহিন হয়তো এরই মধ্যে মহিলার কান্নার শব্দে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

রোববার দেব মিরান্ডা একথা বলতে ফোন করলো যে, সে পথে। "আমি প্রায় রেডি। তোমার ওখানে দু'টায় পৌছবো।"

মিরান্ডা টেলিভিশনে রান্নার উপর একটি প্রোগ্রাম দেখছিল। এক মহিলা কতগুলো আপেল দেখিয়ে ব্যাখ্যা করছিল যে, কোনগুলো রান্নার কাজে ব্যবহারের জন্যে ভালো। "আজ তুমি এসো না।"

"কেন?"

"আমার ঠাণ্ডা লেগেছে" সে মিথ্যা বললো। অবশ্য সত্য থেকে তার কথা খুব দূরে নয়। কান্নার ফলে তার গলা বসে গেছে। "সকাল থেকেই আমি বিছানায় শুয়ে আছি।"

"তোমার কণ্ঠ বেশ ভারি হয়ে আছে।" একটু থামলো সে। "তোমার কি কোন কিছুর প্রয়োজন?"

"না, সব ঠিক আছে।"

তরল জিনিস বেশি করে পান করো।"

"দেব?"

"বলো মিরান্ডা?"

"আমরা যেদিন মাপ্পারিয়ামে গেলাম সেদিনের কথা কি তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ অবশ্যই মনে আছে", দেব ফিসফিস করে বললো।

"তোমার কি মনে আছে, তুমি কি বলেছিলে?"

খানিকক্ষণ নীরবতা। "চলো সেখানে আবার যাওয়া যাক।" শান্তভাবে সে হাসলো। "তাহলে আগামী রোববার?"

আগের দিন মিরান্ডা যখন কাঁদছিল, তখনো তার বিশ্বাস ছিল না, সে কোনকিছুই ভুলবে না। এমনকি বাংলায় তার নাম লিখলে যেমন দেখায় তাও না।

সে রোহিনের পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন তার ঘুম ভাঙ্গলো, তখন রোহিন তার বিছানার নিচে লুকিয়ে রাখা ইকনমিস্টের পৃষ্ঠায় একটি বিমানের ছবি আঁকছিল। "দেবজিৎ মিত্র কে?" ঠিকানার লেবেল দেখে সে প্রশ্ন করেছিল।

মিরান্ডা দেবকে কল্পনা করলো। ট্রাউজার ও জুতা পরা অবস্থায়, ফোনে হাসছে। এক মুহূর্ত পরই সে নিচতলায় তার স্ত্রীর সাথে যোগ দেবে এবং শরীর টান করে সংবাদপত্র পড়ার জন্যে বসতে বসতে তাকে বলে যে, সে জগিং করতে যাচ্ছে না। তার স্ত্রী ছাড়াও মিরান্ডা তাকে আকাঙ্ক্ষা করে। মিরান্ডা সিদ্ধান্ত নেয় যে, সে দেবকে আর একটি রোববার সাক্ষাৎ দেবে, হয়তো বা দু'টি। এরপর ইতোমধ্যে সে যা জেনেছে সব বলবে যে, ব্যাপারটা তার নিজের জন্যে বা তার স্ত্রীর জন্যেও ভালো নয়। কারণ উভয়েই সেরা প্রাপ্যের অধিকারী। এর মাঝে টানাহেঁচড়ার কোন বিষয় থাকতে পারে না।

কিন্তু পরবর্তী রোববার এতো তুষারপাত হলো যে, দেব তার স্ত্রীকে বলারই সুযোগ পেল না যে, সে চার্লস রোড ধরে দৌড়াতে যাচ্ছে। এর পরের রোববার তুষার গলে গেল। কিন্তু মিরান্ডা সেদিন লক্ষ্মীর সাথে সিনেমা দেখতে যাওয়ার প্রোগ্রাম করেছে। যখন সে দেবকে ফোনে কথাটা বললো তখন সে তার প্রোগ্রাম বাতিল করার জন্যে বললো না। পরের রোববার সে বেশ আগে ঘুম থেকে উঠে হাঁটতে বেরুলো। সকালটা ঠাণ্ডা, কিন্তু রৌদ্রোজ্জল। অতএব সে দীর্ঘপথ হাঁটলো। দেব যে রেস্টুরেন্টে তাকে চুমু দিয়েছিল সেটি অতিক্রম করে কমনওয়েলথ এভিনিউ পর্যন্ত গেল এবং সেখান থেকে ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স সেন্টার পর্যন্ত পুরো পথ হেঁটে গেল। মাপ্পারিয়াম তখন বন্ধ। কিন্তু কাছেই সে এক কাপ কফি কিনলো এবং গির্জার বাইরের চত্বরে একটি বেঞ্চে বসে বিশাল পিলার ও গম্বুজের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সে আরো তাকিয়ে ছিল নগরীর উপর বিস্তৃত স্বচ্ছ নীল আকাশের পানে।

মিসেস সেন

সেপ্টেম্বরে স্কুল শুরু হবার পর থেকে প্রায় এক মাস ধরে এলিয়ট মিসেস সেনের কাছে যাচ্ছে। আগের বছর তাকে দেখাশুনা করেছে অ্যাবি নামে শীর্ণকায়, মুখে রোদে দাগ পড়া মতো এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী। মেয়েটি যেসব বই পড়তো, সেগুলোর প্রচ্ছদ ছবিশূন্য এবং এলিয়টের জন্যে মাংসযুক্ত কোন খাবার তৈরি করে দিতে রাজি ছিল না সে। তার আগে মিসেস লিন্ডেন নামে এক বৃদ্ধা প্রতিদিন বিকেলে তার বাড়িতে গেলেই এলিয়ট স্বাগত জানাতো। এলিয়ট যখন একা একা খেলতো, তখন বৃদ্ধা ফ্লাস্ক থেকে ঢেলে চা পান করতো আর ক্রসওয়ার্ড খেলতো। অ্যাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভের পর আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যায়, আর মিসেস লিন্ডেনকে শেষ পর্যন্ত বাদ দেয়া হয়, যখন এলিয়টের মা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় যে, মিসেস লিন্ডেনের ফ্লাস্কে চায়ের চাইতে হুইস্কিই থাকতো বেশি। মিসেস সেনের ঠিকানা এলিয়টের বাবা মা পায় সুপার মার্কেটের বাইরে সাটানো অবস্থায়, বলপয়েন্ট কলমে স্পষ্ট অক্ষরে লিখা : "অধ্যাপকের স্ত্রী, দায়িত্বপরায়ণ এবং দয়ার্দ্রচিত্তের, আমার বাড়িতে আপনার সন্তানের দেখাশুনা করবো।" টেলিফোনে এলিয়টের মা মিসেস সেনকে বললেন যে, আগের বেবি-সিটার তাদের বাড়ি এসেছে। "এলিয়টের বয়স এগার বছর। সে নিজেই খায় এবং খেলা করে। আমি শুধু চাই যে, বাড়িতে জরুরি প্রয়োজনের কারণে একজন বয়স্ক লোক থাকুক।" কিন্তু মিসেস সেন গাড়ি চালাতে জানেন না।

"আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের বাড়ি বেশ পরিচ্ছন্ন, বাচ্চার জন্যে বেশ নিরাপদ", মিসেস সেন তাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় বলেন। ক্যাম্পাসের এক প্রান্তে ইউনিভার্সিটির অ্যাপার্টমেন্ট। অ্যাপার্টমেন্টের লবিতে আকর্ষণবিহীন টালি লাগানো। একসারি চিঠির বাক্স, প্রত্যেকটির গায়ে সাদা লেবেলে ঠিকানা লিখা। ভিতরের দিকে অ্যাপার্টমেন্ট বিভক্তকারী করিডোরের একপাশে হালকা সবুজ রং এর কার্পেটের উপর ভ্যাকুয়াম ক্লিনার রাখা। সোফা ও চেয়ারের সামনে যে কার্পেটগুলো তা একটির সাথে আরেকটি মিলে না। দেখে মনে হয় যেন, ভিন্ন ভিন্নভাবে মাদুর বিছিয়ে রাখা হয়েছে এই ধারণা করে যে, কোন ব্যক্তির পা সেখানে

পড়বে। সাদা রং এর ড্রামের আকৃতির ল্যাম্পশেড সোফার পাশে, যেগুলো এখনো প্রস্তুতকারকের প্লাস্টিকের মোড়কে ঢাকা। টেলিভিশন এবং টেলিফোন সেট হলুদ কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। একটি দীর্ঘাকৃতির ধূসর পাত্রে চা, পাশেই মগ এবং একটি ট্রেতে বাটার বিস্কুট। মি. সেন বেঁটে, মোটা এবং চোখ দু'টো সামান্য স্ফীত। কালো আয়তাকার ফ্রেমের চশমাও সেখানে রাখা। তিনি একটু নড়েচড়ে পা দু'টো আড়াআড়ি করে বসে দু'হাতে মগটি ধরে মুখের খুব কাছে ধরে রাখলেন, এমনকি যখন তিনি পান করছিলেন না তখনো একইভাবে মগটি ধরা ছিল। মি. সেন অথবা মিসেস সেন কারো পায়েই জুতা ছিল না। সামনের দরজার পাশে একটি শেলফে বেশ কয়েক জোড়া জুতা রাখা আছে, এলিয়ট তা দেখেছে। তাদের পায়ে চপ্পল। পরিচয় পর্বে মিসেস সেন বললেন, "মি. সেন ইউনিভার্সিটিতে গণিত পড়ান, যেন তাদের দু'জনের মধ্যে মোটামুটি পরিচয় আছে।

তার বয়স প্রায় ত্রিশ বছর। তার দাঁত ও তার থুতনিতে বসন্তের অস্পষ্ট দাগের মধ্যে ব্যবধান সামান্য। কিন্তু তার চোখ সুন্দর। ঘন উজ্জ্বল ভুরু এবং টলমলে চোখ তার চোখের পাতাকে স্বাভাবিকের চাইতেও প্রশস্ত করেছে। চকচকে সাদা শাড়ি পরেছেন তিনি, মাঝে মাঝে সবুজ রং এর ডিজাইন, আগস্ট মাসের হালকা বৃষ্টিময় বিকেলের চাইতে কোন সান্ধ্য অনুষ্ঠানে পরলেই যেন মানাতো ভালো। ঠোঁটে সাদা উজ্জ্বল লিপস্টিকের প্রলেপ এবং লিপস্টিকের রং নির্দিষ্ট সীমার বাইরেও সামান্য ছড়িয়ে পড়েছে।

এলিয়ট ভাবলো, তার মা এখানে হাতে চুড়ি পরা, পশমি কাপড়ের হাফপ্যান্ট ও দড়ির সোলের জুতা পরা অবস্থায় খুবই বিসদৃশ। তার মায়ের ছাঁটা চুলের সাথে হাফ প্যান্টের মিল আছে, দেখতে সে লম্বাটে, বোধসম্পন্ন এবং সেই রুমে সযত্নে আবৃত সবকিছুর মধ্যে তার লোম কামানো নগ্ন হাঁটু ও উরু খুব বেখাপ্পা লাগছে। মিসেস সেন তার দিকে বিস্কুটের প্লেট এগিয়ে দিলেও বারবার সে বিস্কুট নিতে অস্বীকার করছিল এবং একটানা প্রশ্ন করে চলছিল। উত্তরগুলো তার মা রেখাটানা প্যাডে নোট করে নিচ্ছিল। অ্যাপার্টমেন্টে কি আরো বাচ্চা থাকবে ? মিসেস সেন এর আগেও বাচ্চাদের দেখাশুনা করেছেন কি না ? এদেশে তিনি কতোদিন যাবত আছেন ? সবকিছুর উপর তাকে যে বিষয়টি ভাবাচ্ছিল তা হচ্ছে, মিসেস সেন গাড়ি চালাতে জানেন না। এলিয়টের মা পঞ্চাশ মাইল উত্তরে এক অফিসে চাকুরি করে এবং তার বাবা সম্পর্কে সবশেষ সে শুনেছে যে, দু'হাজার মাইল পশ্চিমে থাকে।

"আসলে আমি ওকে গাড়ি চালাতে শিখাচ্ছি", মি. সেন টেবিলে কফির মগ রাখতে রাখতে বললেন। তাদের আলোচনার মধ্যে এই প্রথমবার কথা বললেন তিনি। "আমার ধারণা ডিসেম্বরের মধ্যে উনি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে যাবেন।"

"ও তাই ?" এলিয়টের মা এই তথ্যও তার প্যাডে নোট করলেন।

"হ্যাঁ, আমি ড্রাইভিং শিখছি", মিসেস সেন বললেন। "কিন্তু ছাত্র হিসেবে আমি খুব মন্থর। দেশের বাড়িতে তো আমাদের ড্রাইভার আছে।"

"আপনি বলছেন, একজন শোফার, মাইনে করা ড্রাইভার।"

মিসেস সেন স্বামীর দিকে তাকালে তিনি মাথা নাড়লেন।

এলিয়টের মা রুমের চারদিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। "এবং ভারতে এসবই...।"

"হ্যাঁ", মিসেস সেন উত্তর দিলেন। তার ভিতর থেকে কিছু বের হওয়ার মত ছিল শব্দটি। বুকের উপর দিয়ে শাড়ির আড়াআড়ি পাড়ে একটি গোলাপ দৃশ্যমান। তিনি নিজেও রুমের চারপাশে চোখ ফেললেন। যেন ল্যাম্পশেড, টিপট, কার্পেট ইত্যাদি দেখছেন। "সবকিছুই আছে এখানে।"

স্কুল ছুটির পর মিসেস সেনের বাড়িতে আসতে এলিয়টের খারাপ লাগতো না। সমুদ্র সৈকতের যে ছোট্ট বাড়িটায় সে ও তার মা থাকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেটি ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে। এলিয়ট ও তার মাকে বহনযোগ্য হিটার আনতে হয় এবং এক রুম থেকে আরেক রুমে গেলে সেটিও সাথে নিতে হয়। প্লাস্টিকের শিট দিয়ে জানালাগুলো বন্ধ করতে হয় যাতে ভিতরে বাতাস না ঢুকে। সৈকত ফাঁকা এবং একা একা খেলতে বিরক্তি লাগে। একমাত্র পড়শি যারা রয়ে যায় তারা তরুণ বিবাহিত দম্পতি এবং তাদের কোন সন্তান নেই। সৈকতে ভাঙ্গা ঝিনুক কুড়ানোর মধ্যে এলিয়টের আর মজা থাকে না কিংবা সামুদ্রিক আগাছা নিয়ে টানাটানির মধ্যে, বালির মধ্যে সবুজ আগাছা পান্নার মতো চকচক করতো। মিসেস সেনের অ্যাপার্টমেন্ট উষ্ণ, কখনো কখনো অতিরিক্ত উষ্ণতায় ভরে থাকে। রেডিয়েটরে অব্যাহতভাবে প্রেসার কুকারের মতো হিসহিস শব্দ উঠে। এলিয়ট মিসেস সেনের বাড়িতে প্রথম শিখেছে যে, তাকে দরজার সামনে জুতা খুলে শেলফে মিসেস সেনের চপ্পলের পাশে রাখতে হবে। তার চপ্পলগুলো বিভিন্ন রং এর, সোলগুলো চ্যাপ্টা এবং তার পায়ের বুড়ো আঙুল ধারণ করার জন্যে চামড়া গোলাকৃতি করে লাগানো।

মিসেস সেনকে লিভিংরুমের ফ্লোরে সংবাদপত্র বিছিয়ে বসে তরিতরকারি কাটাকুটি করতে দেখা এলিয়টের কাছে খুব উপভোগ্য ছিল। ছুরির বদলে তিনি ব্যবহার করতেন দূর সমুদ্রে যাত্রার জন্য প্রস্তুত জলদস্যুদের জাহাজের অগ্রভাগের মতো বাঁকানো একটি ফলা (বটি)। সেই ফলার এক প্রান্ত আটকানো হয় একটি কাঠের সাথে। ফলা যে ইস্পাতে তৈরি সেটি কালো নয়, বরং রূপালি এবং সর্বত্র এক ধরনের রং নয় এবং একটি খাঁজকাটা অগ্রভাগ, কোনকিছু আঁচড়ে তোলার জন্যে। প্রতিদিন বিকেলে মিসেস সেন ফলাটি তুলে জায়গামতো স্থাপন করেন। ধারাল অংশ তার মুখোমুখি থাকলে তাকে সে অংশ স্পর্শ করতে হয় না। তিনি কোন সবজির পুরোটা হতে তুলে নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কাটেন। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মিষ্টিকুমড়ো। প্রথমে তিনি সবজি দ্বিখণ্ডিত করেন, এরপর চারখণ্ডে। দ্রুততার সাথে তিনি বিভিন্ন আকৃতিতে সবজি কাটেন, টুকরো টুকরো করেন। সেকেন্ডের

মধ্যে তিনি আলু ছিলে ফেলতে পারেন। কখনো তিনি পা আড়াআড়ি করে বসেন, কখনো পা ছড়িয়ে। তার চারপাশে ছড়ানো থাকে চালনি, অল্প পানিসহ গামলা, যাতে তিনি সবজির কাটা টুকরো ধুয়ে নেন।

কাজ করার সময় তার এক চোখ থাকে টেলিভিশনের দিকে, আরেক চোখ এলিয়টের উপর। কিন্তু কখনো ধারাল বটির ফলার উপর তার চোখ থাকে বলে মনে হয় না। তবু তিনি এলিয়টকে চারপাশে হাঁটাহাঁটি করার অনুমতি দেন না। "চুপ করে বসে থাকো, আমার আর মাত্র দু'মিনিট লাগবে" সোফা দেখিয়ে তিনি বলেন। তার সোফা সবসময় পিঠে পালকিশোভিত হাতির সারির ছাপসহ সবুজ ও কালো রং এর বেডকভার দিয়ে ঢাকা থাকে। তার দৈনন্দিন কাজে ঘন্টাখানেক ব্যয় হয়। এলিয়টকে ব্যস্ত রাখার জন্যে তাকে কখনো সংবাদপত্রের কমিক দেন, পিনাট বাটারে মাখা বিস্কুট, বটি দিয়ে কাটা গাজরের টুকরা খেতে দেন। সম্ভব হলে তিনি জায়গাটি দড়ি দিয়ে ঘিরে নিতেন। একদিন তিনি অতিরিক্ত জিনিসের প্রয়োজনে নিজেই নিজের নিয়ম ভাঙ্গেন এবং তার চারপাশের বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্য থেকে না উঠে এলিয়টকে বলেন, "ফ্রিজের পাশে কেবিনেটের উপর একটি প্লাস্টিকের গামলা আছে, এই সবজিগুলো রাখার মতো যথেষ্ট বড়ো, তুমি কিছু মনে না করলে, আমাকে এনে দাও। খুব সাবধানে লক্ষ্মী ছেলে, সাবধানে", এলিয়ট এগিয়ে গেলে তিনি উচ্চারণ করেন। "তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, কফি টেবিলটার উপরে রেখে দাও, আমি যাতে নাগালের মধ্যে পাই।"

তিনি বটিটি এনেছেন ভারত থেকে, যেখানে দৃশ্যত প্রত্যেক বাড়িতেই অন্তত একটি করে বটি আছে। "যখনই বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়" তিনি একদিন এলিয়টকে বলছিলেন "অথবা বড় ধরনের কোন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় তখন আমার মা সব পড়শি মহিলাদের কাছে খবর পাঠান এই বটিটার মতো তাদের বটিগুলো আনতে। তারা সকলে বাড়ির ছাদে বিরাট বৃত্তাকারে বসে হাসিঠাট্টা গল্পগুজব করতে করতে পঞ্চাশ কিলোগ্রাম সবজি কেটে ফেলে রাতের বেলায়।" তার বিবরণ চলতে থাকে কাজের সাথে সাথে। শশা, বেগুন, পিঁয়াজের খোসার স্তূপ তার চারপাশে। "ওই রাতগুলোতে ঘুমানো অসম্ভব হয়ে পড়ে, সবার বকবকানিতে।" তিনি জানালা দিয়ে পাইন গাছের দিকে তাকান। "সেনবাবু আমাকে এমন এক জায়গায় এনেছেন যে, এতো নীরবতার কারণে মাঝে মাঝে আমি ঘুমাতেই পারি না।"

আরেকদিন হয়তো তিনি মুরগির মাংস থেকে চর্বি ছাড়াতে বসেন। রান, থান আলাদা করে কাটেন। হাড্ডি কাটার সময় তার কবজিতে সোনার চুড়ি বেজে উঠে, তার বাহু উজ্জ্বল হয়ে উঠে। তার নিশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। এক পর্যায়ে তিনি থামেন, দু'হাতে মুরগি আঁকড়ে ধরে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকান। চর্বি ও মাংসের ছোট টুকরা তার হাতে লেগে থাকে।

"এলিয়ট, আমি যদি এখন উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করতে থাকি তাহলে কি এগিয়ে আসবে?"

"কি হয়েছে, মিসেস সেন ?"

"না, কিছু না। আমি শুধু জানতে চাচ্ছি যে, কেউ আসবে কি না।"

এলিয়ট কাঁধ ঝাঁকালো, "আসতে পারে।"

আমাদের বাড়িতে তোমাকে তাই করতে হবে। কারণ সবার টেলিফোন নেই। তুমি একটু জোরে আওয়াজ দাও, দুঃখ বা আনন্দের প্রকাশ ঘটাও, তাহলে একটি পুরো পাড়া এবং আরেক পাড়ার অর্ধেক লোক চলে আসবে খবর জানতে অথবা কোন আয়োজনে সাহায্য করতে।" ইতোমধ্যে এলিয়ট বুঝে ফেলেছে যে, মিসেস সেন যখন বাড়ির কথা বলেন তখন ভারতের কথা বুঝান, যেখানে বসে সবজি কাটছেন সেই অ্যাপার্টমেন্টের কথা বুঝান না। এলিয়ট পাঁচ মাইল দূরে তার নিজের বাড়ির কথা এবং নববিবাহিতা দম্পতির কথা ভাবে, যারা সূর্যাস্তের সময় সৈকতে জগিং করার সময় মাঝে মাঝে তাকে দেখে হাত নাড়ে। শ্রমিক দিবসে তারা একটি পার্টির আয়োজন করেছিল। প্রচুর লোক জড়ো হয়েছিল, তারা খাচ্ছিল, পান করছিল। তাদের হাসির উচ্চ শব্দ সাগরের ঢেউ এর ক্লান্তির শব্দ ছাড়িয়ে উঠছিল। এলিয়ট ও তার মাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। সেদিনটি ছিল তার মায়ের ছুটির দুর্লভ দিন। কিন্তু তারা বাইরে কোথাও যায়নি। তার মা সেদিন কাপড়চোপড় ধোয়, হিসাব মিলায় এবং এলিয়টের সাহায্যে গাড়ির ভিতরটা পরিষ্কার করে। এলিয়ট মাকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, কয়েক মাইল দূরে গিয়ে কার ওয়াশ করিয়ে আনতে, যা তারা মাঝেমধ্যেই করে, তাহলে তারা গাড়ির মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে পারে নিরাপদে এবং শুকনো অবস্থায়। সাবান এবং পানির প্রবল ধারার মধ্যে ক্যানভাসের ঝাড়ু উইন্ডশিল্ডে আঘাত করে। কিন্তু তার মা বলে যে, সে খুব ক্লান্ত এবং একটি পাইপ দিয়ে নিজেই গাড়িটা পরিষ্কার করে। সন্ধ্যায় যখন প্রতিবেশীদের আমন্ত্রিত অতিথিরা কাঠের ডেকের উপর নাচতে শুরু করে তখন তার মা ডাইরেক্টরি থেকে তাদের ফোন নম্বরটা খুঁজে বের করে ফোনে তাদেরকে জানায় হট্টগোল একটু কমাতে।

"তারা তোমাকে ফোন করতে পারে" এলিয়ট এক পর্যায়ে মিসেস সেনকে বললো। "কিন্তু তারা অভিযোগও করতে পারে যে, তুমি খুব বেশি শোরগোল করছো।"

এলিয়ট সোফার যে স্থানটিতে বসে সেখান থেকে তার নাকে মশল্লার গন্ধ আসে এবং সে তার মাথার মাঝ বরাবর সিঁথি ও চুলের খোপা দেখতে পায়। সিঁথিতে সিদুর লাগানোর ফলে তা জ্বলজ্বল করে। প্রথমে এলিয়ট ভয় পেয়েছিল যে, মিসেস সেনের মাথা কেটেছে কিনা, অথবা কোন কিছু তার কপালে কামড়ে দিয়েছে কিনা। কিন্তু একদিন সে দেখতে পায় যে মিসেস সেন বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বুড়ো আঙুলে সিঁদুর লাগিয়ে সিঁথিতে লাগাচ্ছেন। ছোট্ট জ্যামের কৌটায় সিঁদুর রাখা। লাগানোর সময় সামান্য গুড়ো তার নাকের উপর পড়ে, যখন তিনি বুড়ো আঙুলে খানিকটা সিঁদুর নিয়ে দুই ভুরুর

মাঝে লাগাচ্ছিলেন। এলিয়ট যখন জানতে চেয়েছিল যে, এটা কি কারণে লাগানো হয়, তখন মিসেস সেন ব্যাখ্যা করেছিলেন, "আমাকে অবশ্যই প্রতিদিন এই গুড়ো লাগাতে হবে। যতোদিন আমি বিবাহিতা আছি, ততোদিনই লাগাতে হবে।"

"তাহলে তুমি বুঝাতে চাও যে, ঠিক বিয়ের আংটির মতো এটা।"

"ঠিক বলেছো, এলিয়ট। বিয়ের আংটির মতো। পানিতে হাত ধোওয়ার সময় এটি হারানোর ভয় নেই।"

বিকেল ছয়টা বিশ মিনিটের মধ্যে এলিয়টের মা আসার আগেই মিসেস সেন তার সবজি কাটাকুটির সব আলামত সরিয়ে ফেলেন। বটি পরিষ্কার করে ধুয়ে, শুকিয়ে খুলে রেখে দেন একটি টুলে দাঁড়িয়ে কাপবোর্ডে। এলিয়টের সাথে সব সবজির খোসা, বীজ ও ছাল একটি সংবাদপত্রে ভাঁজ করে রাখেন। বাসনকোসন, চালনি সার বেঁধে কাউন্টারে রাখেন। মশল্লা পরিমাপ মত নিয়ে মিশ্রিত করেন এবং এক পর্যায়ে স্টোভের সবুজাভ আলোর উপর রাখা পাতিলে তার রান্না শুরু করেন। তার অ্যাপার্টমেন্টে কখনো বিশেষ উপলক্ষ থাকে না, অথবা তিনি কখনো কোন অতিথিকে আশাও করেন না। শুধু নিজের ও মি. সেনের জন্যে রাঁধেন। লিভিংরুমের এক পাশে বর্গাকৃতির টেবিলে দু'টি প্লেট ও দু'টি গ্লাস রাখা থাকে। ন্যাপকিন, চামচ, ছুরি-কাঁটাচামচ কিছুই থাকে না। আবর্জনা রাখার ক্যানে মোড়ানো সংবাদপত্র ঢেলে রাখার সময় এলিয়ট অনুভব করে যে সে এবং মিসেস সেনকে বলা হয়নি এমন কিছু নিয়ম লংঘন করছে। সম্ভবত সবকাজে মিসেস সেনের তাড়াহুড়োর কারণে এমনটি হচ্ছে : আঙুল দিয়ে লবণ ও চিনি তুলছেন, ডাল ধুচ্ছেন পানির ট্যাপের নিচে, স্পঞ্জ দিয়ে সবকিছুর উপরিভাগ মুছছেন, কাপবোর্ডের দরজা বন্ধ করছেন খটাং খটাং শব্দ তুলে। এসবের মাঝে হঠাৎ করে মাকে দেখে এলিয়টের খারাপ লাগে। স্বচ্ছ মোজা এবং সংক্ষিপ্ত পোশাকে সে কাজে যায়। মিসেস সেনের অ্যাপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্থানে উঁকি মারে। প্রথমে এসেই সে দরজার অদূরে দাঁড়িয়ে এলিয়টকে ডেকে তার জুতা পরে ওর জিনিস গুছিয়ে নিতে বলে। কিন্তু মিসেস সেন তা পছন্দ করেন না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি এলিয়টের মাকে পীড়াপীড়ি করেন ভিতরে এসে সোফায় বসতে। তাকে কিছু না কিছু খেতে দেন : গোলাপি রং এর দধি, পায়েস অথবা সুজির হালুয়া।

"মিসেস সেন, আমি সত্যি সত্যি দেরিতে লাঞ্চ করি। আপনাকে এতোটা ঝামেলা করতে হবে না।"

"না, না ঝামেলার কিছু নেই। এলিয়টের মতো একটু নিন। কোন ঝামেলা নেই।"

তার মা মিসেস সেনের তৈরি খাবার একটু করে মুখে তুলে। তার দৃষ্টি উপরের দিকে, যেন কোন মতামত খুঁজছে। তার হাঁটু একসাথে চেপে রাখা।

হাইহিল জুতা সে কখনো খুলে না, যা সবুজ কার্পেটে প্রায় গেঁথে যায়। "খুবই সুস্বাদু খাবার" দু'একটা কামড় দিয়ে প্লেট রাখতে রাখতে বলে। এলিয়ট জানে যে, তার মা খাবারগুলো পছন্দ করেনি, কারণ গাড়িতে একবার তাকে তাই বলেছিল। সে এটাও জানে যে, তার মা অফিসে লাঞ্চ করে না। কারণ বাড়িতে ফিরেই প্রথমে তার মা এক গ্লাস মদ, একটি রুটি ও পনির নিয়ে বসে। এর ফলে কখনো এমনও হয় যে, রাতের জন্যে যে পিজজার অর্ডার দেয়া হয় সেটি খাওয়ার মতো ক্ষুধা আর থাকে না। এলিয়ট খায় আর তার মা টেবিলের পাশে তার সাথে বসে থাকে এবং আরো মদ পান করে। তাকে জিজ্ঞাসা করে, দিনটি কেমন কাটলো। কিন্তু একসময় তার মা ডেকে গিয়ে সিগারেট ধরায়। এলিয়টের উপর দায়িত্ব থাকে অবশিষ্ট খাবার পেঁচিয়ে রাখার।

প্রতিদিন বিকেলে প্রধান সড়কের পাশে পাইনের ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন মিসেস সেন, যেখানে স্কুল বাস থেকে আশেপাশেই থাকে, এমন আরো কয়েকটি ছেলের সাথে নামে এলিয়ট। সবসময় এলিয়টের মনে হয় যে, মিসেস সেন বেশখানিক সময় ধরে অপেক্ষা করছেন, যেন তিনি আগ্রহের সাথে একজনকে শুভেচ্ছা জানাতে আগ্রহী, যাকে বেশ কয়েক বছর যাবত দেখেননি। তার মাথার চুল মৃদু বাতাসে উড়তে থাকে, সিঁথিতে সিঁদুর স্পষ্ট। তার চোখে নেভি ব্লু সানগ্লাস, তার মুখের তুলনায় একটু বড়। তার শাড়ি এক এক দিন ভিন্ন ভিন্ন প্যাটার্নের। সব ঋতুতে পরার মতো একটি কোট শাড়ির উপর চাপানো থাকে। ওক গাছের ফল ও খাঁজকাটা আবরণের অ্যাসফল্ট প্রাচীরসমৃদ্ধ প্রায় এক ডজন ইটের দালান মিলে ক্যাম্পানের অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সটি গড়ে উঠেছে। সবক'টি দেখতে একই রকম। কাঠের গুড়ি দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করা হয়েছে। বাস স্টপেজ থেকে হেঁটে ফেরার সময় মিসেস সেন তার পকেট থেকে একটি স্যান্ডউইচ বের করেন এবং ছিলে রাখা কমলার কোষ দেন অথবা কখনো অল্প লবণ মাখানো চিনাবাদাম খেতে দেন। তারা সোজা গাড়ির দিকে অগ্রসর হন এবং বিশ মিনিটের জন্যে মিসেস সেন গাড়ি চালানো প্রাকটিস করেন। টফি রং এর সেডান কার এবং চকচকে কাপড়ে মোড়া আসন। গাড়িতে ধাতব বোতামযুক্ত রেডিও। পিছনের আসনের উপরে ন্যাপকিনের একটি বক্স ও আইস স্ক্র্যাপার। মিসেস সেন এলিয়টকে বলেন যে, অ্যাপার্টমেন্টে তাকে একা রেখে যাওয়া তিনি সঠিক মনে করেন না। কিন্তু এলিয়ট জানে যে, মিসেস সেন চায় যে, সে গাড়িতে তার পাশেই বসে থাকুক, কারণ ড্রাইভিং করতে তিনি ভয় পান। গাড়ি স্টার্ট দেয়ার সাথেই যে শব্দ উঠে তাতে তিনি ভীত এবং গাড়ির ইঞ্জিন একটু সচল করতে তার চপ্পল পরা পায়ে অ্যাকসিলেটরে চাপ দিলে যে শব্দ উত্থিত হয় সে শব্দ থেকে বাঁচতে তিনি দু'হাত দিয়ে কান ঢেকে রাখেন।

"সেনবাবু বলেন যে, একবার লাইসেন্স পেয়ে গেলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। তোমার কি ধারণা এলিয়ট ? সব কি ঠিক হবে ?"

"আপনি এখানে সেখানে যেতে পারেন" এলিয়ট পরামর্শ দেয়। "যে কোন জায়গায় যেতে পারেন আপনি।"

"আমি কি কলকাতা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবো ? এলিয়ট, তাহলে কতদিন লাগতে পারে ? ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে দশ হাজার মাইল যেতে কদ্দিন লাগবে ?"

এলিয়ট অংকটা মনে মনে করতে পারে না। সে লক্ষ করে মিসেস সেন ড্রাইভিং সিট, রিয়'র ভিউ মিরর এডজাস্ট করেন। সানগ্লাস তুলে মাথার উপর রাখেন। যেখানে সিম্ফোনি বাজানো হচ্ছে, এমন একটি রেডিও স্টেশন স্থির করেন। "এটা কি বিটোফেনের মিউজিক ?" একদিন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, গীতিকারের নামের প্রথমাংশ 'বে' এর বদলে 'বি' অর্থাৎ মৌমাছি উচ্চারণ করে। তিনি তার পাশের জানালা নামিয়ে রাখেন এবং এলিয়টকেও তা করতে বলেন। এক সময় তিনি ব্রেক প্যাডেলে চাপ দিয়ে অটোগিয়ার শিফট করেন খুব সতর্কতার সাথে, যেন গিয়ারের হ্যান্ডেলটি ছিদ্রযুক্ত একটি কলম, যা দিয়ে কালি বের হওয়ার ভয় আছে। এরপর আরো সাবধানে একটু একটু করে পিছিয়ে গাড়িকে পার্কিং স্পেসের বাইরে আনেন। তিনি অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের চারপাশের রাস্তায় একবার চক্কর কাটেন, এরপর আরেকবার।

"আমি কেমন চালাচ্ছি এলিয়ট ? পাস করবো তো ?"

মাঝে মাঝেই তিনি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন। কোন সংকেত না দিয়েই গাড়ি থামিয়ে ফেলেন রেডিওতে কিছু শোনার জন্যে অথবা কোন কিছু দেখার জন্যে। রাস্তায় কিছু হলেই হলো, তিনি গাড়ি থামান। কোন লোককে অতিক্রম করার সময় তিনি হাত নাড়েন। গাড়ির বিশ ফুট সামনে কোন পাখি দেখলে তিনি তর্জনী দিয়ে গাড়ির হর্ণ চেপে ধরেন এবং পাখিটির উড়ে যাওয়ার অপেক্ষা করেন। তিনি বলেছেন, ভারতে ড্রাইভার বসে ডান দিকে, বামে নয়। ধীরে ধীরে তারা অতিক্রম করে দোলনার জায়গা, লন্ড্রি বিল্ডিং, গাঢ় সবুজ ডাস্টবিন, পার্ক করা গাড়ির দু'টি সারি। প্রতিবার তারা যখন পাইনের ঝোপের কাছাকাছি হয়, যেখানে অ্যাসফল্টের প্রাচীর প্রধান সড়কের সঙ্গে মিশেছে, তখন মিসেস সেন তার শরীরের পুরো ওজন ব্রেকের উপর রাখেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ রাস্তাটি সরু; রাস্তার পাশে হলুদ রং দেয়া এবং একটি লেন নির্দেশ করা হয়েছে অন্যদিকে মোড় নেয়ার জন্যে।

"এলিয়ট, অসম্ভব ব্যাপার। আমি কি করে ওখানে যাবো ?"

"কেউ না আসা পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।"

"কেউ গাড়ির গতি মন্থর করবে না কেন ?"

"এখন কেউ আসছে না।"

"কিন্তু ডানদিক থেকে যে গাড়ি আসছে, ওটা কি করবে ? তুমি কি দেখতে পাচ্ছো ? গাড়ির পিছনে একটি ট্রাকও আছে। যা হোক, মি. সেন ছাড়া মেইন রোডে যাওয়ার অনুমতি নেই আমার।"

"আপনাকে গাড়ি ঘুরিয়ে দ্রুত গাড়ি চালাতে হবে", এলিয়ট বললো। ওর মাও তাই করে। অতএব খুব চিন্তাভাবনা না করেই সে বলে। ওর মায়ের সাথে যখন সন্ধ্যায় তাদের সৈকতের বাড়িতে ফিরে আসে তখন গাড়ি চালানো খুব সহজ মনে হয়। তখন তার কাছে রাস্তা বলতে শুধু একটি রাস্তা। অন্যান্য গাড়ি শুধুমাত্র দৃশ্যের অংশ। কিন্তু হেমন্তের সূর্যের নিচে গাছের সারির মাঝ দিয়ে যখন সে মিসেস সেনের সাথে গাড়িতে বসে যায়, তখন লক্ষ করে একই গাড়ির স্রোত মিসেস সেনের আঙুলের গাঁটকে বিবর্ণ করে ফেলছে, তার কবজি কাঁপছে এবং তার ইংরেজি এলেমেলো হয়ে যাচ্ছে। "প্রত্যেকে, এই লোকগুলো, নিজ নিজ জগতে বেশি ব্যস্ত।"

এলিয়ট বুঝে ফেলেছিল যে, দু'টি বিষয় মিসেস সেনকে অত্যন্ত সুখী করে তোলে। একটি হচ্ছে, তার পরিবারের পক্ষ থেকে চিঠি পাওয়া। তার নিয়ম ছিল ড্রাইভিং প্র্যাকটিস শেষ করে চিঠির বাক্স খোলা। তিনি বাক্সের তালা খুলে এলিয়টকে বলবেন, বাক্সে হাত দিতে এবং বলেও দেবেন যে কি দেখতে হবে। এরপর তিনি চোখ বন্ধ করে দু'হাত চোখের উপর রাখবেন। এলিয়ট মি. সেনের নামে আসা বিল ও ম্যাগাজিনগুলো হাতড়াবে। প্রথম দিকে সে মিসেস সেনের উদ্বেগের কারণকে অর্থহীন বলে বিবেচনা করতো। শহরে তার মায়ের একটি পোস্ট বক্স আছে, যেখান থেকে তার মা এতো অনিয়মিতভাবে ডাক সংগ্রহ করে যে, একবার যথাসময়ে বিল পরিশোধ না করায় তিনদিন তাদের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল। একটি নীল রং এর এরোগ্রাম পেতে মিসেস সেনের কয়েক সপ্তাহ কেটে যায়। স্পর্শে খসখসে এবং তার উপর কিছু ডাকটিকিট লাগানো, যাতে একটি টাকমাথা লোকের চরকা কাটার ছবি এবং পোস্ট অফিসের সিলমোহরের কালির ছোপ। "মিসেস সেন, এটাই কি আপনার কাঙ্ক্ষিত চিঠি ?"

প্রথমবার তিনি এলিয়টকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তার মুখ শাড়িতে ঢাকা পড়েছিল এবং এলিয়ট তার শাড়ির নেপথলিনের গন্ধ টের পায়। তিনি প্রায় ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে নিয়েছিলেন। অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করেই মিসেস সেন তার চপ্পল পা থেকে ছুঁড়ে ফেলেন, চুল থেকে একটি ক্লিপ খুলে এরোগ্রামের উপরিভাগ এবং দুই পাশে তিনটি টান দেন। চিঠি পড়ার সময় তার দৃষ্টি সামনে পিছনে আনাগোনা করে। পড়া শেষ হওয়ামাত্র তিনি টেলিফোনের এমব্রয়ডারি করা কভার একপাশে সরিয়ে ডায়াল ঘুরান এবং বলেন, "মি. সেন কি ওখানে আছেন ? আমি মিসেস সেন বলছি। খুব জরুরি প্রয়োজন তাকে।"

এরপর তিনি তার নিজের ভাষায় দ্রুত কথা বলেন, যা এলিয়টের কানে হৈচৈ এর মতো মনে হয়। তার কাছে এটা স্পষ্ট যে, তিনি চিঠির বিষয়বস্তু অক্ষরে অক্ষরে পাঠ করে শোনাচ্ছেন। পড়ার সময় তার কণ্ঠ উঁচুতে উঠছিল এবং মনে হচ্ছিল কণ্ঠ উঠানামা করছে। যদিও তিনি এলিয়টের সামনে সাদামাটা দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু এলিয়টের এমন বোধ হয়েছে যে মিসেস সেন সবুজ রং এর কার্পেটটির উপর আর নেই।

সহসা ঘরটিকে ছোট মনে হলো, যেন মিসেস সেনকে ধারণ করতে পারবে না। তারা প্রধান সড়ক অতিক্রম করে ইউনিভার্সিটির চতুষ্কোণ এলাকায় যাওয়ার সংক্ষিপ্ত দূরত্বটুকু হেঁটেই গেল, যেখানে পাথর নির্মিত একটি টাওয়ারে প্রতি ঘণ্টায় বেলগুলো বেজে উঠে। তারা ছাত্র সংসদ ভবনে ঘুরলো, ক্যাফেটেরিয়ায় এক প্রান্তে গিয়ে বসলো খাবার ট্রে নিয়ে এবং কার্ডবোর্ডের ঠোঙ্গায় দেয়া ফেঞ্চ ফ্রাই খেলো। একটি গোল টেবিলে তাদের সাথে কিছু ছাত্রছাত্রীও বসে গল্পগুজব করছিল। এলিয়ট একটি কাগজের গ্লাসে কোক পান করলো। মিসেস সেন তার কাপে চিনি ও গুড়ো দুধের মধ্যে চা এর ব্যাগ নাড়ছিলেন। খাওয়া শেষ করে তারা কলা ভবনে ঘুরলো, ভাস্কর্য এবং রেশমি পর্দা দেখলো। শীতল করিডোর ভিজা রং ও কাদামাটির গন্ধে ভারি হয়ে ছিল। গণিত ভবনের পাশ দিয়ে তারা হেঁটে গেল, যেখানে মি. সেন ক্লাস নেন।

কোলাহলপূর্ণ ক্লোরিনের গন্ধযুক্ত ক্রীড়া ভবনে গিয়ে তারা থামলো, যে ভবনের চার তলার প্রশস্ত একটি জানালা দিয়ে তারা দেখলো নীলকান্ত মণির মতো উজ্জ্বল সুইমিং পুলে সাতারুরা এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যাচ্ছে। মিসেস সেন পার্স থেকে ভারত হতে আসা এরোগ্রামটি বের করে সামনে এবং পিছনে লিখা ঠিকানা দেখলেন, এরপর ভাঁজ খুলে আবার চিঠিটা পড়লেন। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছিল তার। পড়া শেষ হলে বেশ খানিকক্ষণ সাতারুদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"আমার বোনের একটি মেয়ে হয়েছে। সেনবাবু ছুটি পেলে যখন তাকে দেখবো, তখন তার বয়স তিন বছর হয়ে যাবে। তার কাছে নিজের মাসিও অচেনা হয়ে যাবে। আমরা যদি কোন ট্রেনে পাশাপাশিও বসি তাহলে সে আমাকে চিনবে না।" চিঠি ব্যাগে রেখে এলিয়টের মাথায় একটি হাত রাখলেন। "এলিয়ট, আজকের বিকেলে এই যে তুমি আমার সাথে আছো, তুমি কি মায়ের অনুপস্থিতি অনুভব করছো ?"

এলিয়টের মাথায় এ ধরনের চিন্তা কখনো প্রবেশ করেনি। "নিশ্চয়ই তুমি তার অনুপস্থিতি অনুভব করছো। আমি যখন তোমার কথা ভাবি, ছোট্ট একটি ছেলে তুমি, কিন্তু দিনের এতোটা অংশ মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। ভাবতে আমারই লজ্জা লাগে।"

"রাতে তার সাথে আমার দেখা হয়।"

"আমি যখন তোমার বয়সী ছিলাম, তখন জানতাম না যে, আমাকে এতো দূরে চলে আসতে হবে। একদিক থেকে তুমি আমার চাইতে অভিজ্ঞ। ভবিষ্যতে তোমাকে যে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে ইতোমধ্যে সে অভিজ্ঞতা তোমার হচ্ছে।"

অপর যে বিষয়টি মিসেস সেনকে খুশি করতো, তা হচ্ছে সমুদ্র তীর থেকে পাওয়া তাজা মাছ। পুরো মাছটাই চাইতেন তিনি, শামুকের মতো খোলসযুক্ত কোন মাছ নয় অথবা কাটা ছাড়ানো মাছ নয়, যা কয়েক মাস আগে এক রাতে এলিয়টের মা এক লোককে আমন্ত্রণ জানিয়ে আগুনে ঝলসে তৈরি করেছিল—লোকটি সেই রাতে তার মায়ের বেডরুমে কাটিয়েছে। কিন্তু এলিয়ট তাকে আর কখনো দেখেনি। এক সন্ধ্যায় এলিয়টের মা তাকে নিতে এলে মিসেস সেন তাকে টুনা মাছ দিয়ে তৈরি চপ খেতে দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে, এ ধরনের চপ আসলে যে মাছ দিয়ে বানানো হয় তার নাম ভেটকি। "ব্যাপারটা খুবই হতাশাব্যঞ্জক" মিসেস সেন ক্ষমা চাওয়ার সময় কথার উপর জোর দিলেন। "সমুদ্রের এতো কাছে থাকা সত্ত্বেও ভালো মাছ পাই না।" গ্রীষ্মে তিনি বলেছিলেন যে, সমুদ্র সৈকতের কাছে একটি মার্কেটে যেতে তিনি পছন্দ করেন। সাথে একথাও বলেন যে, অবশ্য সেখানেও যে মাছ পাওয়া যায়, তার কোনটারই স্বাদ ভারতের মাছের মতো নয়। তবু মাছগুলো তাজা। কিন্তু এখন ঠাণ্ডা পড়ছে, জেলে নৌকাগুলো নিয়মিত মাছ ধরতে যায় না এবং কখনো এমনও হয় যে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত আস্ত কোন মাছই পাওয়া যায় না।

এলিয়টের মা পরামর্শ দেয়, "সুপার মার্কেটে চেষ্টা করে দেখুন।"

মিসেস সেন মাথা নাড়েন। "সুপার মার্কেটে বত্রিশটি কৌটার একটি দিয়েই একটি বিড়ালকে বত্রিশ রাত্রি ধরে খাওয়াতে পারি, কিন্তু আমার পছন্দের মাছ একটিও পাইনি, একটিও না।" মিসেস সেন তাকে বলেন যে, তিনি দিনে দু'বেলা মাছ খেয়ে বড় হয়েছেন। সাথে যোগ করেন যে, কলকাতার লোকজন সকালে প্রথমে মাছ খায় এবং রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে শেষ যে জিনিসটি খায় সেটি হলো মাছ। ভাগ্য ভালো থাকলে স্কুল থেকে ফিরে বিকেলেও মাছ জুটতো। তারা মাছের লেজ, ডিম এমনকি মাথাও খায়। যে কোন বাজারে, যে কোন সময়ে, ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মাছ পাওয়া যায়। "তোমাকে শুধু বাড়ি থেকে বের হয়ে সামান্য হেটে বাজার পর্যন্ত যেতে হবে, ব্যস।"

ক'দিন পরপরই মিসেস সেন টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুলে দাগ দিয়ে রাখা একটি নম্বরে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের কাছে আস্ত মাছ আছে কি না। যদি থাকে তাহলে তিনি রেখে দিতে বলেন, "সেনের নামে, হ্যাঁ 'এস' স্যামের প্রথমে যেমন আছে এবং 'এন' যেমন নিউইয়র্ক। মি. সেন গিয়ে মাছটি

আনবেন।" এরপর তিনি মি. সেনকে ফোন করেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মি. সেনের আগমন ঘটে এবং তিনি এলিয়টের মাথায় হাত দিয়ে আদর করেন, কিন্তু মিসেস সেনকে চুমু দেন না। টেবিলে রাখা তার চিঠিগুলো পড়েন এবং বেরিয়ে যাওয়ার আগে এক কাপ চা পান করেন। আধ ঘণ্টা পর তিনি ফিরে আসেন চিংড়ি মাছের হাসি হাসি মুখের ছবি মুদ্রিত একটি কাগজের ব্যাগ নিয়ে এবং ব্যাগটি তুলে দেন মিসেস সেনের হাতে এবং ইউনিভার্সিটিতে চলে যান তার সান্ধ্য ক্লাস নিতে। একদিন মিসেস সেনকে ব্যাগ দিয়ে তিনি বললেন, "কিছু দিন আর মাছ নয়, ফ্রিজে রাখা মুরগি রান্না করো। আমাকে অফিসের সময় ঠিক রাখা প্রয়োজন।"

পরবর্তী কিছু দিন মাছের দোকানে ফোন করার পরিবর্তে মিসেস সেন সিঙ্কে মুরগির রান ভিজিয়ে রেখে তার বটি দিয়ে কাটলেন। একদিন তিনি টিনজাত সার্ডিন মাছের তরকারি রান্না করলেন সবুজ বরবটি দিয়ে। কিন্তু পরের সপ্তাহে মাছের দোকানের লোকটি তাকে ফোন করে জানালো যে, তিনি মাছ কিনতে চান বলে তার ধারণা এবং তার নামে দিনের শেষ সময় পর্যন্ত সে তার জন্যে মাছ রেখে দেবে। মিসেস সেন বিগলিত হলেন। "লোকটি কি চমৎকার, তাই না এলিয়ট ? সে বললো যে, আমার নাম টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পেয়েছে। সে আরো বললো, ডাইরেক্টরিতে মাত্র একজন সেনই আছে। তুমি জানো, কলকাতার টেলিফোন ফোন ডাইরেক্টরিতে কতগুলো সেন আছে ?"

তিনি এলিয়টকে তার জুতা ও জ্যাকেট পরতে বলে ইউনিভার্সিটিতে মি. সেনকে ফোন করেন। এলিয়ট জুতা পরে অপেক্ষা করছিল যে মিসেস সেন এসে চপ্পলের সারি থেকে একটি বাছাই করবেন। কয়েক মিনিট হয়ে গেলে সে তার নাম ধরে ডাকলো। মিসেস সেনের সাড়া না পেয়ে সে জুতার ফিতা খুলে লিভিংরুমে ফিরে এলো এবং দেখলো যে, মিসেস সেন সোফায় বসে কাঁদছেন। তিনি মুখ ঢেকে রেখেছেন দু'হাতে এবং আঙুল দিয়ে অশ্রু ঝরছে। এ অবস্থায় তিনি বিড়বিড় করে বললেন যে, মি. সেনকে একটি মিটিং এ যেতে হবে। ধীরে ধীরে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ফোনের উপর কভার ছড়িয়ে দিলেন। এলিয়ট তাকে অনুসরণ করলো। প্রথমবারের মতো সে জুতা পায়ে সবুজ কার্পেটের উপর দিয়ে গেল। তিনি তার দিকে তাকালেন। তার চোখের নিচের পাতা ফুলে হালকা গোলাপি রং ধারণ করেছে। তিনি বললেন, "এলিয়ট, আমাকে বলো তো, তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা কি বাড়াবাড়ি ?"

সে উত্তর দেয়ার আগেই তিনি এলিয়টের হাত ধরে তাকে বেডরুমে নিয়ে যান। বেডরুমের দরজা সাধারণত বন্ধই থাকে। রুমে বিছানা ছাড়া শুধু একটি টেবিল আছে, যার উপরে টেলিফোন রাখা, ইস্ত্রি করার একটি বোর্ড এবং একটি ওয়ার্ডরোব। তিনি ওয়ার্ড্রোব ড্রয়ারগুলো খুললেন। প্রতিটি ড্রয়ার শাড়িতে পূর্ণ, যতো ডিজাইনের কল্পনা করা যায়, প্রায় সবরকম। সোনালি ও রুপালি সুতা দিয়ে বোনা প্রান্ত। কিছু শাড়ি স্বচ্ছ, টিস্যুর মতো পাতলা, অনেকগুলো বেশ পুরু,

প্রান্তভাগ সুতার গিট দেয়া। কিছু শাড়ি হ্যাঙ্গারে, কিছু ভাঁজ করা বা পেঁচানো। ড্রয়ার থেকে শাড়ি বের করে স্তূপ করে ফেললেন। "আমি কি এটা কখনো পরেছি? এবং এটা? এটা? একটি একটি করে শাড়ি বের করে বলছিলেন। শাড়িগুলো যেন বিছানার চাদরের মতো জড়ো হয়ে রইলো। রুমটি পূর্ণ হলো ন্যাপথলিনের কটু গন্ধে।

"ছবি পাঠাও" ওরা লিখে। "তোমার নতুন জীবনের ছবি পাঠাও।" আমি কি ছবি পাঠাবো? তিনি ক্লান্ত হয়ে বিছানার প্রান্তে বসলেন। "এলিয়ট, ওদের ধারণা, এখানে আমি রানির মতো জীবন কাটাচ্ছি।" রুমের শূন্য দেয়ালের দিকে তাকালেন তিনি। "ওরা ভাবে, আমি বোতাম টিপলেই বাড়ি পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। আমি একটি রাজপ্রাসাদে থাকি বলে ওদের ধারণা।" ফোন বাজলো। মিসেস সেন রিসিভার তোলার আগে বেশ ক'বার বাজতে দিলেন। আলাপের সময় মনে হলো তিনি শুধু উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন এবং শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছছেন। ফোন ছাড়ার পর শাড়িগুলো ভাঁজ না করেই ড্রয়ারে গুজে রাখলেন। এরপর তিনি এবং এলিয়ট জুতা পরে গাড়িতে গিয়ে বসলেন এবং অপেক্ষা করলেন মি. সেনের।

"আজ তুমিই গাড়ি চালাও" মি. সেন এসে বললেন গাড়ির হুডে আঙুলের টোকা দিতে দিতে। এলিয়ট থাকলে তারা সবসময় ইংরেজিতেই কথা বলেন।

"আজ নয়, অন্য একদিন।"

"রাস্তায় অন্যান্য গাড়ির সাথে গাড়ি চালাতে এভাবে অস্বীকার করলে তুমি কি করে ড্রাইভিং পরীক্ষায় পাস করবে বলে আশা করতে পারো? আজ এলিয়ট সাথে আছে।"

"ওতো প্রতিদিনই থাকে। তোমার নিজের ভালোর জন্যেই বলছি। এলিয়ট, মিসেস সেনকে বলো যে, তার ভালোর জন্যেই আমি বলছি।"

মিসেস সেন গাড়ি চালাতে সম্মত হলেন না।

গাড়ি চললেও সবাই নীরব। এই রাস্তা ধরেই এলিয়ট ও তার মা প্রতি সন্ধ্যায় তাদের সৈকতের বাড়িতে ফিরে যায়। কিন্তু মি. ও মিসেস সেনের গাড়ির পিছনের সিটে বসে এই চলা কেমন অপরিচিত মনে হয় এবং স্বাভাবিক সময়ের চাইতে বেশি সময় লাগে। যে গাংচিলের ক্লান্তির ডাক প্রতিদিন সকালে তার ঘুম ভাঙ্গায়, সেগুলোর পানিতে ডুব দেয়া ও আকাশে পাখা মেলার দৃশ্য এখন তাকে রোমাঞ্চিত করছে। একটার পর একটা সৈকত অতিক্রম করলো তারা। সৈকত জুড়ে কাঠ দিয়ে তৈরি অস্থায়ী দোকানগুলো, যেখানে গ্রীষ্মে বরফ শীতল লেমোনেড ও পানীয় বিক্রি করে সেগুলোর ঝাপ এখন বন্ধ। একটি দোকানই খোলা পাওয়া গেল। এটিই মাছের দোকান। মিসেস সেন গাড়ির দরজা খুলে সেনবাবুর দিকে ফিরলেন, যিনি তখনো সিটবেল্ট খুলেননি। "তুমি কি আসছো?"

সেনবাবু তার মানিব্যাগ থেকে কিছু ডলারের নোট দিলেন। "বিশ মিনিটের মধ্যে আমার একটি বৈঠক শুরু হবে" ড্যাসবোর্ডের উপর চোখ রেখে তিনি

বললেন। "সময় নষ্ট করো না।" এলিয়ট তার সাথে ছোট্ট স্যাঁতসেতে দোকানটিতে গেল। দোকানের দেয়ালে মাছধরা জাল, স্টার ফিশ, বয়ার ছবি সম্বলিত পোস্টার। গলায় ক্যামেরা ঝুলানো একদল টুরিস্ট কাউন্টারে ভিড় করে আছে। কেউ মুখবন্ধ শামুকের নমুনা দেখছে, অন্যের উত্তর আটলান্টিকে পাওয়া যায় এমন পঞ্চাশটি মাছের দীর্ঘ তালিকার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। মিসেস সেন কাউন্টারের মেশিন থেকে একটি টিকিট নিয়ে লাইনে দাঁড়ালেন। এলিয়ট চিংড়ি মাছ রাখার জায়গাটির পাশে দাঁড়ালো। খানিকটা পানির মধ্যে একটি আরেকটির উপর হাঁটাচলা করছে। তাদের নখগুলো হলুদ রবার ব্যান্ড দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে। মিসেস সেনের পালা এলে এলিয়ট লক্ষ করলো তিনি কালো রবারের এপ্রন পরা উজ্জ্বল লালমুখ ও হলদে বর্ণের দাঁত বিশিষ্ট এক লোকের সাথে হেসে হেসে কথা বলছেন। লোকটি একটি সামুদ্রিক মাছের লেজ ধরে তুলে দেখাচ্ছে।

"আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনি যে মাছটি আমাকে দিচ্ছেন, সেটি তাজা?"

"যে কোন মাছের চেয়ে তাজা এবং মাছগুলো স্বয়ং আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে।"

ওজনের জন্যে মাছটি স্কেলে তোলা হলে স্কেলের কাঁটা কেঁপে এক জায়গায় স্থির হলো।

"মিসেস সেন, মাছটি কি আঁশ ছাড়িয়ে কেটে দেবো?"

তিনি মাথা ঝুকালেন, "মাথাটা দিয়ে দেবেন দয়া করে।"

"আপনার বাড়িতে কি বিড়াল আছে?"

"না, কোন বিড়াল নেই। শুধু একজন স্বামী আছে।"

পরে, অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে তিনি কাপবোর্ড থেকে বটি বের করলেন। কার্পেটের উপর সংবাদপত্র বিছিয়ে, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখলেন। কাগজের মোড়ক থেকে তিনি একটি একটি করে রক্তে মাখা মাছের টুকরাগুলো বের করে রাখলেন। লেজ ধরে টান দিলেন, মাছের পেটি আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করলেন। নাড়িভুঁড়ি আলাদা করে একটি কাঁচি দিয়ে পাখনাগুলো ছেঁটে দিলেন। মাছের কানকোতে একটি আঙুল ঢুকানোর ফলে সেটি রক্তে এতো লাল বর্ণ ধারণ করলো যে, তার সিঁদুরের রংও ম্লান মনে হলো। মাছটির গায়ে কালো রেখা ছিল। বটিতে চেপে ধরে মাছের টুকরা কাটতে খাঁজকাটা দাগের মতো হলো।

"তুমি এমন করলে কেন?" এলিয়ট জানতে চাইলো।

"কতগুলো টুকরা তা দেখার জন্যে। মাছটি ঠিকমতো কাটতে পারলে তিন বেলা রান্না করা যেতো।" মাথাটি কুটে একটি প্লেটে রাখলেন তিনি।

নভেম্বর মাসে মিসেস সেন একটানা বেশ কিছুদিন ড্রাইভিং প্রাকটিস করতে অস্বীকার করলেন। কাপবোর্ড থেকে বটিটি বের হতো না। মেঝের উপর

সংবাদপত্র বিছানো বন্ধ থাকলো। মাছের দোকানে তিনি ফোন করতেন না অথবা মুরগির মাংস কাটতেন না। নীরবে তিনি এলিয়টের জন্যে পিনাট বাটার সহযোগে ক্রেকার তৈরি করে দিতেন। এরপর একটি জুতার বাক্সে রাখা পুরনো চিঠিগুলো বের করে পড়তেন। এলিয়টের যখন বিদায় নেবার সময় তিনি তার জিনিসগুলো গুছিয়ে দিতেন। তার মাকে ভিতরে এসে সোফায় বসতে আমন্ত্রণ করতেন না বা প্রথমেই কিছু খেতে দিতেন না। এক পর্যায়ে এলিয়টের মা যখন একদিন গাড়িতে তাকে জিজ্ঞেস করলো যে, মিসেস সেনের আচরণে কোন পরিবর্তন সে লক্ষ করেছে কিনা, সে উত্তর দিলো যে, তেমন কিছু সে দেখেনি। সে মাকে একথা বলেনি যে, মিসেস সেন টেলিভিশন চালালেও কখনো দেখেন না অথবা নিজের জন্যে চা তৈরি করলেও কফি টেবিলে তা ঠাণ্ডা হতে থাকে। একদিন তিনি টেপরেকর্ডারে একটি ক্যাসেট বাজালেন, যাকে তিনি বলেন 'রাগ'; শুনে মনে হয় কেউ যেন বেহালায় খুব ধীরে এবং পরে খুব দ্রুতলয়ে সুর তুলছে। মিসেস সেন বলেছেন, এটা শোনার সময় পড়ন্ত বিকেল, যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সুরটা বাজার সময় তিনি সোফায় বসে ছিলেন চোখ বন্ধ করে। পরে তিনি বলেন, "তোমাদের বিটোফেনের চাইতেও এ সুর করুণ, তাই না?" আরেকদিন তিনি একটি ক্যাসেট বাজান, যাতে বেশ কিছু লোক মিসেস সেনের ভাষায় কথা বলছিল—তিনি এলিয়টকে বলেন যে, এটা দেশ থেকে তাদের বিদায়ের সময় দেয়া হয়েছে। তার পরিবারই তার জন্যে এটি তৈরি করেছে। এক একজনের হাসি ও কথার সাথে মিসেস সেন প্রত্যেক বক্তাকে শনাক্ত করছিলেন; "আমার তৃতীয় কাকা, আমার কাকার মেয়ে, বোন, আমার বাবা, আমার ঠাকুরদা।" একটি কণ্ঠ গান গাইলো, আরেকজন কবিতা আবৃত্তি করলো। ক্যাসেটের সর্বশেষ কণ্ঠ মিসেস সেনের মায়ের। শান্ত কণ্ঠ এবং অন্যদের চাইতে অনেক গুরুগম্ভীর। তার প্রতিটি বাক্যের পর বিরতি। মিসেস সেন এলিয়টকে অনুবাদ করে শোনালেন; "পাঠার দাম দু'টাকা বেড়েছে। বাজারের আম খুব মিষ্টি নয়। কলেজ স্ট্রিট জলে ভেসে গেছে।" টেপ বন্ধ করে দিলেন তিনি। "যেদিন আমি ভারত ছেড়ে আসি সেদিন এসবই ঘটেছিল।" পরের দিন তিনি একই ক্যাসেট পুরোটা শুনলেন। এবার যখন তার ঠাকুরদার কথা বাজছিল, তখন তিনি টেপ বন্ধ করে দিলেন। এলিয়টকে বললেন, তিনি একটি চিঠি পেয়েছেন ক'দিন আগে। তার ঠাকুরদা মারা গেছেন।

এক সপ্তাহ পর মিসেস সেন আবার রান্না শুরু করলেন। একদিন লিভিংরুমের ফ্লোরে সংবাদপত্র বিছিয়ে বসে বাঁধাকপি কাটার সময় মি. সেনের ফোন এলো। তিনি এলিয়ট ও মিসেস সেনকে সাগরের তীরে নিয়ে যেতে চান। এ উপলক্ষে মিসেস সেন একটি লাল শাড়ি পরলেন এবং ঠোঁটে লাল রং এর লিপস্টিক লাগালেন। সিঁথিতে নতুন করে সিঁদুর দিলেন এবং আবার বেনি বাঁধলেন। থুতনির

নিচে একটি স্কার্ফ বেঁধে সানগ্লাস মাথার উপরে আটকে নিলেন এবং পার্সে একটি পকেট ক্যামেরা ভরে নিলেন। মি. সেন পার্কিং লট থেকে গাড়ি পিছানোর সময় একটি হাত সামনের সিটের উপর রেখেছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল, যেন তিনি হাত দিয়ে মিসেস সেনকে বেষ্টন করে আছেন। এক পর্যায়ে মি. সেন তাকে বললেন, "এই খাটো কোট পরে খুব ঠাণ্ডা লাগবে। তোমার জন্যে গরম কিছু পাওয়া প্রয়োজন।" দোকানে তারা বেশ ক'ধরনের সামুদ্রিক মাছ কিনলেন, ম্যাকারেল, বাটার ফিশ, সীবাস। এবার মি. সেন তাদের সাথে দোকানে এসেছেন। মি. সেনই দোকানীর কাছে জানতে চাইলেন যে, মাছগুলো তাজা কিনা এবং কিভাবে কাটতে হবে তাও বলে দিলেন। তারা এতো মাছ কিনলেন যে, এলিয়টকেও একটি ব্যাগ ধরতে হলো। গাড়ির পিছনে রাখার পর মি. সেন ঘোষণা করলেন যে, তিনি ক্ষুধার্ত। মিসেস সেনও খেতে রাজি হলেন। তারা একটি রেস্টুরেন্টের উদ্দেশ্যে রাস্তা অতিক্রম করলেন। রেস্টুরেন্টের খাবার সরবরাহ কাউন্টার তখনো খোলা ছিল। তারা একটি পিকনিক টেবিল দখল করে বসলেন এবং কেক খেলেন। মিসেস সেন সস ও গোলমরিচের গুড়া মিশিয়ে নিয়েছিলেন। "পাকোরার মতো, তাই না?" তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, লিপস্টিক ম্লান হলো এবং তিনি মি. সেনের সব কথায় হাসছিলেন।

রেস্টুরেন্টের পিছনেই ছোট সৈকত। খাওয়া শেষ করে তারা খানিক সময় সৈকতে হাঁটলেন। বাতাস এতো প্রবল যে, তাদেরকে পিছন দিকে হাঁটতে হলো। মিসেস সেন ঢেউ এর দিকে দেখিয়ে বললেন যে, বিশেষ মুহূর্তে প্রতিটি ঢেউকে মনে হয় যেন, রশির উপর শুকাতে দেয়া শাড়ি দুলছে। কিন্তু নিজেই চিৎকার করে বললেন, "অসম্ভব।" পিছনে ফিরে হেসে উঠলেন। তার চোখ অশ্রুসজল। "আমি চলতে পারছি না।" বালির উপর দাঁড়ানো এলিয়ট ও মি. সেনের ছবি তুললেন। "এখন আমাদের ছবি তোল।" এলিয়টকে তার কোটের সাথে চেপে ধরে ক্যামেরা মি. সেনের হাতে দিয়ে বললেন। শেষপর্যন্ত ক্যামেরা দেয়া হলো এলিয়টকে। "শক্ত করে ধরো।" মি. সেন বললেন। এলিয়ট ক্যামেরার ক্ষুদ্র জানালা দিয়ে তাকালো এবং মি. ও মিসেস সেনের কাছাকাছি আসার অপেক্ষা করলো। কিন্তু তারা খুব ঘনিষ্ঠ হলো না। তারা পরস্পরের হাত ধরলো না, একজন আরেকজনের কোমর পেঁচিয়ে ধরলো না। দু'জনই মুখ বন্ধ করে হাসলো। বাতাসে চোখ কুঞ্চিত করে তাকালো। মিসেস সেনের লাল শাড়ি তার কোটের নিচে থেকে আগুনের শিখার মতো জ্বলজ্বল করছিল।

প্রবল বাতাসে ক্লান্তিকর হাঁটাহাঁটি ও খাওয়ার পর আরেক দফা বেরিয়ে গাড়িতে উঠার পর তাদের উষ্ণবোধ হলো। তারা বালিকণা, দূরে নোঙর করা জাহাজ, বাতিঘরের দৃশ্য, লাল আভাযুক্ত আকাশের প্রশংসা করলো। একটু পর মি. সেন গাড়ির গতি মন্থর করলেন এবং রাস্তার পাশে গাড়ি থামালেন।

"কি হলো, থামলে যে?" মিসেস সেন জানতে চাইলেন।

"আজ বাড়ি পর্যন্ত তুমি গাড়ি চালাবে।"

"আজ নয়।"

"আজই।" মি. সেন গাড়ি থেকে বের হয়ে এসে মিসেস সেনের পাশের দরজা খুলে ধরলেন। প্রবল বাতাস খোলা দরজা দিয়ে গাড়িতে প্রবেশ করলো। সাথে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউ এর শব্দ। শেষপর্যন্ত মিসেস সেন তার সিট ছেড়ে ড্রাইভিং সিটে বসলেন, কিন্তু শাড়ি, সানগ্লাস ঠিকঠাক করতে দীর্ঘ সময় নিলেন। এলিয়ট পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। রাস্তা গাড়ি শূন্য। মিসেস সেন রেডিও খুলে দিলেন। বেহালার সুরে গাড়ি ভরে উঠলো।

মি. সেন রেডিও বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "এর কোন প্রয়োজন নেই।" "এতে আমার মনোনিবেশ করতে সুবিধা হয়" মিসেস সেন আবার রেডিও চালু করলেন।

"সিগন্যাল দাও", সেনবাবু নির্দেশ দিলেন।

"আমি জানি, কি করতে হবে।"

মাইলখানেক ভালোই চালালেন মিসেস সেন। যদিও তার গাড়ি অতিক্রমকারী গাড়িগুলোর চাইতে অনেক মন্থর ছিল। যখন শহরের নিকটবর্তী হলেন, দূরে তারের উপর ঝুলন্ত ট্রাফিক সিগন্যালগুলো জ্বলতে দেখলেন, তিনি গাড়ির গতি আরো কমিয়ে আনলেন।

"লেন পরিবর্তন করো" মি. সেন বললেন, মোড় ঘোরার জন্যে তোমাকে বামের লেন নিতে হবে।" মিসেস সেন লেন বদলালেন না।

"তোমাকে বলছি, লেন পরিবর্তন করো" তিনি রেডিও বন্ধ করে দিলেন। "তুমি কি আমার কথা শুনছো?"

একটি গাড়ি হর্ণ বাজালো, এরপর আরেকটি। তিনিও তাদের জবাবে জোরে হর্ণ বাজালেন, গাড়ি থামালেন, এরপর সিগন্যাল না দিয়েই গাড়ি রাস্তার পাশে নিয়ে গেলেন। "আর নয়।" স্টিয়ারিং হুইলের উপর মাথা রেখে বললেন। "খুব বাজে, ড্রাইভিং করতে আমি ঘৃণা করি। আর চালাতে পারবো না আমি।"

এ ঘটনার পর তিনি গাড়ি চালানো বন্ধ করলেন। মাছের দোকান থেকে ফোন করলে তিনি সেনবাবুর অফিসে ফোন করে জানালেন না। তিনি নতুন কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি থেকে সমুদ্র তীর পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় টাউন সার্ভিস বাস আছে। ইউনিভার্সিটির পর বাসটি দু' জায়গায় থামে—প্রথমে একটি নার্সিং হোমে, এরপর নামহীন একটি শপিং প্লাজায়, যেখানে একটি বুকস্টোর, জুতার দোকান, একটি ওষুধের দোকান এবং একটি রেকর্ডের দোকান আছে। পোর্টিকোর নিচে বেঞ্চে নার্সিং হোমের বৃদ্ধা মহিলারা বড় বড় বোতাম সম্বলিত হাঁটুলম্বিত ওভারকোট পরে জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে এবং লজেন্স চুষছে।

এ দৃশ্য দেখার পর মিসেস সেন বাসেই এলিয়টকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এলিয়ট, তোমার মা বুড়ো হয়ে গেলে তুমিও কি তাকে নার্সিং হোমে রেখে দেবে?"

"হয়তো রাখবো" সে বললো। কিন্তু আমি প্রতিদিন তাকে দেখে যাবো।" এখন তুমি একথা বলছো, কিন্তু দেখবে, তুমি যখন বড় হবে, তোমার জীবন কেমন হবে, কোথায় থাকবে, যা তুমি এখন জানতে পারছো না।" তিনি আঙুলে গুনতে শুরু করলেন : তোমার একটি বউ হবে, নিজের সন্তান হবে এবং তারা একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় তালেরকে নিয়ে যেতে বলবে। তারা যথেষ্ট বিনম্র ও দয়ার্দ্র চিত্তের হলেও এক সময় তোমার মাকে দেখতে আসা নিয়ে অভিযোগ তুলবে এবং তুমি নিজেও ব্যাপারটায় ক্লান্ত বোধ করবে। এরপর তুমি একদিনের জন্যে যেতে পারবে না, এরপর আরেকদিন এবং তোমার মা নিজেকে কোনরকমে টেনে বাসে তুলবে, নিজের জন্যে লজেন্স সংগ্রহ করতে।

মাছের দোকানে বরফের চাঁইগুলো প্রায় শূন্য। চিংড়ি রাখার জায়গাটাও তাই। পানির মধ্য দিয়ে মরচে রং এর দাগ দেখা যাচ্ছে। একটি নোটিশ টানানো হয়েছে যে, এ মাসের শেষ দিকে দোকান বন্ধ রাখা হবে পুরো শীতকালের জন্যে। কাউন্টারে একজন মাত্র লোক কাজ করছে। তরুণ বয়সী লোকটি মিসেস সেনকে না চিনলেও তার নামে রাখা ব্যাগটি দিয়ে দিল।

"মাছটির কি আঁশ ছাড়ানো এবং পরিষ্কার করা হয়েছে?" মিসেস সেন জানতে চাইলেন।

তরুণ কাঁধ ঝাঁকালো, "আমার মালিক আগেভাগে চলে গেছেন। তিনি শুধু ব্যাগটি আপনাকে দিতে বলেছেন।" পার্কিং লটে গিয়ে মিসেস সেন বাসের সময়সূচি দেখলেন। পরবর্তী বাসের জন্যে পয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। অতএব তিনি এলিয়টকে নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করে এর আগে যে রেস্টুরেন্ট থেকে কেক কিনেছিলেন, সেখান থেকেই কেক কিনলেন। বসার কোন জায়গা নেই। পিকনিক টেবিলের ব্যবহার এখন নেই বলে সেগুলো উল্টে রাখা হয়েছে।

বাসে উঠে বসার পর এক বৃদ্ধা তাদের প্রতি বার বার লক্ষ করছিলেন। তার চোখ একবার মিসেস সেনের উপর, আরেকবার এলিয়টের উপর পড়ছিল। তাদের পায়ের মাঝখানে রক্তের দাগ লাগা ব্যাগের উপরও বৃদ্ধার চোখ। বৃদ্ধার গায়ে চাপানো একটি কালো ওভারকোট, কোলের উপর রাখা গুটিডরা ফ্যাকাসে হাত, ওষুধের দোকানের কোঁচকানো সাদা ব্যাগ। বাসে আর যে দু'জন যাত্রী তারা কলেজের ছাত্রছাত্রী, প্রেমিক প্রেমিকা। একই টি-শার্ট পরা, আঙুল জড়িয়ে রেখেছে এবং পিছনের দিকের সিটে জড়াজড়ি করে বসে আছে। এলিয়ট ও মিসেস সেন নীরবে কেক খেয়ে শেষ করলেন। ন্যাপকিন আনতে ভুলে গিয়েছিলেন মিসেস সেন, তার মুখের কোনায় লেগে থাকা শুকনো মাখনের গুড়া দেখা যাচ্ছিল। নার্সিং হোম স্টপেজে বাস থামলে ওভারকোট পরা মহিলা উঠে দাঁড়ালেন এবং ড্রাইভারকে কিছু বলে নেমে গেলেন। ড্রাইভার তার মাথা ঘুরিয়ে মিসেস সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার ব্যাগের ভিতরে কি?"

মিসেস সেন একটু চমকে চোখ উপরে তুললেন।

"আপনি ইংরেজি বলতে পারেন?" বাস আবার চলতে শুরু করেছে। বিশাল রিয়ার ভিউ মিররে মিসেস সেন ও এলিয়টকে লক্ষ করছে সে।

"হ্যাঁ, আমি ইংরেজি বলতে পারি।"

"আমি জানতে চাচ্ছি, আপনার ব্যাগে কি?"

"একটি মাছ।" মিসেস সেন উত্তর দিলেন।

"মাছের গন্ধ অন্য যাত্রীদের বিরক্ত করছে বলে মনে হচ্ছে। এই যে ছেলে, তোমার পাশের জানালাটা বোধহয় খুলে দেয়া উচিত, অথবা কিছু একটা করা উচিত।"

কয়েকদিন পর এক বিকেলে ফোন বাজলো। নৌকায় কিছু সুস্বাদু সামুদ্রিক মাছ 'হালিবাট' এসেছে। মিসেস সেন কি একটা নিতে চান কিনা? তিনি সেনবাবুকে ফোন করলেন। কিন্তু তিনি অফিসে নেই, দ্বিতীয় বার তিনি ফোন করতে চেষ্টা করলেন, এরপর তৃতীয় বার। শেষ পর্যন্ত তিনি কিচেনে গেলেন এবং বটি, একটি বেগুন ও কিছু সংবাদপত্র নিয়ে লিভিংরুমে ফিরে এলেন। এলিয়টকে কিছু না বললেও সে সোফায় গিয়ে বললো এবং মিসেস সেনের বেগুন কাটা লক্ষ করতে থাকলো। তিনি বেগুনের বোটা কাটার পর লম্বা ফালি করলেন এবং সরু ফালি করে সেগুলোকে ছোট ছোট টুকরা করলেন। চিনির কিউবের মতো ছোট।

"আমি এগুলো মাছ ও কাঁচকলার সাথে দিয়ে খুব মজার একটি তরকারি রান্না করবো।" তিনি বললেন "কিন্তু কাঁচকলা কোথায় পাবো।"

"আমরা কি মাছ আনতে যাচ্ছি?"

"হ্যাঁ, আমরা মাছ আনতে যাবো।"

"আমাদেরকে কি মি. সেন নিয়ে যাবেন?"

"তোমার জুতা পরে নাও।"

অ্যাপার্টমেন্ট পরিষ্কার না করেই তারা বের হলো। বাইরে এতো ঠাণ্ডা যে, এলিয়ট তার দাঁতে অনুভব করছে। তারা গাড়িতে উঠলো, মিসেস সেন তাদের অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স ঘিরে যে রাস্তা তাতে কয়েকবার চক্কর কাটলেন। প্রতিবার পাইনের ঝোপের কাছে এসে তিনি মেইন রোডে গাড়ি চলাচলের অবস্থা দেখার জন্যে থামেন। এলিয়টের মনে হলো, মি. সেনের জন্যে অপেক্ষা করার সময়টুকুতে তিনি ড্রাইভিং প্র্যাকটিস করছেন। কিন্তু তিনি সিগন্যাল দিয়ে মোড় নিলেন।

দুর্ঘটনাটি খুব দ্রুতই ঘটে গেল। মাইলখানেক যাওয়ার পরই তিনি লেন পরিবর্তন করে বাসের লেনে গেলেন, নির্ধারিত সময়ের চাইতে দ্রুত। পিছন থেকে আসা গাড়ি কোনমতে তার গাড়ির পাশ কাটিয়ে চলে যেতে সক্ষম হলেও সেই গাড়ির আকস্মিক হর্ণে তিনি এতো চমকে গিয়েছিলেন যে, তিনি গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বিপরীত দিকে একটি টেলিফোনের খুটিতে গিয়ে তার গাড়ি

আঘাত করলো। একজন পুলিশের আবির্ভাব ঘটলো এবং তিনি মিসেস সেনের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখতে চাইলেন। কিন্তু দেখানোর জন্যে তার কোন লাইসেন্স ছিল না। ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি যা বলতে পারলেন তা হলো, "মি. সেন ইউনিভার্সিটিতে গণিত পড়ান।"

ক্ষয়ক্ষতি সামান্য। মিসেস সেনের ঠোঁট কেটেছে। এলিয়ট শুধু বললো যে তার পাঁজরে ব্যথা পেয়েছে এবং গাড়ির বাম্পার সোজা করতে হবে। পুলিশের ধারণা হয়েছিল যে, মিসেস সেন মাথায়ও আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু ওটা ছিল সিঁথির সিঁদুর। মি. সেন তার এক সহকর্মীর গাড়িতে ঘটনাস্থলে পৌছলেন। পুলিশের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে কথা বললেন কিছু ফর্ম পূরণ করার সময়। তিনি মিসেস সেনকে কিছুই বললেন না অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসার পথে। সবাই গাড়ি থেকে বের হলে মি. সেন এলিয়টের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "পুলিশের লোকটি বলেছে, তুমি ভাগ্যবান। একটা আঁচড় ছাড়া রয়েছো, সেজন্যে সত্যিই ভাগ্যবান।"

মিসেস সেন তার চপ্পল খুলে রাখলেন। লিভিংরুমে রেখে যাওয়া বইটি সরিয়ে নিলেন। বেগুনের টুকরা ও সংবাদপত্র জড়ো করে আবর্জনার ক্যানে ফেলে দিলেন। ত্রেকারে পিনাট বাটার মেখে একটি প্লেটে সাজিয়ে কফি টেবিলের উপর রেখে টেলিভিশন ছাড়লেন, যাতে এলিয়ট সেদিকে মনোযোগ দেয়। "সে যদি আরো খেতে আগ্রহী হয় তাহলে ফ্রিজারের বাক্স থেকে ওকে খাবার দিও।" মি. সেনকে বললেন মিসেস সেন। তিনি ডাইনিং টেবিলে তার চিঠিগুলো বাছাই করছিলেন। একসময় মিসেস সেন বেডরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন। এলিয়টের মা যখন এলো তখন সোয়া ছ'টা। মি. সেন তাকে দুর্ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করে নভেম্বর মাসের জন্যে এলিয়টের মা যে অর্থ পরিশোধ করেছিল, তা ফেরত দেয়ার জন্যে একটি চেক লিখে দিলেন। মিসেস সেনের পক্ষ থেকে তিনি ক্ষমা চাইলেন অসুবিধার জন্যে। তিনি বললেন যে, মিসেস সেন বিশ্রাম নিচ্ছে। এলিয়ট যখন বাথরুমে গিয়েছিল তখন সে মিসেস সেনের কান্নার শব্দ শুনেছে। মি. সেনের স্থির করা ব্যবস্থায় এলিয়টের মা সন্তুষ্ট এবং বাড়ি ফেরার পথে এলিয়টের কাছে তার মা স্বীকার করলো যে, সে একরকম স্বস্তি বোধ করছে। সেদিনই ছিল মিসেস সেনের সঙ্গে অথবা অন্য কোন বেবি-সিটারের সঙ্গে এলিয়টের শেষ বিকেল। এরপর থেকে তার মা তাকে বাড়ির একটি চাবি দিয়ে দিল, যা একটি সুতা দিয়ে তার গলায় ঝুলানো থাকতো। জরুরি অবস্থায় তাকে পড়শিদেরকে ফোন করতে হবে এবং স্কুলের পর সে সোজা বাড়ি ফিরে আসবে।

প্রথম দিন যখন সে কোট খুলছিল, তখনই ফোন বেজে উঠলো। অফিস থেকে তার মা ফোন করেছে। "এলিয়ট, তুমি এখন অনেক বড় হয়েছো" তাকে মা বললো। "তুমি ভালো বোধ করছো তো?" এলিয়ট কিচেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো, ধূসর ঢেউ সৈকত থেকে নেমে যাচ্ছে এবং মাকে বললো যে সে ভালো আছে।

আশীর্বাদধন্য বাড়ি

চুলার উপর একটি কাপবোর্ডের মধ্যে মুখবন্ধ ভিনেগারের বোতলের পাশেই তারা প্রথম জিনিসটি আবিষ্কার করলো। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত টেপ দিয়ে আটকানো প্যাকিং বক্স সারিবদ্ধ করে রাখা। "অনুমান করে বলো তো, আমি কি পেয়েছি ?" টুইংকল লিভিং রুমে প্রবেশ করে বললো। তার এক হাতে ভিনেগারের বোতল এবং আরেক হাতে প্রায় একই উচ্চতার সাদা পোর্সেলিনের তৈরি যীশুখ্রিস্টের মূর্তি।

সঞ্জীব মুখ তুলে তাকালো। সে ফ্লোরের উপর হাঁটু গেড়ে বসে বক্সগুলো ডাকে দেয়ার জন্যে 'পোস্ট-ইট' লেবেল লাগাচ্ছিল। এ অংশটুকু আবার রং দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। "ওগুলো ফেলে দাও।"

"কোন্‌টা ?"

"দু'টোই।"

"ভিনেগার দিয়ে তো আমি কিছু রান্না করতে পারবো। এটা একদম নতুন।"

"আমরা কোনদিন ভিনেগার দিয়ে কিছু রান্না করিনি।"

"দেখি কিছু করা যায় কিনা। বিয়ের সময় পাওয়া রন্ধন প্রণালির কোন একটি বই দেখে নেব।"

সঞ্জীব বোর্ডের দিকে ফিরলো ফ্লোরে পড়ে আটকে যাওয়া একটি লেবেল তুলে জায়গামত লাগাতে। "ভিনেগারের মেয়াদ শেষের তারিখটা দেখে নাও। আর ওই ফালতু মূর্তিটা থেকে নিজেকে রক্ষা করো।"

"কিন্তু এটা মূল্যবান হতে পারে। কে জানে ?" মূর্তিটা সে উল্টো করে ধরলো। আলতোভাবে যীশুমূর্তির বস্ত্রখণ্ডের উপর তার তর্জনী দিয়ে বুলালো। "মূর্তিটি সুন্দর।"

"আমরা খ্রিস্টান নই।" সঞ্জীব বললো। বিলম্বে হলেও সে টুইংকলকে বাস্তব কথাগুলো বলারই প্রয়োজন অনুভব করছিল। আগের দিন সে তাকে বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, তার ড্রয়ারওয়ালা টেবিলটি যদি উপরে না তুলে টেনে নেয় তাহলে ফ্লোরে দাগ পড়বে।

টুইংকল কাঁধ ঝাঁকালো। "না, আমরা খ্রিস্টান নই, আমরা ছোটখাট ভালো হিন্দু।" খ্রিস্টের মাথার উপর সে চুমু দিলো। এরপর মূর্তিটি সে ফায়ার প্লেসের উপর তাকে রেখে দিল। সঞ্জীব লক্ষ করলো, ওটি ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন।

সপ্তাহ শেষেও তাকটি খালি করা হয়নি, বরং খ্রিস্টীয় দর্শনীয় বস্তুর উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের প্রদর্শনী হিসেবে তাকটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ওখানে রাখা আছে সেন্ট ফ্রান্সিসের চার রঙা ছবির থ্রি ডাইমেনশনাল পোস্টকার্ড, যেটি টুইংকল ওষুধের কেবিনেটের পিছনে পেয়েছে এবং একটি কাঠের ক্রসযুক্ত চাবির চেন। টুইংকলের পড়ার ঘরে অতিরিক্ত শেলফ বসাতে গিয়ে সঞ্জীব ক্রসটি খালি পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছিল। কালো ভেলভেটের পটভূমিতে তিন জ্ঞানী ব্যক্তির ফ্রেমে বাঁধানো একটি চিত্র লাগানো ছিল কাপড় রাখার আলমারিতে। ডাইনিংরুমে চায়না কেবিনেটের একটি ড্রয়ারে ছিল পর্বত চূড়া থেকে উপদেশ দানরত সোনালি চুলবিশিষ্ট শ্মশ্রুবিহীন যীশুর ছবি সম্বলিত একটি টালির তেপায়া।

"তোমার কি ধারণা, এ বাড়ির আগের মালিকরা জন্মগতভাবে খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী ছিল ?" টুইংকল জিজ্ঞাসা করলো একটি জায়গা খালি করতে করতে। কিচেনের সিঙ্কের পাইপের পিছনে পাওয়া একটি ক্ষুদ্রাকৃতির প্লাস্টিকনির্মিত বরফপূর্ণ গম্বুজ সম্বলিত স্থানে যীশুর জন্মের দৃশ্য।

সঞ্জীব একটি বুকসেলফে এমআইটি (ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি) থেকে সংগৃহীত তার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক টেক্সট বইগুলোকে ইংরেজি আদ্যক্ষর অনুযায়ী সাজিয়ে রাখছিল। যদিও বহুবছর আগে থেকেই বইগুলোর সাহায্য নেয়া তার প্রয়োজন ছিল। গ্রাজুয়েশনের পর হার্টফোর্ডের কাছে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করার জন্যে বোষ্টন থেকে কানেকটিকাটে চলে আসে এবং অতি সম্প্রতি সে জানতে পেরেছে যে, তাকে প্রতিষ্ঠানটির ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সেই তার নিজস্ব একজন সেক্রেটারি আছে এবং ডজনখানেক লোক তার তত্ত্বাবধানে কাজ করে, যারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে তার যে কোন প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে। তবুও রুমে তার কলেজের বইগুলোর উপস্থিতি তার জীবনের এমন এক সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখন সে প্রতি সন্ধ্যায় ম্যাসাচুসেটস অ্যাভিনিউ ব্রিজ পার হয়ে চার্লস রোডের অপর পাশে তার প্রিয় ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে গিয়ে সবজি সহযোগে মোগলাই চিকেনের অর্ডার দিতো এবং ডরমিটরিতে ফিরে ক্লাসে দেয়া সমস্যাগুলো সমাধান করে পরিচ্ছন্নভাবে কপি করতো।

"অথবা হতে পারে মানুষকে ধর্মান্তরিত করার উদ্যোগের অংশ" টুইংকল খানিকটা আনমনাভাবে বললো।

"এটা স্পষ্ট যে, তোমার ক্ষেত্রে পরিকল্পনাটা সফল হয়েছে।" তার কথায় সে আমল দিল না। ছোট্ট প্লাস্টিকের গম্বুজকে নাড়া দিল, যাতে তুষার কণা গোশালার খাদ্য পাত্রের উপর দিয়ে ঘুরে।

সঞ্জীব তাকের উপর জিনিসগুলো গুনলো। সে খানিকটা হতবুদ্ধি হলো যে, প্রতিটি জিনিসই খুব অর্থহীন। স্পষ্ট বুঝা যায় জিনিসগুলো পবিত্রতাবোধ শূন্য। সে আরো বিস্মিত হলো, টুইংকল সাধারণত সুরুচিসম্পন্ন, এগুলো নিয়ে এতোটা

বিমোহিত হলো কি করে। টুইংকলের কাছে এসব জিনিসের কিছু অর্থ থাকলেও তার কাছে অর্থহীন। বরং তার মধ্যে বিরক্তির সৃষ্টি করছে। "আমাদের উচিত বাড়ি বেচার দালালকে ডেকে বলা যে, বাড়িতে এই আজেবাজে জিনিসগুলো রয়ে গিয়েছিল। বাড়িরওয়ালাকে বলুন, সে এগুলো নিয়ে যাক।"

"কি বলছো সঞ্জীব" টুইংকল আর্তনাদ করে উঠলো। "এগুলো ফেলে দিলে আমার খুব কষ্ট লাগবে। যারা এখানে বসবাস করেছে, নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি জানি না, এগুলো ফেলে দিলে ধর্মকে অপবিত্র করা বা ওই ধরনের কিছু করা হবে কি না।"

"এগুলো যদি এতোই মূল্যবান হবে তাহলে সারাটা বাড়ি জুড়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল কেন? তারা এগুলো সাথে নিয়ে গেল না কেন?"

"নিশ্চয়ই আরো আছে" টুইংকল বললো। তার দৃষ্টি শূন্য অফহোয়াইট দেয়াল ঘুরে এলো, যেন প্লাস্টারের নিচে আরো জিনিস লুকানো আছে। "আমরা আর কি খুঁজে পাবো বলে তোমার ধারণা?"

যখন তারা তাদের বাক্স খুলে শীতের জামাকাপড় এবং জয়পুরে হানিমুন উপলক্ষে কেনা হাতির শোভাযাত্রার রেশমি চিত্রগুলো ঝুলিয়ে রাখছিল, তখন টুইংকল হতাশ হয়ে ভাবছিল যে, কিছু একটা জিনিস সে খুঁজে পাচ্ছে না। এক শনিবারের বিকেলে সেটি আবিষ্কারের আগে প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। একজন মানুষের আকৃতির চাইতেও বড় যীশুর একটি ওয়াটার কালার পোস্টার গেস্টরুমের রেডিয়েটরের পিছনে গোল করে পেচিয়ে রাখা ছিল। যীশুর ছবিতে বাদামের খোসার আকৃতির অস্বচ্ছ অশ্রু এবং মাথায় কাঁটা দিয়ে তৈরি একটি মুকুট। সঞ্জীব মনে করেছিল যে, এটি জানালার পর্দা।

"কি চমৎকার! আমরা অবশ্যই এটি টানিয়ে রাখবো। খুবই দৃষ্টিনন্দন ছবি।" টুইংকল একটি সিগারেট জ্বালিয়ে আনন্দের সাথে ধূমপান করতে লাগলো। পোস্টারটি সঞ্জীবের মাথার উপর দিয়ে মাহলারের ফিফথ্ সিম্ফোনির পরিচালকের ব্যাটনের মতো ঘুরিয়ে সে চিৎকার করলো নিচতলা থেকে।

"দেখো, আমি এখনকার মতো শুধু লিভিংরুমে তো ছোট্ট খ্রিস্টীয় নিদর্শনগুলো সহ্য করবো।" সঞ্জীব পোস্টারে অংকিত অশ্রুর ফোটার উপর দিয়ে বললো, "কিন্তু এটি আমাদের ঘরে কোনমতেই লাগানো চলবে না।"

টুইংকল তার দিকে তাকালো, শান্তভাবে তার নাসারন্ধ্র দিয়ে দু'টি ক্ষীণ নীল ধোঁয়ার রেখা নির্গত হচ্ছিল। আস্তে আস্তে সে পোস্টারটি পেঁচিয়ে একটি ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে আটকে রাখলো। তার মোটা, বেয়াড়া চুল বেঁধে রাখার জন্যে সবসময় তার কবজিতে ব্যান্ড থাকে। "আমি এটা আমার পড়ার ঘরে লাগাবো।" সে ঘোষণা করলো। "তাহলে তোমাকে আর এর দিকে তাকাতে হবে না।"

"ঘর উষ্ণ রাখার ব্যাপারে কি হবে? তারা সব রুম দেখতে চাইবে। অফিস থেকে আমি লোকদের আসতে বলেছি।" টুইংকল তার চোখ ঘুরালো। সঞ্জীব লক্ষ করলো যে সিম্ফোনি তৃতীয় ধাপে রয়েছে, সুর ক্রমশ উচ্চলয়ে উঠেছে, গুপ্ত রহস্যের সংঘাত যেন উচ্চ নিনাদের সাথে।

"আমি এটা দরজার পিছনে লাগাবো" টুইংকল বললো। "তাহলে ওরা যখন ভিতরে আসবে, তখন দেখতে পাবে না। খুশি হয়েছো?"

সে পোস্টার ও সিগারেট হাতে রুম ছেড়ে গেলে সঞ্জীব দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল। যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে সামান্য ছাই পড়েছে। সে ঝুঁকে দুই আঙুলের মাথা দিয়ে ছাই তুলে তার ভাঁজ করা তালুতে রাখলো। সিম্ফোনির চতুর্থ পর্যায় শুরু হয়েছে। সকালে নাশতার সময় সঞ্জীব পড়েছে যে, মাহলার তার সিম্ফোনির এই অংশটুকুর ম্যানমক্রিপ্ট তার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। যদিও ফিফথ সিম্ফোনিতে বিয়োগান্তক ও সংঘাতের ঘটনা আছে, তবু সে পড়েছে, এটি মূলত প্রেম ও সুখের সঙ্গীত। টয়লেট ফ্লাশ করার শব্দ শুনলো সে। "আরেকটি কথা", টুইংকল জোরে জোরে বললো "তুমি যদি অন্যদের খুশি করতে চাও, তাহলে আমি এই সঙ্গীত আর বাজাবো না। এটি বাজালে আমার ঘুম আসে।"

সঞ্জীব বাথরুমে গেল ছাই ফেলার জন্যে। সিগারেটের গোড়া এখনো কমোডের পানিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু ট্যাংক পানিতে ভর্তি হচ্ছে। অতএব পুনরায় ফ্লাশ করার জন্যে তাকে আরেক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে হবে। ওষুধের কেবিনেটের আয়নায় সে তার টানা চোখের দিকে লক্ষ করলো—ঠিক মেয়েদের মতো। এ নিয়ে টুইংকল তাকে ক্ষেপাতে পছন্দ করে। যদিও তার গঠন গড় পুরুষদের মতোই, তবু তার গাল দু'টো ফোলা ফোলা, তাছাড়া আয়ত চোখের কারণে সে ধারণা করে যে, তার মাঝে বিশেষত্ব রয়েছে। গড় মানুষের উচ্চতা তার এবং যখন থেকে তার উচ্চতা বৃদ্ধি থেমে গেছে, তার শুধু ইচ্ছে হয়েছে, উচ্চতা আর এক ইঞ্চি বেশি হলে ভালো হতো। সেজন্যে টুইংকল হাইহিল পরে বাইরে গেলে তার বিরক্তি লাগতো, ক'দিন আগে রাতে ম্যানহাটানে এক ডিনারে যেতেও সে হাইহিল পরেছিল। এ বাড়িতে আসার পর এভাবেই তাদের প্রথম উইকএন্ড কাটে। এরই মধ্যে ফায়ার প্লেসের উপরের তাকটা বেশ ভরে গেছে এবং এ নিয়ে তাদের মধ্যে ছোটখাট কথাকাটাকাটি হতো গাড়িতে কোথাও যাওয়া আসার পথে। একদিন অ্যালফাবেট সিটির নামহীন এক বারে টুইংকল চার গ্লাস হুইস্কি পান করেছিল এবং খ্রিস্টীয় নিদর্শন সম্পর্কে সবকিছু বিস্মৃত হয় সে। সেন্ট মার্কস প্লেসের এক ছোট্ট বই এর দোকানে সঞ্জীবকে টেনে নিয়ে যায় এবং কম্পিউটারের প্রায় এক ঘন্টা ব্রাউজ করে। সেখানে থেকে সে সঞ্জীবকে পীড়াপীড়ি করে যে, ফুটপাতে অচেনা লোকদের সামনে তারা ট্যাঙ্গো (দক্ষিণ আমেরিকার বিশেষ নাচ) নৃত্য করবে।

এরপর সে সঞ্জীবের হাত ধরে স্খলিত পায়ে দাঁড়ালো। তার দৃষ্টি আবছা। পায়ে পরা ছিল চিতাবাঘের ছাপযুক্ত ছাগচর্মের জুতা। এভাবে তারা একটির পর

একটি ব্লক হেঁটে অতিক্রম করে ওয়াশিংটন স্কোয়ারের এক পার্কিং লটে এলো। কারণ ম্যানহাটানে গাড়ি রাখলে কিসব ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে সে সম্পর্কে বহু গল্প শুনেছিল। তারা যখন গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিল তখন সঞ্জীব টুইংকলের জুতার উল্লেখ করে বললো, এগুলো আরামদায়ক মনে হচ্ছে না এবং এগুলো পরা উচিত নয় বলে পরামর্শ দিলে টুইংকল বলছিল যে, "আমি তো সারাদিন ডেস্কে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করি না। যখন টাইপ করি তখন হিল পরতে পারি না।" সঞ্জীব যুক্তি পরিহার করলেও একটি ঘটনার কারণে সে জানতো যে, টুইংকল তার ডেস্কে সারাদিন কাটায় না। শুধু সেই বিকেলে সঞ্জীব তার ব্যস্ত সময়সূচির মধ্যে বাড়ি ফিরে টুইংকলকে ব্যাখ্যাযোগ্য কোন কারণ ছাড়াই বিছানায় শোয়া অবস্থায় দেখলো। সে পড়ছিল। যখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, দিনের মাঝামাঝি সময়ে সে বিছানায় কেন, তখন টুইংকল বললো যে, তার বিরক্তি লাগছিল। সে তাকে বলতে চেয়েছিল যে, তুমি বাক্সগুলো থেকে কিছু জিনিস বের করতে পারতে, চিলেকোঠা ঝাড়ু দিতে পারতে, বাথরুমের জানালায় আরেক পোছ রং লাগাতে পারতে এবং তা করে আমাকে সতর্ক করতে পারতে, যাতে আমি এর উপর আমার ঘড়ি না রাখি। কিন্তু বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলো নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই।

আলমারির সামনের দিকে যে জামা সে দেখে তা পরেই সে তৃপ্ত বলে মনে হয়, চারপাশে যে ম্যাগাজিনগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, রেডিওতে যে গানই বাজছে—তাতেই সে সন্তুষ্ট এবং কিছুটা কৌতূহলী। এখন তার যাবতীয় কৌতূহল কেন্দ্রীভূত হয়েছে পরবর্তী অমূল্য সম্পদ আবিষ্কারে।

কয়েকদিন পর সঞ্জীব অফিস থেকে ফিরে দেখলো, টুইংকল টেলিফোনে ক্যালিফোর্নিয়ায় তার এক বান্ধবীর সাথে কথা বলছে ধূমপান করতে করতে। যদিও তখন বিকেল পাঁচটা বাজেনি এবং লং ডিসটেন্স ফোনের সর্বোচ্চ রেটের সময়। সে বলছিল "খুবই ধর্মপ্রাণ লোকজন"। যখন তখন সে থামছিল কথার মাঝে দম নিতে। "প্রতিটি দিন কাটছে যেন গুপ্তধন সন্ধানের মধ্য দিয়ে। আমি খুব সিরিয়াস। ব্যাপারটা না দেখলে তোমার বিশ্বাস হবে না। বেডরুমের সুইচ বোর্ডটা বাইবেলের দৃশ্য দিয়ে সজ্জিত। তুমি কি নূহের জাহাজের কথা এবং ওইসব সম্পর্কে জানো। বাড়িটায় তিনটি বেডরুম, একটি আমার পড়ার ঘর। সঞ্জীব হার্ডওয়্যারের দোকানে গেছে এবং সবকিছু ঠিকমতো সাজাচ্ছে। তুমি কল্পনা করতে পারো, প্রতিটি জিনিস সে পুনঃস্থাপন করেছে।"

এবার তার বান্ধবীর কথা বলার পালা। টুইংকল মাথা নাড়লো, ফ্রিজের সামনে ফ্লোরের উপর ঝুঁকে বসেছে। কালো চোঙা প্যান্ট, হলুদ রং এর সোয়েটার তার পরনে। লাইটার খুঁজছে সে। চুলায় সুগন্ধী কিছু রান্না হচ্ছে এমন গন্ধ সঞ্জীবের নাকে এলো। মেক্সিকান টেরাকোটা টালির উপর জট পাকানো অতিরিক্ত লম্বা ফোনের তার সে সতর্কতার সাথে অতিক্রম করে কিচেনে গেল। পাত্রের ঢাকনা তুললো সে। এক ধরনের লালচে সস টগবগ করে ফুটছে এবং পাত্রের পাশ দিয়ে উপচে পড়ছিল।

"ওটা মাছের তরকারি। আমি এতে ভিনেগার দেব।" সে তাকে বললো, বান্ধবীর সাথে কথা বন্ধ করে। "সরি, কি যেন বলছিলে?" টুইংকল ওরকমই, ছোটখাট বিষয় নিয়েই উত্তেজিত উৎফুল্ল হয়ে উঠে। দূরের কোন অদৃশ্য ঘটনার উদ্দেশ্যে আঙুল উঁচু করে, অনেকটা নতুন কোন আইসক্রিমের স্বাদ চোখে দেখা বা চিঠির বাক্সে একটি চিঠি ফেলার মতো। সঞ্জীব এই বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারে না। এর ফলে নিজেকে সে আহম্মক বলে মনে করে, যেন বিশ্বে লুকায়িত গুপ্তধন সম্পর্কে তার কোন অনুমান নেই অথবা দেখতে পায় না। সে টুইংকলের মুখের দিকে তাকায় এবং তার মনে হয় যে, এখনো তার কৈশোরই কাটেনি। উদ্বেগশূন্য চোখ, তার তৃপ্তিদায়ক বৈশিষ্ট্যগুলো যেন এখনো অপুষ্ট, যেন কোন ধরনের স্থায়ী আকৃতি লাভের অপেক্ষায় আছে। নার্সারীর একটি ছড়ার অনুকরণে তার ডাকনাম রাখা হয়েছে, তার শিশুসুলভ চপলতা এখনো কাটেনি। তাদের বিয়ের দ্বিতীয় মাসেই নির্দিষ্ট কিছু বিষয় তাকে নিদারুণ কষ্ট দেয়—মাঝে মধ্যে কথা বলার সময় তার মুখ দিয়ে থুথু বের হয় অথবা রাতে প্যান্টি, ব্রা খোলার পর ধোয়ার জন্যে রাখা কাপড়ের স্তূপে না রেখে বিছানার পাশে ফ্লোরেই ফেলে রাখে।

বিয়ের মাত্র চার মাস আগে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। টুইংকলের বাবা মা ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে এবং সঞ্জীবের বাবা মা এখনো কলকাতায় বাস করে। তারা পুরনো বন্ধু এবং মহাদেশের দূরত্ব সত্ত্বেও তারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন যেখানে টুইংকল এবং সঞ্জীবের পরিচয় ঘটে। এটি ছিল তাদের মহলে একটি কন্যার ষোড়শ জন্মদিনের অনুষ্ঠান। সঞ্জীব তখন ক্যালিফোর্নিয়ার পালো আল্টোতে ব্যবসা করতো। রেস্টুরেন্টে একটি গোলাকৃতির টেবিলে পাশাপাশি বসেছিল ওরা দু'জন টেবিলের কেন্দ্রস্থলে একটি রিভলভিং অংশে সাজিয়ে রাখা খাবারের আইটেমের প্রত্যেকটার স্বাদ তারা নিয়েছে। তারা তাদের বয়ঃসন্ধির বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেছে; ওডেহাউস নভেলের ব্যাপারে আগ্রহ, সেতারের সুরের প্রতি বিতৃষ্ণা সম্পর্কে মতবিনিময় করেছে এবং পরবর্তীতে টুইংকল স্বীকার করেছে যে, তাদের আলোচনার সময়ে সঞ্জীব যেভাবে কর্তব্যপরায়ণতার সাথে তার চায়ের কাপ পুনরায় ভরে দিয়েছিল তাতে সে মুগ্ধ হয়েছিল।

এরপর শুরু হলো ফোন করা এবং দীর্ঘসময় ধরে কথা বলা। অতঃপর সাক্ষাৎ। প্রথমে সঞ্জীব দেখা করে স্ট্যানফোর্ডে এবং টুইংকল দেখা করে কানেকটিকাটে। উইকএন্ডে টুইংকল এলে বারান্দায় বসে যে সিগারেট টানতো সেগুলোর গোড়া সে একটি অ্যাশট্রেতে রাখতো তার পরবর্তী আগমন পর্যন্ত। এরপর সে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে ঘর ঝাড়ু দিতো। বিছানার চাদর পরিষ্কার করতো এবং টুইংকলের সম্মানে টবে রাখা গাছের মরা পাতাগুলো ফেলে দিতো। তার বয়স সাতাশ বছর এবং সম্প্রতি এক আমেরিকানের দ্বারা পরিত্যক্ত, যে লোকটি অভিনেতার ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। সঞ্জীব নিঃসঙ্গ ছিল এবং সে হিসেবে সে পর্যাপ্ত অর্থ আয় করতো। তাছাড়া কখনো প্রেম করেনি, তাদের

মধ্যস্থতাকারীর পীড়াপীড়িতে তারা ভারতে গিয়ে বিয়ে করে। আগস্টের বিরামহীন বৃষ্টির মাঝে ম্যাডেভিলে রোডে ক্রিসমাস ট্রি সাজানোর মতো আলোকসজ্জিত লাল ও কমলা রং এর প্যান্ডেলের নিচে কয়েকশ' শুভাকাঙ্ক্ষী পরিবৃত অবস্থায় তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। শুভাকাঙ্ক্ষীদের খুব কম সংখ্যকই তার পরিচিত।

"তুমি কি চিলেকোঠা ঝাড়ু দিয়েছো ?" টুইংকল যখন ন্যাপকিন ভাঁজ করে তাদের প্লেটের পাশে রাখছিল তখন সঞ্জীব জানতে চায়। প্রাথমিক ঝাড়পোছ থেকে বাড়ির ঐ অংশটি বাদ ছিল। "এখনো দেই নি, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি ঝাড়ু দেব।" বাষ্প উঠতে থাকা পাত্রটি গীশু চিহ্নিত তেপায়ার উপর রেখে সে বলে, "মনে হয় এর স্বাদ ভালো হবে।" ছোট্ট একটি ঝুড়িতে ইটালিয়ান পাউরুটি, লেটুস, গাজর এবং লাল মদের গ্লাস. রান্নার ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ নেই। সুপার মার্কেট থেকে সে রোস্ট করা মুরগি কিনে, আলু এবং সালাদের যা পরিবেশন করা হয়, কে জানে কখনকার তৈরি এগুলো। ছোট্ট প্লাস্টিকের বাক্সে এগুলো বিক্রি করা হয়। ভারতীয় খাবার রান্না করা তার কাছে বিরক্তিকর। রসুন কাটা এবং আদা ছিলতে পছন্দ করে না সে। ব্লেন্ডার চালাতে পারে না। অতএব ছুটির দিনগুলোতে সঞ্জীবকেই রান্না করতে হয়। সরিষার তেল দিয়ে দারুচিনি ও লং সহযোগে ভালো তরকারি রান্নার চেষ্টা করে। টুইংকল আজ যাই রান্না করে থাকুক, সঞ্জীবকে স্বীকার করতেই হবে তা অতি সুস্বাদু, এমনকি আকর্ষণীয়। মাছের উজ্জ্বল সাদা টুকরা, সুগন্ধী লতার টুকরা এবং তাজা টমেটো দেখা যাচ্ছে বাদামি-লাল ঝোলের মধ্যে।

"কি করে এটা রান্না করলে ?"

"ব্যস করেছি আর কি।"

"কিভাবে করেছো ?"

"আমি শুধু জিনিসগুলো পাত্রে উঠিয়ে দিয়েছি এবং সব শেষে ভিনেগার ঢেলে দিয়েছি।"

"ভিনেগার কতটুকু দিয়েছো ?"

সে কাঁধ ঝাঁকালো। পাউরুটি টুকরা করে তার প্লেটে রাখলো।

"তুমি কি বুঝাতে চাও, তা তুমি নিজেই জানো না। তোমার উচিত লিখে রাখা। কোন পার্টি বা অন্য কোন কারণে আবার তৈরি করতে হলে তখন তুমি কি করবে ?"

"আমার মনে থাকবে", সে বললো। রুটির বাস্কেটটা ঢেকে রাখলো একটি টাওয়েল দিয়ে। সহসা সঞ্জীব লক্ষ করলো যে, মোজেসের কাছে প্রেরিত ঈশ্বরের দশটি আদেশ টাওয়েলে মুদ্রিত। টুইংকল টেবিলের নিচে সঞ্জীবের হাঁটুতে চাপ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। "এটা দেখো, এই বাড়িটি আশীর্বাদধন্য।"

নতুন বাড়িতে আগমন উপলক্ষে পার্টির দিন নির্ধারিত হয়েছে অক্টোবরের শেষ শনিবার। প্রায় ৩০ জনকে আমন্ত্রণ করেছে তারা। সবাই সঞ্জীবের ঘনিষ্ঠ, তার অফিসের সহকর্মী এবং কানেকটিকাট এলাকার বেশ ক'টি ভারতীয় দম্পতি, যাদের অনেককে সে ভালোভাবে না চিনলেও বিবাহপূর্ব সময়ে তাকে নিয়মিত নিমন্ত্রণ করতো শনিবার রাতে তাদের সাথে খেতে। প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবতো যে, তারা তাদের মহলে তাকে যোগ করেছে কেন। তাদের সাথে তার মিল খুব সামান্য, তবু তাদের আয়োজনে অংশ নিতো মসলাদার দোপেঁয়াজা, চিংড়ির কাটলেট এবং গালগল্প ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতো। কারণ ভিন্ন কোন কাজ থাকতো না। সম্ভবত টুইংকলের সঙ্গে প্রেম করার সময় থেকে বিয়ের পর এখন পর্যন্ত তাদের কারো সাথেই টুইংকলের সাক্ষাৎ হয়নি। সঞ্জীব তাদের সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো টুইংকল ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে কাটিয়ে সময় নষ্ট করতে চায়নি। তাছাড়া সঞ্জীব এবং টুইংকলের সাবেক প্রেমিক, যে ব্রুকফিল্ডের এক মৃৎপাত্র রং করার দোকানে কাজ করে বলে তার বিশ্বাস, তাকে ছাড়া কানেকটিকাটে আর কাউকে সে চেনে না। সে স্ট্যানফোর্ডে মাস্টার্সে একজন আইরিশ কবির উপর থিসিস শেষ করছিল, যে কবির নাম সঞ্জীব কখনো শোনেনি।

বিয়ের জন্যে ভারতে যাওয়ার আগে সঞ্জীব বাড়িটি ভালো দামে পেয়েছিল। একটি স্কুল এলাকার মধ্যে বাড়ি। বাড়ির চমৎকার বাঁকানো সিঁড়ি এবং সিঁড়িতে নকশাকাটা লোহার ব্যানিস্টার ও কালো রং এর কাঠের রেলিং তাকে মুগ্ধ করেছিল। রোদ পোহানোর জায়গা থেকে চিরসবুজ গাছের ঝোপ দেখা যায়। বাড়ির সামনে লাগানো ঢালাই পিতলের পাতে উৎকীর্ণ ২২ সংখ্যাটিও তার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংখ্যাটি তার জন্ম তারিখ। দু'টি ফায়ার প্লেস, দু'টি গাড়ি রাখার মতো গ্যারেজ এবং একটি চিলেকোঠা, যাকে প্রয়োজনে অতিরিক্ত বেডরুম হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। ততোদিনে সঞ্জীব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে, টুইংকল তার সাথে সেখানে থাকবে এবং চিরদিনের জন্যে থাকবে। অতএব, সে খ্রিস্টীয় নিদর্শনযুক্ত সুইচবোর্ডগুলোর ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি, অথবা ঝিনুকের অর্ধাংশে কুমারী মেরীর স্বচ্ছ মূর্তি সম্বলিত স্টিকার মাস্টার বেডরুমের জানালায় লাগানো। এ বাড়িতে এসে সঞ্জীব চেষ্টা করেছে সেটি চেছে তুলে ফেলতে। কিন্তু তাতে জানালায় দাগই পড়েছে, স্টিকার উঠেনি।

পার্টির আগের উইকএন্ডে তারা যখন লন পরিষ্কার করছিল, তখন সঞ্জীব টুইংকলের তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনতে পেল। সে তার কাছে দৌড়ে গেল আঁচড়াটা হাতে নিয়ে। তার ভয় হয়েছিল যে, সে হয়তো একটি মৃত প্রাণী বা সাপ দেখেছে। তার পায়ের নিচে ঝরে পড়া ধূসর ও হলুদ পাতার মচমচ শব্দের সাথে অক্টোবরের বাতাসের শব্দও তার কানে বাজলো। তার কাছে পৌঁছে দেখলো, টুইংকল ঘাসের উপর বসে পড়েছে, প্রায় নীরব হাসি তার মুখে। বাড়ন্ত ঝোপের পিছনে তাদের

কোমর সমান উঁচু কুমারী মেরীর প্লাস্টারের মূর্তি, মাথায় ভারতীয় বিয়ের কনেদের মতো ঘোমটা টানা, যার রং নীল। টুইংকল তার টি শার্টের প্রান্ত দিয়ে মূর্তিটির ভুরুতে লেগে থাকা দাগ মুছতে শুরু করলো।

"আমার মনে হয়, তুমি তাকে আমাদের খাটের পায়ার পাশে রাখতে চাও।" সঞ্জীব বললো।

সে তার দিকে তাকালো বিস্মিত দৃষ্টিতে। মূর্তিটির পেট স্ফীত এবং সঞ্জীব দেখলো তার নাভির চারপাশে সামান্য ক্ষতচিহ্ন। "তুমি কি মনে করো ? আমরা এটাকে নিশ্চয়ই আমাদের বেডরুমে রাখবো না।"

"না, আমরা তা পারি না।"

"সঞ্জীব, তুমি সত্যিই বোকা! এটা বাইরের জন্যে। লনে রাখার জন্যে।"

"না, ওহ ভগবান। টুইংকল এটা হতে পারে না।"

"আমরা অবশ্যই রাখবো। না রাখলে আমাদের জন্যেই দুর্ভাগ্যজনক হবে।"

"পড়শিরা সবাই দেখবে এবং আমাদেরকে পাগল ভাববে।"

"কেন, আমাদের লনে কুমারী মেরীর মূর্তি থাকার জন্যে। এখানকার প্রতিটি বাড়ির লনে একটি করে কুমারী মেরীর মূর্তি আছে। আমরা উপযুক্ত স্থানে এটি বসাবো।"

"আমরা খ্রিস্টান নই।"

"সেটাতো তুমি বারবার আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছো।" সে আঙুলের ডগায় থুথু নিয়ে মেরীর থুতনির নিচে দাগ অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ঘষতে লাগলো। "তোমার কি মনে হয় এগুলো ময়লা লেগেছে, না কি কোন ধরনের ছত্রাক ?"

তার সঙ্গে সঞ্জীব কিছুতেই পেরে উঠছে না, যে মহিলাকে সে মাত্র চার মাস আগে পরিচিত হয়ে বিয়ে করেছে, সেই মহিলার সাথে তাকে জীবন কাটাতে হবে। অনুতাপের সাথে তার মায়ের কথা মনে পড়লো, তিনি কলকাতা থেকে সম্ভাব্য কনেদের ছবি, বর্ণনা পাঠাতেন, যারা গান গাইতে পারে, সেলাই করতে পারে এবং রান্নার বই না দেখেই ভাল রাঁধতে পারে। সঞ্জীব সে মেয়েগুলোর কথা বিবেচনা করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি তালিকাও তৈরি করেছিল। কিন্তু তখনই টুইংকলের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। "টুইংকল আমি যাদের সাথে কাজ করি, তারা আমার লনে এই মূর্তি দেখতে চাইবে না।"

"একজন ধর্মানুরাগী হওয়ার কারণে তারা তোমাকে চাকুরি থেকে বরখাস্তও করবে না। তাহলে এটা হবে এক ধরনের বৈষম্য।"

"ওটা কোন ব্যাপার নয়।"

"তাহলে অন্যেরা কি ভাববে, তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো কেন ?"

"টুইংকল, প্লিজ, থামো।" সে ক্লান্ত। টুইংকল যখন ইটবিছানো ফুটপাতের পাশে ল্যাম্পপোস্টের দিকে মূর্তিটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, সঞ্জীব তার আঁচড়ার উপর ভর দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। "সঞ্জীব, দেখো, মেরীর মূর্তিটা এতো সুন্দর।"

সে তার জড়ো করা পাতাগুলোর কাছে গেল এবং দু'হাতে সেগুলো একটি প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরতে লাগলো। তার মাথার উপর নীল আকাশ মেঘশূন্য। লনের একটি গাছ এখনো পাতায় পাতায় ভরা, লাল, কমলা রং এর পাতা, যে শামিয়ানার নিচে টুইংকলকে সে বিয়ে করেছিল সে রকম।

সে জানে না যে, টুইংকলকে সে ভালোবাসে কি না। পালো আল্টোতে এক বিকেলে প্রায় দর্শকশূন্য অন্ধকার সিনেমা হলে যখন তারা পাশাপাশি বসে থাকা অবস্থায় প্রথম জানতে চেয়েছিল তখন সঞ্জীব তাকে বলেছিল যে, হ্যাঁ সে তাকে ভালোবাসে। কিছু কিছু অংশ জার্মান ভাষায় ডাবিং করা সেই মুভি যদিও টুইংকলের অন্যতম প্রিয় ছিল, কিন্তু শুরু হওয়ার পর সঞ্জীবের কাছে একেবারেই পানসে বিরক্তিকর লাগায় সে তার নাকটা টুইংকলের নাকের উপর চাপ দেয়, যাতে সে তার মাসকারা মাখা চোখের পাতার স্পন্দন অনুভব করতে পারে। সেই সন্ধ্যায় সঞ্জীব উত্তর দিয়েছিল, হ্যাঁ সে তাকে ভালোবাসে এবং টুইংকল উৎফুল্ল হয়ে তার মুখে তুলে দিয়েছিল একটি পপকর্ণ, সঞ্জীবের ঠোটের মাঝে তার আঙুলকে কিছুসময় থাকতে দিয়েছিল, যেন সঠিক উত্তর দেয়ার জন্যে এটা তার প্রাপ্য পুরস্কার।

যদিও টুইংকল নিজে থেকে সঞ্জীবকে ভালোবাসার কথা বলেনি, তবু তার ধারণা হয়েছিল যে, সেও তাকে ভালোবাসে। কিন্তু এখন সে আর এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। আসল সত্য হচ্ছে, সঞ্জীব জানে না যে, প্রেম কি ? তবে এটুকু উপলব্ধি করে যে, ভালোবাসা বলতে সে যা ভেবেছিল, তা সঠিক ছিল না। প্রতি রাতে তার শূন্য কার্পেট বিছানো ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে সে ভাবতো এটা ভালোবাসা নয়; খাওয়ার সময় সে শুধু ব্যবহার করতো একটি কাঁটাচামচ এবং উইকএন্ডের ডিনার পার্টির আমন্ত্রণ ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করতো, যখন অন্যেরা সেসব পার্টিতে হাত দিয়ে তাদের স্ত্রী বা প্রেমিকার কোমর পেঁচিয়ে ধরে যখন তখন এবং বারবার ঝুঁকে পড়ে তাদের কাঁধে বা গলায় চুমু দিতো। ক্যাটালগ ঘেঁটে বিশিষ্ট গীতিকার বাছাই করে ডাকযোগে সেই ক্লাসিক্যাল মিউজিকের সিডি পাঠানো এবং যথাসময়ে মূল্য পরিশোধের মতো ব্যাপার ছিল না এটি। টুইংকলের সাথে সাক্ষাতের আগের মাসগুলোতে সঞ্জীব উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল, "তিনটি পরিবার চালানোর মতো পর্যাপ্ত অর্থ ব্যাংকে জমা আছে তোমার", প্রতি মাসের শুরুতে ফোনে মায়ের সাথে কথা বলার সময় প্রতিবার তিনি সঞ্জীবকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। "তোমার একটা বউ দরকার, যে তোমার দেখাশুনা করবে ও ভালোবাসবে।" এখন তার বউ আছে, উঁচু মানের সুন্দরী বউ, যে শিগগির মাস্টার ডিগ্রি লাভ করবে। তাকে ভালো না বাসার কি আছে ?

সেই সন্ধ্যায় সঞ্জীব গ্লাসে জিন এবং টনিক মিশিয়ে পুরো গ্লাস পান করলো, এরপর আরেকটি গ্লাসের অধিকাংশ পান করার পর টুইংকলের দিকে এগুলো।

বাথটাবে সে সাবানের ফেনার মধ্যে ডুবে ছিল, যা আগে সে কখনো করেনি কারণ সে বলেছিল লনে কাজ করার ফলে তার শরীর ব্যথা করছে। সঞ্জীব দরজায় নক করলো না, দরজা শুধু ভেজানো ছিল। টুইংকল মুখে একটি উজ্জ্বল নীল মুখোশ পরেছে এবং একসাথে সিগারেট টানছে ও বরফ দেয়া পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। তাছাড়া একটি মোটা পেপারব্যাক বই এর উপরও চোখ বুলাচ্ছে যে বইটির পৃষ্ঠা পানিতে ভিজে আটকে গেছে এবং ধূসর রং ধারণ করেছে। বই এর কভার দেখলো সঞ্জীব। গাঢ় লাল অক্ষরে একটি মাত্র শব্দ মুদ্রিত আছে কভারে 'সনেট'। সে একটি শ্বাস নিয়ে গ্লাসের অবশিষ্ট জিনটনিক শেষ করে শান্তভাবে টুইংকলকে বললো যে, সে জুতা পরে বাইরে যাচ্ছে এবং সামনের লন থেকে কুমারী মেরীর মূর্তিটা সরিয়ে নিচ্ছে।

"ওটাকে তুমি কোথায় রাখবে ?" সে চোখ বন্ধ রেখে স্বপ্নচারীর মতো বললো। একটি ফেনার উপর উঠিয়ে দর্শনীয় ভঙ্গিতে ভাঁজ করলো। পায়ের আঙুল বাঁকা ও সোজা করলো।

"এখন এটা আমি গ্যারেজে নিয়ে রাখছি। কাল সকালে কাজে যাওয়ার পথে সাথে নিয়ে যাবো আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিতে।"

"তোমার এতো দুঃসাহস।" সে উঠে দাঁড়ালো, বইটি পড়ে গেল বাথটাবের পানির মধ্যে, তার উরু থেকে সাবানের ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। "আমি তোমাকে ঘৃণা করি।" সঞ্জীবকে বললো সে। 'ঘৃণা' শব্দটি উচ্চারণের সময় চোখ কুঞ্চিত করলো। স্নান শেষে পরার গাউনটা গায়ে চাপিয়ে শক্ত করে কোমরে ফিতা বাঁধলো এবং ফ্লোরে ভিজা পায়ের ছাপ ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো। সে লিভিংরুমে পৌঁছলে সঞ্জীব বললো, "তুমি ওভাবেই বাড়ি ছাড়তে চাইছো ?"

হৃদপিণ্ডে এক ধরনের কম্পন অনুভব করলো সে এবং কথা বলার সময় নিজের কণ্ঠই তার কাছে ক্রুদ্ধ অপরিচিত মনে হলো।

"কার কি ? আমি কিভাবে বাড়ি ত্যাগ করবো, কে তার তোয়াক্কা করে ?"

"এ সময়ে তুমি কোথায় যাবে বলে ভাবছো ?"

"ওই মূর্তি তুমি ফেলে দিতে পারবে না। আমি তোমাকে ফেলতে দেব না।" তার মুখোশটা এখন শুকনো, কিছুটা ছাইবর্ণ, তার ভিজা চুল থেকে মুখের উপর পানির ফোটা পড়ছে।

"হ্যাঁ, আমি ফেলতে পারি এবং ফেলে দেবই।"

"না", টুইংকল বললো। তার কণ্ঠ সহসা দুর্বল হয়ে গেছে। "এটা আমাদের বাড়ি। আমরা দু'জনই এর মালিক। মূর্তিটা আমাদের সম্পত্তির অংশ।" সে কাঁপছে। ভিজা শরীর থেকে গড়ানো পানি পায়ের গোড়ায় জড়ো হয়েছে। টুইংকলের ঠাণ্ডা লাগতে পারে ভেবে সে জানালা বন্ধ করতে গেল। এরপর সে লক্ষ করলো, তার নীল মুখ থেকে ঝরে পড়া পানির সাথে অশ্রুও ঝরছে।

"ওহ গড, টুইংকল, প্লিজ, আমি আসলে তা বুঝাতে চাইনি।" আগে সে কখনো তাকে কাঁদতে দেখেনি। তার চোখে এমন বেদনা কখনো দেখেনি।

টুইংকল সরে গেল না বা অশ্রু বন্ধ করার চেষ্টা করলো না, বরং তাকে অদ্ভুত শান্ত দেখাচ্ছিল। মুহূর্তের জন্যে সে তার চোখ বন্ধ করে আবার খুললো। তার মুখের উপর নীল আবরণের তুলনায় ফ্যাকাসে এবং অরক্ষিত। সঞ্জীব দুর্বল অনুভব করলো, যেন সে বেশিমাত্রায় পান করেছে অথবা সামান্য। টুইংকল সঞ্জীবের কাছে গেল। তার প্রায় ভিজা গাউনে ঢাকা হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করলো। সঞ্জীবের শার্ট ভিজে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত তাদের মাঝে সমঝোতা হলো যে, মূর্তিটি বাড়ির এক পাশে স্থাপন করা হবে, তাহলে পথচারীদের চোখে সহজে না পড়লেও যারা বাড়িতে আসবে তারা স্পষ্ট দেখতে পারবে।

পার্টিতে খাবারের মেনু খুব সাধারণ : শ্যাম্পেন, হাটফোর্ডের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট থেকে আনা সমুচা। বড় বড় ট্রেতে চিকেন রাইসের সাথে অ্যালমন্ড ও কমলার টুকরা। এর প্রস্তুতিতে সঞ্জীব সকাল ও বিকেলের উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করেছে। এর আগে সে কখনো এতো বেশি সংখ্যক লোককে আপ্যায়ন করেনি, সেজন্যে উদ্বিগ্ন ছিল যে, পানীয় যথেষ্ট হবে কি না এবং এক পর্যায়ে ফুরিয়ে গেলে আরেক কেস শ্যাম্পেন কিনতে হবে কি না। উদ্বেগ ও ব্যস্ততায় সে এক দফা রাইস পুড়িয়ে ফেলায় আরেকবার প্রস্তুত করতে হয়েছে। টুইংকল ফ্লোর ঝাড়ু দিয়েছে এবং সমুচা সাজাতে সাহায্য করেছে। অনুষ্ঠানের কারণে টুইংকলের হাত ও পায়ের নখ সাজাতে যাওয়ার কথা।

সঞ্জীব পরিকল্পনা করেছিল টুইংকলকে বলবে পার্টির জন্যে ফায়ার প্লেসের উপরের তাকের দর্শনীয় জিনিসগুলো সরিয়ে রাখবে কিনা। কিন্তু সঞ্জীব যখন স্নান করছিল তখন টুইংকল বের হয়ে গেছে। সে তিন ঘণ্টা বাইরে কাটানোর ফলে সঞ্জীবকে বাদবাকি সাফাইয়ের কাজ করতে হলো। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সারা বাড়ি ঝকমক করছিল। হার্টফোর্ড থেকে টুইংকলের কেনা সুগন্ধিযুক্ত মোমবাতির আলোতে তাকের নিদর্শনগুলোকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। ছোট টবে গেঁথে দেয়া আগরবাতি সুগন্ধ ছড়িয়ে পুড়ছে। প্রতিবার তাকের কাছ দিয়ে অতিক্রমের সময় সঞ্জীব চোখ তুলে লক্ষ করেছে যে, অতিথিরা খ্রিস্টান সাধুর সিরামিক মিনিয়েচার, মেরী ও জোসেফের আদলে তৈরি লবণ ও গোলমরিচের গুড়া রাখার বোতলের দিকে দেখছে। তবু সঞ্জীব আশা করছে যে, তারা ঘরের জানালা, উজ্জ্বল ফ্লোর, মনোরম বাঁকা সিঁড়ির প্রশংসা করবে শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অথবা সমুচায় চাটনি লাগাতে লাগাতে।

পার্টিতে প্রথমে উপস্থিত হয়েছে তার প্রতিষ্ঠানের নতুন কনস্যালট্যান্ট ডগলাস ও তার গার্লফ্রেন্ড নোরা। দু'জনই লম্বা এবং সোনালি চুলের অধিকারী। চোখে ম্যাচ করা তারের ফ্রেমের চশমা এবং গায়ে দীর্ঘ কালো ওভারকোট। নোরা একটি

কালো হ্যাট পরেছে, হ্যাটের উপরে লাগানো চোখা পালক, তার মুখের ভাবের সঙ্গে অনেকটা মিলানো। তার বাম হাত ডগলাসের হাতের সাথে যুক্ত। ডান হাতে একটি কগন্যাকের বোতল, গলায় লাল রিবন পেঁচানো। বোতল সে টুইংকলের হাতে দিলো।

ডগলাস মন্তব্য করলো "চমৎকার লন, সঞ্জীব। আমাদের লন পরিষ্কার করতেও এরকম একটি আঁচড়া লাগবে সুইটি। সেটা অবশ্যই ..."

"আমার স্ত্রী তনিমা।"

"আমাকে টুইংকল বলে ডেকো।"

"কি সুন্দর ব্যতিক্রমী নাম", নোরা মন্তব্য করলো।

টুইংকল কাঁধ ঝাঁকালো। "তেমন ব্যতিক্রমী নয় মোটেই। বোম্বেতে ডিম্পল কাপাডিয়া নামে একজন অভিনেত্রী আছেন। তার একটি বোনের নাম সিম্পল।"

ডগলাস এবং নোরা একসাথে তাদের চোখ তুলে, আস্তে আস্তে মাথা ঝুঁকাতে লাগলো, যেন অসম্ভব নামটি তার কাছে স্থান করে নিয়েছে। "তোমার সাথে সাক্ষাতে আমরা আনন্দিত, টুইংকল।"

"নিজেরাই শ্যাম্পেন ঢেলে নাও, পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে।"

"আশা করি আমার প্রশ্নে তুমি কিছু মনে করো নি", ডগলাস বললো। "আমি বাইরে মূর্তিটা দেখেছি, তোমরা কি খ্রিস্টান? আমি তো জানি, তোমরা ইন্ডিয়ান।"

"ভারতেও খ্রিস্টান আছে", সঞ্জীব বললো। "কিন্তু আমরা খ্রিস্টান নই।"

"তোমার পরনের জামা আমার খুব পছন্দ হয়েছে", নোরা টুইংকলকে বললো।

"আর তোমার হ্যাটের প্রশংসা করি আমি।"

আবার বেল বেজে উঠলো, আবার, আবার। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাড়ি ভরে উঠলো গুঞ্জনে, কথাবার্তায় এবং অপরিচিত সুবাসে। মহিলারা পরেছে হিলওয়ালা জুতা ও লম্বা মোজা এবং কালো ক্রিপ ও শিফন কাপড়ের খাটো পোশাক। তারা তাদের কোট সঞ্জীবের হাতে দেয়ার পর সে সযত্নে সেগুলো সুপরিসর আলমারির হ্যাঙ্গারে রেখে দিচ্ছিল, যদিও টুইংকল অতিথিদের বলেছিল খোলা জায়গায় তাদের জিনিসপত্র রাখতে। কিছু ভারতীয় মহিলা সুন্দর শাড়ি পরে এসেছে, সোনালি সুতার কাজ করা আঁচল ভাঁজ করে কাঁধের উপর ছড়ানো। পুরুষেরা পরেছে জ্যাকেট এবং টাই এবং লেবুগন্ধী আফটার শেভ লোশন লাগিয়ে এসেছে। লোকজন এক রুম থেকে আরেক রুমে যাচ্ছিল, তাদের আনা উপহার সামগ্রী চেরী কাঠে তৈরি দীর্ঘ টেবিলে স্তূপ হয়েছে।

সঞ্জীব বিস্মিত হয়ে ভাবলো যে তার জন্যে, এই বাড়ির জন্যে এবং তার স্ত্রীর জন্যে আগত সকলের কি মনোযোগ। আরেকবার তার জীবনে এ ধরনের কিছু ঘটেছিল, সেটি তার বিয়ের দিনে। কিন্তু কোনভাবে এ অনুষ্ঠান ভিন্ন ধরনের। কারণ আমন্ত্রিত লোকজন তার পরিবারের নয়, যারা ঘটনাচক্রে তার সাথে পরিচিত এবং এক অর্থে তার কাছে কোন দায়বদ্ধতা নেই। সকলে তাকে

অভিনন্দন জানালো। তার এক সহকর্মী লেস্টার ভবিষদ্বাণী করেছে যে, সঞ্জীব আগামী দু'মাসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছে। অতিথিরা সমুচা খেতে খেতে সদ্য রং করা ছাদ ও দেয়াল, ঝুলানো গাছ, জানালা, জয়পুর থেকে আনা সিল্ক পেইন্টিং এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো। সবকিছুর উপর তারা প্রশংসা করলো টুইংকলের, তার চমৎকার সালোয়ার কামিজের, মাথার উপর আটকানো সাদা গোলাপ পাঁপড়ির একটি মালা এবং গলায় একটি মুক্তার নেকলেস, যার মধ্যখানে একটি উজ্জ্বল নীল মণি বসানো। টুইংকলের বাছাই করা জ্যাজ রেকর্ড বাজছে, অতিথিরা টুইংকলের চপলতায় হাসছে, তাকে ঘিরে ধরে মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে অনেকে। আর সঞ্জীব দেখছে ওভেনে সমুচাগুলো যথাযথভাবে গরম থাকছে কিনা, কারো গ্লাসে বরফ তুলে দিচ্ছে এবং বেশ কসরত করে শ্যাম্পেনের বোতল খুলছে এবং বারবার ব্যাখ্যা করছে যে সে খ্রিস্টান নয়। টুইংকল ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপে আমন্ত্রিতদের উপরে নিয়ে যাচ্ছে, লন দেখাচ্ছে। হাত পিছনে বেঁধে বিজয়ীর মতো টুইংকল এক সময় বললো, "আপনাদের বন্ধু আমার পড়ার ঘর একটি পোস্টার দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে।"

সঞ্জীব কিচেনে গেল, সেখানে কেউ নেই। সে ট্রে থেকে চিকেনের একটি টুকরা আঙুল দিয়ে তুলে খেলো। কারণ তার মনে হয়েছে যে, কেউ তাকে দেখছে না। দ্বিতীয় টুকরা খেয়ে সে জিনের বোতলে মুখ লাগিয়ে মুখের চিকেনের স্বাদ গলা দিয়ে নামিয়ে দিল।

"দারুণ বাড়ি, চমৎকার খাবার" এনেসথিওলজিস্ট সুনীল কিচেনে ঢুকে বললো কাগজের প্লেট থেকে চামচ দিয়ে খাবার মুখে তুলতে তুলতে। "শ্যাম্পেন কি আরো আছে?"

"তোমার বউটা যা পেয়েছো, দারুণ", প্রবাল যোগ করলেন পিছন থেকে। ইয়েল ইউনিভার্সিটিতে সে ফিজিক্সের প্রফেসর, অবিবাহিত, মুহূর্তের জন্যে সঞ্জীব শূন্যদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো এবং লজ্জায় আরক্তিম হলো। একবার এক ডিনার পার্টিতে প্রবাল বলে উঠেছিল যে, সোফিয়া লোরেন দারুন এবং অ্যান্দ্রে হেপবার্ণের ব্যাপারেও বলেছিল একই কথা। "ওর কি কোন বোন আছে?" সুনীল ট্রে থেকে একটি কিসমিস তুলে নিল। "তার ডাক নাম কি লিটল স্টার?"

দু'জনই হেসে উঠলো এবং ট্রে থেকে আরো রাইস নিয়ে খেতে শুরু করলো। সঞ্জীব বেসমেন্টে গেল পানীয়ের আরো বোতল আনতে। কয়েক মিনিটের জন্যে সে সিঁড়িতে থামলো। স্যাঁতসেঁতে, শীতল নীরবতার মধ্যে সে এক বাক্স শ্যাম্পেনের বোতল বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে আছে। উপরে পার্টি জমজমাট। বোতলগুলো সে ডাইনিং টেবিলের উপর রাখলো।

সে লিভিং রুমে টুইংকলকে বলতে শুনলো, "হ্যাঁ, সবকিছু, এগুলো আমরা বাড়িতেই পেয়েছি, সাধারণত ব্যবহার করা হয় না, এমন জায়গা থেকে। আমরা এখনো খুঁজে ফিরছি।"

"সত্যিই!"

"হ্যাঁ, আমাদের প্রতিদিন যেন গুপ্তধন সন্ধানের মতো। খুবই মজার, ভগবানই কেবল জানেন, আমরা আর কি খুঁজে পাবো।"

এভাবেই ব্যাপারটা শুরু হলো। যেন অনুচ্চারিত চুক্তি বলে পুরো পার্টি উজ্জীবিত হয়ে প্রতিটি রুমে অনুসন্ধান করলো। নিজেরাই তারা ড্রয়ার খুলছে, চেয়ার, কুশনের নিচে দেখছে, পর্দার আড়ালে উঁকি দিচ্ছে, শেলফ থেকে বই সরিয়ে রাখছে, সবাই ছুটাছুটি করছে, কথা বলছে, সিঁড়ি দিয়ে উপর নিচ করছে, "আমরা চিলেকোঠা কখনো খুঁজে দেখিনি", টুইংকল হঠাৎ বলে উঠলো। অতএব সবাই চিলেকোঠার দিকে ছুটলো।

"আমরা কি করে ওখানে উঠবো?"

"করিডোর বরাবর সিলিং এর কোথাও একটি মই আছে।"

সঞ্জীব ক্লান্তভাবে অতিথিদের অনুসরণ করছে মইটা কোথায় তা দেখিয়ে দিতে। কিন্তু টুইংকল ইতোমধ্যে নিজেই মই খুঁজে পেয়েছে। "ইউরেকা।" চিৎকার করে বললো সে।

ডগলাস সিঁড়ির মুখে দরজার শিকলটা খুললো। তার মুখ জ্বলজ্বল করছে এবং নোরার পালকওয়ালা হ্যাট এখন তার মাথায়। এক এক করে অতিথিরা অদৃশ্য হলো। পুরুষরা মহিলাদের হাইহিল জুতা পরে সরু মই এর ধাপে পা রাখতে সহায়তা করছে, ভারতীয় মহিলারা তাদের শাড়ির আঁচল কাঁধ থেকে নামিয়ে কোমরে পেঁচিয়ে নিয়েছে। মহিলাদের পর উঠলো পুরুষরা। দ্রুত অদৃশ্য হলো সবাই। সঞ্জীব একা সিঁড়ির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। তারা মাথার উপর পায়ের শব্দ। তাদের সাথে যোগ দেয়ার কোন আগ্রহ নেই তার। তার ভয় হচ্ছে যে, সিলিং ভেঙ্গে পড়ে কিনা। মুহূর্তের জন্যে সে কল্পনা করলো সবগুলো মাতাল, সুগন্ধি মাখা শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে, জড়াজড়ি করছে তার চারপাশে। সে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনলো, এরপর উঠলো এলোমেলো হাসির শব্দের ঢেউ। কোনকিছু পতনের শব্দ হলো, কোন কিছু ভাঙ্গার শব্দ। একটি ট্রাংক সম্পর্কে তাদেরকে কথা বলতে শুনলো। মনে হলো ট্রাংকটি খোলার প্রাণপণ চেষ্টায় লিপ্ত তারা। ট্রাংকের উপর বিকারগ্রস্তের মতো আঘাত করছে তারা।

সে ভাবলো, হয়তো টুইংকল তাকে ডাকবে সহযোগিতার জন্যে। কিন্তু তাকে ডাকা হলো না। সে করিডোরের দিকে তাকালো। শ্যাম্পেনের গ্লাসের উপর, অর্ধেক খাওয়া সমুচা, লিপস্টিক লাগা ন্যাপকিন নজরে পড়লো। যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এরপর সে লক্ষ করলো যে, টুইংকল তাড়াহুড়োর কারণে জুতা ছেড়ে গেছে। মই গোড়ায় পড়ে আছে কালো চামড়ার জুতা, গলফ স্টিকের মাথার মতো হিল, সামনের দিকটা খোলা এবং জুতার মাঝখানে সামান্য মাটি লাগা সিল্কের লেবেল। বেডরুমের দরজার সামনে সে জুতা জোড়া রাখলো, যাতে চিলেকোঠা থেকে নামার সময় কেউ তার জুতা মাড়িয়ে না দেয়।

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে কিছু একটা ধীরে ধীরে খোলার শব্দ শুনলো সঞ্জীব। উচ্চ কণ্ঠগুলো সহসা মৃদু গুঞ্জনে পরিণত হলো। সঞ্জীবের মনে হলো বাড়িতে সে একা। গান শেষ হয়ে গেছে এবং সে মনোনিবেশ করলে রেফ্রিজারেটরের মৃদু শব্দ, বাইরে গাছের পাতা ঝরার শব্দ এবং জানালায় গাছের ডালের ঘর্ষণের শব্দ শুনতে পাবে। সে হাত দিয়ে এক ঝটকায় মইটা সরিয়ে সিলিং এ তুলে রাখতে পারে। তাহলে লোকগুলোর নিচে নামার কোন সুযোগ আর থাকবে না, যদি সে শিকল খুলে তাদের ঢুকতে না দেয়। তার মাথায় যা এলো সে ভাবলো বিনা বাধায়। টুইংকলের সংগৃহীত সব নিদর্শন সে গার্বেজ ব্যাগে তুলে গাড়িতে করে আবর্জনার স্তূপে ফেলে আসতে পারে। কান্নারত যীশুর পোস্টার ছিঁড়ে ফেলতে পারে এবং একটি হাঁতুড়ি দিয়ে কুমারী মেরীর মূর্তিটা ভেঙ্গে ফেলতে পারে। এরপর সে আবার ফিরে আসবে শূন্য বাড়িতে, খুব সহজে এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহৃত কাপ ও প্লেটগুলো পরিষ্কার করে গ্লাসে জিনটনিক নিয়ে বসবে এবং এক প্লেট রাইস নিয়ে সদ্য আনা বাকের সঙ্গীত শুনবে কভারের লিখাগুলো পড়বে সঙ্গীতের কথা ভালো করে বুঝার জন্যে। মইটি একটু নাড়া দিয়ে দেখলো সে, কিন্তু ফ্লোরে শক্ত করে আটকে আছে। সরাতে হলে একটু শক্তি খাটাতে হবে।

"মাই গড, আমার একটি সিগারেট প্রয়োজন" টুইংকল উপর থেকে চিৎকার করলো।

সঞ্জীব অনুভব করলো যে তার গলার পিছনে গিট শক্ত হচ্ছে। অবসন্ন বোধ করলো সে। তার শুয়ে পড়া প্রয়োজন। বেডরুমের দিকে এগুলো সে, কিন্তু টুইংকলের জুতা দরজার সামনে দেখে থেমে গেল। সে ভেবেছিল টুইংকল ভুলে জুতা পায়ে পরেনি, কিন্তু এখন তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। তারা এ বাড়িতে একসাথে আসার পর টুইংকলের স্খলিত পায়ে খোলা সিঁড়ি দিয়ে নামার কথা ভাবলো। তার প্রতিক্রিয়া আরো প্রবল হলো যখন সে বুঝতে পারলো যে, টুইংকল বাথরুমে যাচ্ছে আরো একবার লিপস্টিক লাগাতে। এক পর্যায়ে সে লোকদের কোটগুলো হাতে তুলে দিতে লাগলো এবং শেষ অতিথি চলে যাবার পর সে চেরীকাঠের টেবিলের পাশে দাঁড়ালো অতিথিদের আনা উপহার সামগ্রীর প্যাকেট খোলা শুরু করতে। তাদের বিয়ের আগেও তার মধ্যে একই ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। যখন টুইংকলের সাথে ফোনে কথা শেষ করার পর সে ফোন রেখে দিয়েছে অথবা এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি চালিয়ে ফিরে এসেছে অথবা বিস্ময় নিয়ে ভেবেছে যে, আকাশে উড্ডীয়মান বিমানের কোন্‌টিতে টুইংকল আছে।

"সঞ্জীব তুমি কি এসবে বিশ্বাস করো না।" পিছন থেকে সে আবির্ভূত হয়ে মাথার উপর দু'হাত তুলে বললো। তার খোলা কাঁধে ঘাম জমেছে। এখনো সে দৃষ্টি থেকে কিছু লুকিয়ে রেখেছে।

"তুমি কি পেয়েছো, টুইংকল?" কেউ জানতে চাইলো।

"যেতে দাও।"

সঞ্জীব দেখলো, টুইংকলের দু'হাতে যীশুর রৌপ্যনির্মিত আবক্ষ মূর্তি। মূর্তির মাথা তার নিজের মাথার তিনগুণ বড়। নাকের উপর রোমানদের মতো একটি দাগ, সুন্দর কোকড়ানো চুল, যা এসে ঠেকেছে কাঁধের হাঁড়ের উপর। কপাল সুপ্রশস্ত, যা বাড়িতে প্রাপ্ত যীশুর সব ক'টি মূর্তি ও ছবির অনুরূপ। মূর্তিটির মুখভঙ্গি অত্যন্ত দৃঢ়, যেন তার অনুসারীদের ব্যাপারে আস্থাশীল, তার বন্ধ ঠোঁট কামনাময় ও পরিপুষ্ট। নোরার পালকওয়ালা হ্যাটটি মূর্তির মাথায়। টুইংকল যখন নামছিল, তখন সঞ্জীব তার নামতে সহায়তা করতে কোমর জড়িয়ে ধরেছিল এবং সে তাকে ছেড়ে দেয়ার পর টুইংকল মূর্তিটা ফ্লোরের উপর রাখে। এর ওজন ত্রিশ পাউন্ড হবে। অন্যেরা ধীরে ধীরে নেমে আসে। অনুসন্ধানে সবাই ক্লান্ত। কেউ কেউ নিচে নেমেই নতুন করে পানীয়ের সন্ধান করে।

টুইংকল দম নিয়ে চোখ তুলে দু'হাতের আঙুল বাঁধলো। "এটা তাকের উপর রাখলে তুমি কি খুব রাগ করবে ? শুধু আজকের রাতটা ? আমি জানি তুমি এসব ঘৃণা করো।" আসলে সে এসব ঘৃণা করে। এর ব্যাপকতা বিশালত্বে তার ঘৃণা এবং এর নিখুঁত মসৃণ উপরিভাগ ও অনস্বীকার্য মূল্যকে সে ঘৃণা করে। তার বাড়িতে এটা ছিল ভাবতেও তার ঘৃণা হয় এবং সে এর মালিক তাও সে ভাবতে চায় না। তারা অন্য যে নিদর্শনগুলো পেয়েছে এটি সেগুলোর মতো নয়। এর মাঝে মর্যাদা পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু সে বিশ্বিত হলো যে, মূর্তির এই গুণগুলোই তার ঘৃণাকে আরো প্রবল করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, টুইংকল যে এটিকে ভালোবাসে তা জানার পরই তার ঘৃণা বেড়েছে।

"কাল থেকে এটি আমার পড়ার ঘরে রাখবো।" টুইংকল বললো। "আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

সঞ্জীব জানে, টুইংকল কখনো এটিকে তার পড়ার ঘরে রাখবে না। তাদের একত্রে থাকার অবশিষ্ট দিনগুলোতে সে এটিকে তাকের কেন্দ্রস্থলে রাখবে, আর দু'পাশে থাকবে অন্যসব খ্রিস্টীয় নিদর্শন। যখনই তারা লোকদের আমন্ত্রণ জানাবে, তখনই টুইংকল তাদেরকে বলবে যে, কিভাবে সে এটি পেয়েছে এবং তারা তার কথা শুনে প্রশংসা করবে। সে তার মাথায় মোচড়ানো গোলাপ পাঁপড়ি লক্ষ করলো এবং গলায় নীল মণি ও পায়ের নখে টকটকে লাল পলিশ। তার মনে হলো এসবের কারণেই প্রবাল ভেবেছে যে, সে দারুণ! জিন পান করে তার মাথা ধরেছে এবং মূর্তির ওজনে তার হাতে ব্যথা লাগছে। সে বললো, "তোমার জুতা বেডরুমে রেখেছি।"

"থ্যাংকস। কিন্তু পায়ের যন্ত্রণায় আমি মরে যাচ্ছি।" টুইংকল সঞ্জীবের কনুই এ মৃদু চাপ দিয়ে লিভিংরুমে চলে গেল। সঞ্জীব বিশাল রূপার মুখ তার পাঁজরের হাঁড়ের সাথে চেপে ধরলো। সে সতর্ক যাতে মূর্তির মাথার উপর থেকে পালকের হ্যাটটা পড়ে না যায়। এরপর সে অনুসরণ করলো টুইংকলকে।

বিবি হালদারের চিকিৎসা

উনত্রিশ বছরের জীবনের অধিকাংশ সময় জুড়ে বিবি হালদার এমন এক ব্যাধিতে ভুগেছে যা তার পরিবার, বন্ধু, খ্রিস্টান যাজক, হস্তরেখাবিদ, অবিবাহিতা নারী, রত্ন বিশেষজ্ঞ, গণক এবং আহম্মকদের পর্যন্ত বিভ্রান্ত করেছে। তাকে নিরাময় করতে আমাদের শহরের উদ্বিগ্ন সদস্যরা তার জন্যে সাতটি পবিত্র নদীর পবিত্র পানি এনে দিয়েছে। রাতের বেলায় যখন আমরা তার চিৎকার ও বেদনাকাতর বিলাপ শুনতাম, যখন তার কবজি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হতো এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে ওষুদের প্রলেপ লাগিয়ে দেয়া হতো, তখন আমরা তার জন্যে প্রার্থনা করতাম। বিজ্ঞ লোকজন তার কপালে ইউক্যালিপটাস মলম ঢলে দিতো এবং মুখমণ্ডলে পাছগাছড়া সিদ্ধ ধোঁয়া দিতো। এক অন্ধ খ্রিস্টানের পরামর্শে একবার তাকে ট্রেনযোগে সেন্ট ও শহীদদের কবরগাত্র চুম্বন করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। বদদৃষ্টি থেকে তাকে রক্ষা করতে তার হাতে এবং গলায় বেঁধে দেয়া হয়েছে মন্ত্রপুত মাদুলি। তার আঙুলে শোভা পাচ্ছে মাঙ্গলিক পাথর।

ডাক্তাররা তার যে চিকিৎসা করেছেন তাতে তার অবস্থা শুধু মন্দের দিকেই গেছে। সময়ের ব্যবধানে তাকে অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ এবং আয়ুর্বেদিক অর্থাৎ সব ধরনের চিকিৎসা কৌশল দ্বারা নিরাময়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের উপদেশ অফুরন্ত। এক্সরে, বিভিন্ন পরীক্ষা, হৃদযন্ত্রের অবস্থা নির্ণয় এবং ইঞ্জেকশন দেয়ার পর অনেকে পরামর্শ দিয়েছে শুধু তার ওজন বৃদ্ধি করতে। অন্যেরা বলেছে ওজন কমাতে। একজন যদি তাকে ভোরের পর ঘুমাতে নিষেধ করে, তাহলে আরেকজন পরামর্শ দেয় তাকে দুপুর পর্যন্ত শুয়ে থাকতে। একজন তাকে বলে শীর্ষাসন করার জন্যে, তাহলে আরেকজন বলে সুনির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে সারাদিন বেদের শ্লোক পাঠ করতে। একজন পরামর্শ দিয়েছে যে, "সম্মোহনের জন্যে তাকে কলকাতা নিয়ে যান"—যা এখনো অন্যেরা দেয়নি। এক বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে দৌড়াদৌড়ির পর্যায়ে তাকে রসুন বর্জন, বিভিন্ন মাত্রায় তেতো জিনিস গলাধঃকরণ, ডাবের পানি পান, দুধে হাঁসের কাঁচা ডিম মিশিয়ে ভক্ষণের ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়েছে। সংক্ষেপে বিবি হালদারের জীবন একের পর এক নিষ্ফল প্রতিষেধকের লড়াই এ পরিণত হয়েছিল।

তার অসুস্থতার প্রকৃতি কোন পূর্বাভাস না দিয়েই তার পৃথিবীকে একটি রং বিহীন চারতলা ভবনে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিল, যে ভবনের তৃতীয় তলায় ভাড়া

নিয়ে থাকতো তার চাইতে বয়সে বড় সম্পর্কিত এক ভাই ও তার স্ত্রী। যে কোন সময়ে তার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং যখন তখন অশ্রাব্য প্রলাপ শুরু করায় তাকে কারো তত্ত্বাবধান ছাড়া রাস্তা অতিক্রম করতে বা ট্রামে উঠতে দেয়া হতো না। সারাদিন আমাদের ভবনের ছাদে স্টোর রুমে বসে থাকতো, জায়গাটি এমন যে, কেউ সেখানে বসতে পারলেও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এর সঙ্গে একটি পায়খানা আছে, দরজায় পর্দা লাগানো এবং গ্রিল ছাড়া একটি জানালাও আছে। এছাড়া দরজার কাঠ দিয়ে তৈরি কয়েকটি তাক আছে দেয়ালে। সেখানে একটি বর্গাকৃতির চটের উপর পা আড়াআড়ি করে বসে আমাদের চত্বরের মুখেই তার সম্পর্কিত ভাই এর কসমেটিকসের দোকানের জিনিসপত্রের হিসাব করতো। এজন্যে বিবি হালদারের কোন আয় হতো না, কিন্তু তাকে খাবার, অন্যান্য জিনিসপত্র এবং প্রতি অক্টোবরের ছুটির সময় সস্তা দর্জি দিয়ে তার পোশাক তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণের কাপড় দেয়া হতো। রাতে সে তার ভাই এর বাসায় একটি ভাঁজ করা ক্যাম্প খাটে ঘুমাতো।

সকালে বিবি পুরনো প্লাস্টিকের চটি পায়ে ছাদের স্টোর রুমে যেতো। তার পরনের জামা, হাঁটুর কয়েক ইঞ্চি নিচে নেমেই থেমে গেছে, যে দৈর্ঘ্যের জামা আমরা পনের বছরে উন্নীত হবার পর কখনো পরিনি। তার পায়ের নিম্নভাগ লোমহীন এবং সারা পায়ে ছড়িয়ে আছে ঘা এর দাগ। ভাগ্যকে সে দোষারোপ করে এবং তার দুর্ভাগ্যের জন্যে দায়ী গ্রহকে গালি দেয়, যখন আমরা ছাদে কাপড় মেলে দিতে অথবা মাছ কুটতে যাই। সে সুন্দরী নয়। উপরের ঠোঁট পাতলা, দাঁত ছোট। কথা বলার সময় মাড়ি প্রকট হয়ে উঠে। "বলি, একটি মেয়ের জন্যে কি তার জীবনের সেরা সময়ে বছরের পর বছর এভাবে অবহেলিত অবস্থায় কোন ভবিষ্যতের আশা বাদ দিয়ে জিনিসপত্রের লেবেল ও দামের হিসাব করা কি ভালো দেখায়?" তার কণ্ঠ স্বাভাবিকের চাইতে উঁচু, মনে হবে যে, কোন বধির লোকের সঙ্গে সে কথা বলছে। "নব বিবাহিতা এবং কোন মাকে যদি আমি হিংসা করি তাহলে কি আমার খুব অন্যায় হবে। যারা তাদের সংসার এবং দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত। আমার চোখে কাজল লাগাই বা চুলে সুগন্ধী দেই তাহলে দোষটা কোথায়? একটি শিশুকে লালনপালন, তাকে কোন্‌টা মিষ্টি, কোন্‌টা টক এবং ভালো-মন্দ শিখাতে চাওয়া কি অন্যায়?"

প্রতিদিন সে আমাদেরকে তার বঞ্চনার নানা কথা শোনায়, যতক্ষণ না এটি অনস্বীকার্যভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বিবির একজন পুরুষ মানুষের প্রয়োজন। সে একজন লোককে চায় কথা বলতে, তার নিরাপত্তার জন্যে এবং তাকে জীবনের সঠিক পথের দিশা দেয়ার জন্যে। আমাদের অন্যান্যের মতো সে রাতের খাবার পরিবেশন করতে চায়, চাকরদের বকতে চায় এবং তিন সপ্তাহ পরপর চাইনিজ বিউটি পার্লারে গিয়ে ভুরুর লোম তোলার জন্যে তার আলমারিতে আলাদা করে টাকা রাখতে চায়। আমাদেরকে পীড়াপীড়ি করে আমাদের নিয়ের বিস্তারিত বলার

জন্যে, অলংকার, অতিথি এবং বাসর শয্যায় ঝুলানো গোলাপের মালার সুগন্ধি ছড়ানোর কথা। তার পীড়াপীড়িতে যখন প্রজাপতি খচিত আমাদের ছবির এলবাম দেখিয়েছি, সে প্রতিটি ছবি মনোযোগ দিয়ে দেখে বিবাহ অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা সাজাতে চেষ্টা করেছে : আগুনে ঘি দেয়া, মালা বদল, সিঁদুর মাখানো মাছ, ঝিনুক ও রৌপ্য মুদ্রা রাখা কুলা। মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখে আমাদের কারো মুখ টেনে বলবে, "কতো অতিথি এসেছে। আমার জীবনে যখন এমন ঘটবে তখন তোমাদের সবাইকে থাকতে হবে।"

তার প্রত্যাশা তাকে এতো মারাত্মকভাবে সংক্রমিত করতে শুরু করেছিল যে একটি স্বামীর জন্যে তার কল্পনা, যাকে আবর্তিত করে তার সকল আশ দানা বেঁধেছে তা মাঝে মাঝে তাকে গুরুতর অসুস্থ করে তুলতো। স্টোর রুমের ফ্লোরে ছড়িয়ে থাকা পাউডারের কৌটা, পিনের বাক্সগুলোর সাথেই যেন সে এলেমেলো কথা বলতো "আমি কখনো আমার পা দুধে ডোবাবো না। আমার মুখে কেউ চন্দনের প্রলেপ লাগাবে না। কে আমার গায়ে হলুদ লাগিয়ে দেবে? আমার নাম কোনদিন বিয়ের কার্ডে লাল কালিতে ছাপা হবে না।"

তার আপন মনে কথা বলা , অনুভূতির প্রকাশ এবং বিরক্তি জ্বরের প্রলাপের মতো ছিল। তার তিক্ততার চরম অবস্থায় আমরা তার গায়ে শাল জড়িয়ে দিতাম, ট্যাপ থেকে পানি নিয়ে তার মুখ ধুয়ে দিতাম এবং গ্লাসে করে দই ও গোলাপজল এনে দিতাম। কোন কোন মুহূর্তে যখন সে কিছুটা শান্ত হয় তখন আমরা তাকে উৎসাহিত করি আমাদের সাথে দর্জির কাছে গিয়ে তার ব্লাউজ ও পেটিকোট সেলাই করতে। এতে তার কাছে পরিবেশের পরিবর্তন হতে পারে এবং আমরা এও আশা করি যে এর ফলে তার বৈবাহিক সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাকে বলি, "হাড়িপাতিল ধোয়ার মেয়েদের মতো জামাকাপড় পরা কোন মেয়েকেই কোন পুরুষ পছন্দ করবে না। তুমি কি চাও যে, তোমার জন্যে কেনা কাপড়গুলো পোকায় কাটুক?" সে মুখ গোমড়া করে রাখে, প্রতিবাদ করে এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। "কোথায় যাবো আমি, কার জন্যে পোশাক পরবো?" সে প্রশ্ন করে। "সে আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে, চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে, আমার জন্যে লেবুর শরবত, কাজুবাদাম কিনবে? তোমরাই বলো, এসব কি আমার চিন্তা করার কথা? আমি কখনো সুস্থ হবো না এবং কোনদিন আমার বিয়ে হবে না।"

তখন বিবি হালদারকে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেয়া হলো, সবচেয়ে কার্যকর অথবা ভয়াবহ চিকিৎসা। এক সন্ধ্যায় খেতে যাওয়ার পথে তিনতলার সিঁড়ির মুখে নিজের মুষ্টি পাকিয়ে, ফ্লোরে পদাঘাত করে সে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। তার গোঙানির শব্দ সিঁড়িঘরে প্রতিধ্বনি তুললো এবং আমরা ঘর থেকে দৌড়াদৌড়ি করে বের হলাম তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে। আমাদের কারো হাতে হাতপাখা, মিছরির টুকরা এবং মাথায় দেয়ার জন্যে ফ্রিজে রাখা পানি ভর্তি গ্লাস। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা সিঁড়ির রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

আমাদের চাকরদের পাঠানো হলো তার ভাইকে ডেকে আনতে। দোকান থেকে হালদারের আসতে দশ মিনিট লাগলো, তার মুখ লালবর্ণ ধারণ করেছে। আমাদেরকে হৈচৈ বন্ধ করতে বলে সে তাকে একটি রিকশায় তুলে পলিক্লিনিকের দিকে রওয়ানা হলো। সেখানে রক্তের বেশ কিছু পরীক্ষার পর বিবির চিকিৎসার দায়িত্বে নিয়োজিত ডাক্তার রায় দিলেন যে, শুধুমাত্র বিয়ে দিলেই সে সুস্থ হয়ে যাবে।

আমাদের জানালার বারের মধ্য দিয়ে, আমাদের কাপড় শুকানোর রশি অতিক্রম করে, কবুতরের বিষ্ঠায় আচ্ছাদিত আমাদের ছাদের উপর পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়লো। পরদিন সকালের মধ্যে তিনজন হস্তরেখাবিদ পৃথক পৃথক ভাবে বিবির হাত পরীক্ষা করে বললেন যে, কোন সন্দেহ নেই যে, মিলনের অনিবার্যতায় তার ত্বকে সুড়সুড়ির সৃষ্টি হয়েছে। অপ্রীতিকর গুঞ্জন শুরু হলো। ঠাকুরমা'রা বিয়ের একটি শুভদিনের তালাশে পঞ্জিকা ঘাটতে শুরু করলেন। এরপর দিনের পর দিন আমরা স্কুলে যাওয়া আসার পথে, লন্ড্রিতে কাপড় তুলতে গিয়ে, রেশন দোকানের লাইনে দাঁড়িয়ে এ নিয়ে ফিসফিস করতাম। দৃশ্যত বিবির জন্যে যা প্রয়োজন ছিল সে লক্ষ্যে কিছু তৎপরতাও চললো। প্রথমবারের মতো আমরা তার জামার নিচে শারীরিক বৈশিষ্টের কথা কল্পনা করলাম এবং একজন পুরুষের জন্যে তৃপ্তিদায়ক কি উপহার দিতে পারে তার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করলাম। প্রথম বারের মতো তার চেহারার স্বচ্ছতা, টানা আয়ত চোখ এবং তার হাতের সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ করলাম। "ওরা বলছে বিয়েই একমাত্র ভরসা। এটা নাকি মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার পরিণতি। তারা আরো বলে..." আমরা একটু থামি, আমাদের মাঝে লজ্জার ভাব—"স্বামী সঙ্গই তার রক্তকে প্রশমিত করতে পারবে।"

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বিবি হালদার এই ব্যবস্থাপত্রে উৎফুল্ল আনন্দিত এবং সাথে সাথে দাম্পত্য জীবনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। তার সম্পর্কিত ভাই হালদারের দোকানের বাতিল নেলপলিশ দিয়ে পায়ের নখ রঞ্জিত করলো এবং কনুই এ ক্রিম মাখলো। স্টোর রুমে নতুন মালের চালানকে অগ্রাহ্য করে সে আমাদের কাছে বিভিন্ন খাবার রান্নার প্রণালি জেনে নিতে শুরু করলো। সেমাই এর পায়েস, পেঁপের তরকারি এবং দোকানের মালের তালিকা লিপিবদ্ধ করার খাতায় কাঁচা অক্ষরে লিখে রাখলো। সে অতিথিদের তালিকা, মিষ্টির তালিকা, হানিমুন করতে সে যে সব জায়গায় যেতে আগ্রহী তার তালিকা তৈরি করলো। ঠোঁট মসৃণ রাখতে সে গ্লিসারিন ব্যবহার করছিল, ওজন কমাতে মিষ্টি খাওয়া বন্ধ করেছে। একদিন সে আমাদের একজনকে বললো তার সাথে দর্জির দোকানে যেতে, যে তার সালোয়ার কামিজ সেলাই করে রেখেছে বর্ষা মৌসুমের উপযোগী ডিজাইনে। অলংকারের দোকানে প্রতিটি কাউন্টারে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, কাউন্টারের কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখে টিয়ারা, নেকলেসের ডিজাইন সম্পর্কে

আমাদের মতামত জানতে চাইছিল। শাড়ির দোকানে সে একটি লাল বেনারসি ও একটি নীল রং এর শাড়ি এবং শেষে গাঁদা ফুলের রং এর শাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, "বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রথমে আমি এই শাড়িটি পরবো, তারপর এটি এবং শেষে এটি।"

কিন্তু হালদার ও তার স্ত্রীর চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিবির কল্পনা এবং আমাদের আশংকার সাথে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে তারা স্বাভাবিকভাবে তাদের ব্যবসা করে যাচ্ছিলেন। তাদের ওই দোকানের আয়তন একটি ওয়ার্ডরোবের চাইতে বেশি বড় নয়। তিনদিকের দেয়ালের তাকে কসমেটিকস ঠাসা : মেহেদির টিউব, চুলে দেয়ার তেল, নানা রং এর পাথর এবং ফর্সা হওয়ার ক্রিম। বিবির স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে কেউ জানতে চাইলে হালদার বলতেন, "ওসব অপ্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণের মতো সময় আমাদের নেই। যে রোগ সারবে না, তা সহ্য করতেই হবে। বিবির কারণে আমাদেরকে যথেষ্ট উদ্বেগে থাকতে হয়, অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়, পরিবারের সুনামও যথেষ্ট হানি হয়েছে।" ছোট কাঁচের কাউন্টারের পিছনে স্বামীর পিছনে দাঁড়ানো হালদারের স্ত্রী তার স্তনের উপর খোলা ত্বকে বাতাস করতে করতে স্বামীর কথায় সায় দেন। বেশ মোটা মহিলা তিনি, পাউডার মাখার পরও মুখ যথেষ্ট ফ্যাকাশে এবং গলায় ভাঁজ পড়েছে মোটা হওয়ার কারণে। "তাছাড়া কে ওকে বিয়ে করবে?" মেয়েটি কোনকিছু সম্পর্কে কিছুই জানে না, গেঁয়োদের মতো কথা বলে। বয়স ত্রিশ হয়ে গেছে, অথচ কয়লার চুলাটা পর্যন্ত জ্বালাতে পারে না। ভাত রাঁধতে জানে না, মেথি ও জিরার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। তোমরাই ভাবো যে, একজন মানুষকে সে কি করে রেঁধে খাওয়াবে!"

তাদের এমন বলার যুক্তি ছিল। কিন্তু বিবিকে কখনো একজন মহিলা হিসেবে তার করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়নি। অসুস্থতা তাকে অধিকাংশ বাস্তব বিষয় সম্পর্কে অন্ধকারে রেখেছে। হালদারের স্ত্রীর নিশ্চিত বিশ্বাস যে প্রেতাত্মা স্বয়ং তার উপর ভর করেছে, সেজন্যে তিনি বিবিকে আগুন ও আগুনের শিখা থেকে দূরে রেখেছেন। চারটি ভিন্ন স্থানে পিনে আটকে দেয়া ছাড়া তাকে শাড়ি পরতে শিখানো হয়নি। অথবা তাকে বালিশের কভারে এমব্রয়ডারি করাতে বা শাল বুনতে শিখানো হয়নি। তাকে টেলিভিশন দেখতেও দেয়া হতো না। কারণ হালদার মনে করতেন যে, ইলেকট্রনিক সামগ্রী তাকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে। অতএব পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহ অথবা বিনোদন সম্পর্কে সে পুরোপুরি অজ্ঞ ছিল। নবম শ্রেণীর পরই তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। বিবির দিকে তাকিয়ে আমরা হালদারকে একটি পাত্র খুঁজে দেখার জন্যে অনুরোধ করলাম। "সে তো এছাড়া আর কিছু চায় না।" আমরা যুক্তি দিলাম। কিন্তু হালদার ও তার স্ত্রী কোন যুক্তি মানতে নারাজ। বিবির প্রতি তাদের বদ্ধমূল বিদ্বেষ যেন তাদের ঠোঁটের সাথে যুক্ত হয়েই আছে, তা তার দোকান থেকে জিনিস

কিনলে যে সুতা দিয়ে বেঁধে দেয় তার চাইতেও চিকন। যখন আমরা বললাম যে, নতুন চিকিৎসা একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত তখন তারা প্রতিবাদ করলো। "বিবির মধ্যে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং নিজের প্রতি কোন ধরনের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই। অন্যের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্যে সে তার অসুস্থতাকে কাজে লাগায়। সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তাকে ব্যস্ত রাখা এবং সে যেসব সমস্যার সৃষ্টি করছে তা থেকে দূরে থাকা।

"আপনারা ওর বিয়ে দিচ্ছেন না কেন? তা হলে সে তো অন্তত আপনাদের থেকে দূরে থাকবে।"

"আমরা ব্যবসা করে যে লাভটুকু করি তা অপচয় করতে বলছেন? অতিথি সৎকার, চুড়ি বানানোর ফরমাশ দেয়া, খাটবিছানা কেনা এবং যৌতুকের অর্থ সংগ্রহ করবো?"

কিন্তু বিবির মাথায় জেদ চেপেছে। একদিন সকালে আমাদের তত্ত্বাবধানে হালকা নীল রং এর লেস লাগানো শিফন শাড়ি ও আমাদের ধার দেয়া কাঁচ লাগানো স্যান্ডেল পরে সে সাবধানে পা ফেলে হালদারের দোকানে গেল এবং তাকে কোন ফটোগ্রাফারের দোকানে নিয়ে যেতে, যাতে বিবাহযোগ্যা কনেদের মতো তার ছবি তুলে সম্ভাব্য পাত্রদের বাড়িতে পাঠানো যায়। আমরা বারান্দা থেকে তাকে লক্ষ করছিলাম। তার বগলতলায় ইতোমধ্যে ঘামে ভিজে কালো দাগের সৃষ্টি হয়েছে। "এক্সরে করা ছাড়া আমার কোন ছবি তোলা হয়নি" সে অস্থিরভাবে বললো। "হবু পাত্রদের জানা প্রয়োজন যে আমি দেখতে কেমন।" কিন্তু হালদার তাকে স্টুডিওতে নিয়ে যেতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, তাকে দেখতে যাদের ইচ্ছা হবে তারা নিজেরাই এসে দেখে যেতে পারে। বিবি কাঁদলো, বিলাপ করলো এবং খরিদ্দারদের শাসালো। হালদার তাকে বললেন যে, সে তার ব্যবসার জন্যে ক্ষতিকর, বড় রকমের দায় এবং লোকসানের কারণ। এই শহরে কে আছে যে, এসব জানার জন্যে তার একটা ছবি প্রয়োজন? পরদিন বিবি দোকানের জিনিসের তালিকা করা বন্ধ করে হালদার ও তার স্ত্রীর বিবেচনাহীন কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি বয়ান করলো। "প্রতি রোববার হালদার তার থুতনির লোম তুলে দেয়। টাকাপয়সা বাক্সে তালাবদ্ধ করে রাখে।" পড়শিদের শোনার সুবিধার্থে সে ছাদে অহংকারীর মতো পায়চারি করতে করতে চিৎকার করে কথা বলছিল। তার প্রতিটি ঘোষণার সাথে দর্শক শ্রোতা বেড়ে চলছিল। "স্নান করার সময় হালদারের স্ত্রী মটরদানার গুড়া হাতে মাখে তার রং ফর্সা হবে আশায়। তার ডান পায়ের তৃতীয় আঙুল নেই। বিকেলে বিশ্রামের নামে বিছানায় তাদের বেশি সময় কাটানোর কারণ সে স্বামীকে তৃপ্তি দিতে পারে না।"

বিবিকে শান্ত করতে হালদার শহরের সংবাদপত্রে একটি এক লাইনের বিজ্ঞাপন দিল পাত্র আকৃষ্ট করার জন্যে : "অস্থিরচিত্তের পাত্রী, উচ্চতা ১৫২ সেন্টিমিটার, স্বামী পেতে আগ্রহী।" আমাদের তরুণদের অভিভাবকদের কাছে

সম্ভাব্য কনের পরিচয় গোপন ছিল না এবং কোন পরিবার এ ধরনের অনিবার্য ঝুঁকি কাঁধে নিতে আগ্রহী হতে পারে না। কে তাদের দোষ দেবে? অনেকে গুজব ছড়ালো যে, বিবি নিজের সাথে দ্রুত কিন্তু দুর্বোধ্য এক ভাষায় কথা বলে এবং ঘুমালে কোন স্বপ্ন দেখে না। এমনকি বাজারে আমাদের হাতব্যাগ সেলাই করে দেয় যে নিঃসঙ্গ চার দাঁত সর্বস্ব বিপত্নীক লোকটি তাকেও এই প্রস্তাবে রাজি করানো যাবে না। তবুও বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে ফেরাতে আমরা তাকে একজন স্ত্রীর করণীয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতে শুরু করলাম। "ভাতের হাঁড়ির মতো মুখ করে রাখলে কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। পুরুষেরা চায়, তুমি তার সাথে সোহাগের ভাব দেখাও।" সম্ভাব্য স্বামীর মোকাবিলার ঘটনা অনুশীলনের জন্যে আমরা তাকে পীড়াপীড়ি করি কাছাকাছি কোন পুরুষের সাথে ছোটখাট আলাপে লিপ্ত হতে। পানিওয়ালা যখন তার সব কাজ শেষ করে বিবির পাত্র ভরে দিতে আসে, তখন আমরা তাকে বলতে নির্দেশ দেই, "তুমি কেমন আছো?" যখন কয়লাওয়ালা ছাদে এসে ঝুড়ি থেকে কয়লা ঢেলে দেয়, তখন আমরা তাকে পরামর্শ দেই কয়লাওয়ালার প্রতি তাকিয়ে হাসতে এবং আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু একটা মন্তব্য করতে। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা মনে করে আমরা তাকে সাক্ষাৎকারের জন্যে প্রস্তুত করি। "অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাত্র আসে বাবা অথবা মা, ঠাকুর দাদা অথবা ঠাকুর মা এবং কাকা অথবা কাকিকে সাথে নিয়ে। তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে, বেশ কিছু প্রশ্ন করবে। তোমার পায়ের তলা পরীক্ষা করবে, তোমার চুলের বেনি কতোটা মোটা তা দেখবে। তারা তোমাকে প্রধানমন্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করবে, কবিতা আবৃতি করতে বলবে, আধ ডজন ডিম দিয়ে কিভাবে এক ডজন ক্ষুধার্ত লোককে খাওয়ানো সম্ভব তা জানতে চাইবে।"

বিজ্ঞাপন দেয়ার পর দু'মাস কেটে গেলেও একটি সাড়া পর্যন্ত পাওয়া গেল না। হালদার এবং তার স্ত্রী তাদের যুক্তির যথার্থতা অনুভব করলেন। "এখন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, সে বিয়ের জন্যে অনুপযুক্ত। কোন সুস্থ মনের মানুষ ওকে স্পর্শ করবে বলে এখনো আপনারা ভাবেন?"

বিবির বাবা মারা যাওয়ার পূর্বে তার জন্যে পরিস্থিতি এতোটা খারাপ ছিল না। বিবিকে জন্ম দেয়ার পর তার মা আর জীবিত ছিলেন না। বিবির বাবা তার জীবনের শেষ বছরগুলোতেও প্রাইমারি স্কুলে অংকের শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন এবং বিবির অসুস্থতার কারণ নির্ণয় করে আশায় বুক বেঁধেছিলেন অধ্যবসায়ীর মতো। যখনই আমরা বিবির অবস্থা সম্পর্কে জানতে জানতে চাইতাম, তখন তিনি বলতেন, "প্রত্যেক সমস্যারই কোন না কোন সমাধান আছে।" বিবিকে তিনি আশ্বস্ত করতেন। একটা সময় পর্যন্ত আমাদের সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের ডাক্তারদের কাছে চিঠি লিখতেন। বিকেলে লাইব্রেরিতে গিয়ে তার মেয়ের মতো রোগীদের ব্যাপারে কি লিখা আছে তা পড়তেন। গৃহদেবতাকে সন্তুষ্ট রাখতে শুক্রবার মাংস খাওয়া বন্ধ করে

দিয়েছিলেন। একপর্যায়ে তিনি শিক্ষকতাও ছেড়ে দিয়েছিলেন। নিজের রুমেই কিছু ছাত্রকে পড়াতেন। এসবের কারণ, যাতে তিনি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। কিন্তু যৌবনে যিনি মনে মনে হিসাব কষে গণিতের জটিল সমস্যা সমাধান করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন, তিনিই তার কন্যার ব্যাধির রহস্য সমাধান করতে সক্ষম হতে পারলেন না। তার সব কাজ, সব প্রমাণ দিয়ে একটি মাত্র সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলেন যে, শীতকালের চাইতে গ্রীষ্মে বিবির অসুস্থতা ঘন ঘন হয় এবং সব মিলিয়ে সে প্রায় পঁচিশবার বড় ধরনের সংক্রমণের শিকার হয়েছে। তিনি মেয়ের অসুস্থতার লক্ষণ ও তাকে শান্ত করার উপায় সম্পর্কিত একটি চার্ট তৈরি করে পড়শিদের মধ্যে বিতরণ করলেন, যা একসময় সবাই হারিয়ে ফেলেছে অথবা আমাদের বাচ্চারা নৌকা বানিয়ে খেলেছে অথবা উল্টো পৃষ্ঠায় মুদি দোকানের জিনিসের হিসাব লিখেছে।

তাকে সঙ্গ দেয়া, তার দুঃখে সান্ত্বনা দেয়া, মাঝে মাঝে তার উপর লক্ষ রাখার বাইরে পরিস্থিতির উন্নতি করতে আমরা খুব সামান্যই করতে পেরেছি। এমন নিঃসঙ্গতা, নিরানন্দ অবস্থা উপলব্ধি করা আমার কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। কোন কোন দিন বিকেলে বিশ্রাম নেয়ার পর আমরা তার চুল আঁচড়ে দিতাম এবং স্মরণ করিয়ে দিতাম যে, সে যেন সিঁথি এক জায়গায় না কেটে, স্থান বদলে সিঁথি কাটে। তা না হলে সিঁথি প্রশস্ত হয়ে যাবে। তার অনুরোধে আমরা তার ঠোঁটের উপরে ও গলায় পাউডার মেখে দিতাম, ভুরু কালো করে দিতাম এবং পুকুর পাড়ে বেড়াতে নিয়ে যেতাম, যেখানে আমাদের ছেলেরা বিকেলে ক্রিকেট খেলতো। এখনো সে কোন পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ।

"আমার অসুস্থতা ছাড়া আমার স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভালো।" ফুটপাতের পাশে বেঞ্চে বসে নারীপুরুষদের হাত ধরাধরি করে হাঁটতে দেখে সে বলতো। "আমার কোনদিন ঠাণ্ডা লাগেনি বা জ্বর হয়নি। কখনো আমি জন্ডিসে আক্রান্ত হইনি। কখনো আমার পেটব্যথা বা বদহজম হয়নি।" মাঝেমধ্যে আমরা তাকে আগুনে পোড়া ভূট্টা কিনে দেই অথবা দু'পয়সা দামের মিষ্টি। বিবিকে সান্ত্বনা দেই, যখন কোন পুরুষ তার দিকে ফিরে তাকিয়েছে বলে সে মনে করে। আমরা রসিকতা করি ও তার কথার সাথে সায় দেই। কিন্তু তার উপর আমাদের কোন দায়দায়িত্ব নেই এবং সেজন্যে আমাদের একান্ত মুহূর্তগুলোতে আমরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে বিবেচনা করি।

নভেম্বর মাসে আমরা জানতে পারলাম যে, হালদারের স্ত্রী সন্তান সম্ভবা। সেদিন সকালে স্টোর রুমে বসে বিবি কাঁদছিল। "সে বলে যে, আমি নাকি বসন্ত রোগের মতো সংক্রামক। সে বলে, আমি ওর বাচ্চাকে নষ্ট করে দেব।" প্রবলভাবে দম নিচ্ছিল সে। তার দৃষ্টি দেয়ালের একটি গর্তের দিকে নিবদ্ধ।

"আমার কপালে কি আছে?" তখনো সংবাদপত্রে দেয়া বিজ্ঞাপনের কোন সাড়া আসেনি।" আমার উপর শাস্তির মাত্রা বেশি হয়ে যাচ্ছে না যে, আমি এই অভিশাপ একা সয়ে যাচ্ছি? আরেকজনকে সংক্রমিত করার দোষও কি আমার উপরই পড়বে?" হালদারের বাড়িতে মতানৈক্য বাড়লো। তার স্ত্রী নিশ্চিত যে, বিবির উপস্থিতি তার গর্ভের সন্তানের উপর কুপ্রভাব ফেলবে। তার স্ফীত উদরের উপর সে শাল জড়িয়ে রাখতে শুরু করলো। বাথরুমে বিবিকে পৃথক সাবান ও তোয়ালে দেয়া হলো। পরিচারিকার কথা অনুযায়ী, বিবির খাওয়ার প্লেট অন্যগুলোর সাথে ধোয়া হতো না।

একদিন বিকেলে কোন কথা অথবা পূর্বাভাস ছাড়াই ঘটনাটা আবার ঘটলো। পুকুরের পাড়ে ফুটপাতের উপর পড়ে গেল বিবি। সে কাঁপছিল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কাটছিল। মুহূর্তের মধ্যে কাঁপতে থাকা মেয়েটির চারপাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল, সম্ভাব্য উপায়ে সবাই তাকে সহায়তা করতে আগ্রহী। সোডার বোতল খোলার চিমটাটি তার কম্পমান শরীরের নিচে রাখা হলো। শসা বিক্রেতা তার মুঠির মাঝে শসার টুকরা ঢুকানোর চেষ্টা করলো। আমাদের একজন পুকুর থেকে পানি তুলে তার উপর ঢাললো। আরেকজন সুগন্ধিযুক্ত রুমাল দিয়ে তার মুখ মুছে দিল। কাঁঠাল বিক্রেতা বিবির মাথা ধরে ছিল, কারণ প্রবলভাবে তার মাথা এদিক সেদিক করছিল এবং আখের রস বিক্রেতা তার মাছি তাড়ানোর হাত পাখা দিয়ে সম্ভাব্য সব দিক থেকে প্রবলভাবে বাতাস করছিল।

"ভিড়ের মধ্যে কি কেউ ডাক্তার আছেন?"

"খেয়াল করো তার জিহবা যাতে গলার মধ্যে চলে না যায়।"

"কেউ কি হালদারকে খবর দিয়েছে?"

"তার শরীর কয়লার আগুনের চাইতেও উত্তপ্ত।

আমাদের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার কাঁপুনি থামানো যাচ্ছিল না, বিরূপতা ও মানসিক যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত বিবি দাঁতে আঘাতপ্রাপ্ত হলো, হাঁটুতে খিঁচুনির টান অনুভূত হলো। দু'মিনিটের বেশি সময় কেটে গেছে। আমরা তার অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন। ভেবে কূল পাচ্ছি না, কি করতে হবে।

"চামড়া!" একজন সহসা চিৎকার করলো। "ওকে চামড়ার গন্ধ শুকাতে হবে।" তখন আমাদের মনে পড়লো, আগের বার যখন এরকম হয়েছিল, তখন গরুর চামড়ায় তৈরি স্যান্ডেল তার নাকের নিচে ধরা হয়েছিল এবং তাতেই বিবি যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

"বিবি, কি হয়েছে? আমাদেরকে বলো, তোমার কি হয়েছে", বিবি চোখ খুললে আমরা জানতে চাইলাম।

"আমার গরম লাগছিল, আরো গরম। চোখের সামনে দিয়ে ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছিল। পৃথিবীটা কালো অন্ধকার হয়ে গেল। তোমরা কি দেখোনি?"

আমাদের স্বামীদের মধ্যে থেকে কয়েকজন তাকে বাড়ি নিয়ে গেল। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। শাঁখ বাজতে শুরু করেছে, ধূপের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। বিবি বিড়বিড় করলো, স্খলিত পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল, কিন্তু মুখে কিছু উচ্চারণ করলো। তার গালের এখানে সেখানে আঁচড়ের দাগ, চুল এলেমেলো হয়ে আছে, কনুই এ ময়লা লেগে আছে, সামনের একটি দাঁতের খানিকটা ভেঙ্গে গেছে। আমরা তার পিছে পিছে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে যাচ্ছিলাম। আমাদের বাচ্চাদের হাত ধরে রেখেছি।

তার একটি কম্বল এবং তাকে চেপে ধরে রাখা প্রয়োজন। এছাড়া ঘুমের একটি ট্যাবলেটও প্রয়োজন। তার দেখাশুনা করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যখন বাড়িতে পৌছলাম, তখন হালদার ও তার স্ত্রী বিবিকে ঘরে প্রবেশ করতে দিতে রাজি হলো না।

"এ ধরনের মৃগীরোগীর সংস্পর্শে সন্তান সম্ভবা মায়ের জন্যে মারাত্মক স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির ব্যাপার।" হালদার বললেন। সে রাতে বিবি স্টোররুমেই ঘুমালো।

জুন মাসের শেষ দিকে হালদারের স্ত্রী এক কন্যাসন্তান প্রসব করেছে। ততোদিনে বিবি আবার তৃতীয় তলায় শুতে শুরু করেছিল, যদিও তার ক্যাম্প খাটটি বিছানো হতো করিডোরে এবং তাকে সরাসরি শিশুকে স্পর্শ করতে দেয়া হতো না। প্রতিদিন তারা তাকে ছাদে পাঠিয়ে দিতো দুপুরের খাবারের পূর্ব পর্যন্ত জিনিসের তালিকা তৈরি করতে। দুপুরে হালদার তাকে সকালের বিক্রির রসিদ বইটার সাথে এক থালা হলুদ মটরদানা দিয়ে যেতো খেতে। রাতে সে সিঁড়িঘরে একা বসে দুধ ও রুটি খেতো। আরেকবার সে আক্রান্ত হলো, এবং এরপর আরো একবার। কিন্তু একবারও তাকে ডাক্তারের কাছে নেয় হলো না পরীক্ষার জন্যে।

আমরা আমাদের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে হালদার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এটা আমাদের সমস্যা নয় এবং এ নিয়ে আমাদের সাথে আর কোন কথা বলতে সরাসরি অস্বীকার করলো। আমাদের ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে আমরা হালদারের দোকান বাদ দিয়ে অন্যত্র কেনাকাটা শুরু করলাম; এছাড়া আমরা আর কিভাবে বদলা নিতে পারি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হালদারের শেলফের জিনিসপত্রে ধুলা জমতে শুরু করলো, লেবেল ধূসর বর্ণ ধারণ করলো এবং সুগন্ধি গন্ধহীন হয়ে গেল।

সন্ধ্যায় রাস্তা অতিক্রমের সময় দেখতাম, হালদার একা বসে আছে, তার স্যান্ডেল দিয়ে উড়ন্ত পোকা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। তার স্ত্রীকে প্রায় দেখাই যেত না। গৃহপরিচাকার মতে, সে এখনো শয্যাশায়ী এবং প্রসবজনিত জটিলতা দৃশ্যত বেড়েছে।

অক্টোবরের ছুটির প্রতিশ্রুতি নিয়ে শরৎ এলো এবং শহরে ব্যস্ততা বেড়ে গেল কেনাকাটায় এবং মওসুমের পরিকল্পনা নিয়ে। গাছে গাছে ঝুলানো মাইক্রোফোনে সিনেমার গান বাজতে শুরু করেছে। শপিং সেন্টার মার্কেট সর্বক্ষণ খোলা থাকে। আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্যে বেলুন এবং রঙিন ফিতা কিনে দিচ্ছি, মিষ্টি কিনে দিচ্ছি। সারা বছর যেসব আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি ট্যাক্সিযোগে তাদের বাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎ করছি। দিনগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে এবং সন্ধ্যায়ই ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। আমরা সোয়েটারে বোতাম লাগাচ্ছি এবং মোজা পায়ে দিচ্ছি। ঠাণ্ডা সহসা আমাদের গলায় চুলকানির মতো সৃষ্টি করলো। উষ্ণ পানিতে লবণ দিয়ে বাচ্চাদের গড়গড়া করাচ্ছি এবং গলায় মাফলার পেচিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এর মধ্যে হালদারের নবজাত শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লো।

মাঝরাতে একজন ডাক্তারকে ডাকা হলো এবং শিশুর জ্বরের তাপ কমাতে বলা হলো। হালদারের স্ত্রী কাতর কণ্ঠে বললো, "ওকে সারিয়ে দিন।" তার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে আমাদের সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। "আপনি যা চান আপনাকে তাই দিতে পারি, আপনি শুধু মেয়েটিকে ভালো করে তুলুন।" ডাক্তার শিশুকে গ্লুকোজ সেবন করাতে বললেন, এসপিরিন গুড়া করে পানিতে গুলিয়ে খাওয়াতে বললেন এবং তাদেরকে পরামর্শ দিলেন শিশুকে লেপের মধ্যে জড়িয়ে রাখতে।

পাঁচদিন পরও জ্বরের প্রকোপ কিছুমাত্র কমলো না।

"বিবির কারণেই এসব হচ্ছে" হালদারের স্ত্রী বিলাপ করছিল। "সে এজন্যে দায়ী, আমাদের শিশুকে সেই সংক্রমিত করেছে। আমাদের উচিত হয়নি তাকে আবার নিচে নামিয়ে আনা। তাকে আবার বাড়িতে ফিরে আসতে দেয়া উচিত হয়নি।"

অতএব বিবি রাতের বেলায় আবার স্টোররুমে শুতে শুরু করলো। স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে হালদার বিবির ক্যাম্প খাটটি পর্যন্ত ছাদে রেখে এলেন। সেই সাথে বিবির জিনিসপত্র রাখার ট্রাংকটিও ছাদে চলে এলো। তার খাবার সিঁড়ির উপরের ধাপে একটি চালনি দিয়ে ঢেকে রাখা হতো।

"আমি কিছু মনে করি না" বিবি আমাদের বলতো। "তাদের থেকে পৃথক থাকাই উত্তম, নিজের ঘর গড়ে তোলার জন্যেও ভালো।" ট্রাংক খুলে সে সাধারণ কিছু জামা, তার বাবার একটি বাঁধানো ছবি, সেলাই এর জিনিসপত্র, কিছু কাপড়ের টুকরা বের করে এবং স্টোর রুমের শূন্য সেলফগুলোতে সাজিয়ে রাখে। সপ্তাহের শেষ দিকে শিশুটি সেরে উঠলেও বিবিকে নিচে নামার জন্যে বলা হলো না। "তোমরা ভেবো না, এমন নয় যে, তারা আমাকে এখানে তালা বন্ধ করে রেখেছে।" আমাদেরকে সহজ করার চেষ্টা করে সে। "পৃথিবী শুরু হয়েছে সিঁড়ির নিচ থেকে। এখন আমার ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে জীবনকে আবিষ্কার করতে পারি।"

কিন্তু বাস্তবে সে বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা তাকে আমাদের সাথে পুকুর পাড়ে অথবা মন্দিরের সাজসজ্জা দেখার জন্যে যেতে বলতাম, সে

কিছুতেই যেতে চাইতো না। বলতো যে, সে স্টোর রুমের দরজায় টানানোর জন্যে একটি পর্দা সেলাই করছে। তার শরীরের ত্বক ছাই বর্ণ ধারণ করতে শুরু করেছে। তার জন্যে মুক্ত বায়ু প্রয়োজন। "তোমার স্বামী খুঁজে পাওয়ার কি হলো ?" আমরা বলতাম। "তুমি কি করে আশা করো যে, সারাদিন এখানে বসে একজন পুরুষ মানুষকে সুখী করতে পারবে ?"

কোনকিছুরই প্রভাব পড়ে না তার উপর।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে হালদার তার বিউটি শপের শেলফ থেকে সব অবিক্রিত জিনিসপত্র নামিয়ে বাক্সে ভরে স্টোররুমে রাখলো। তার ব্যবসা লাটে উঠাতে আমরা কমবেশি সফল হয়েছি। বছর শেষ হওয়ার আগে হালদার পরিবার একটি এনভেলাপে তিনশ টাকা ভরে বিবির দরজার নিচে ঠেলে দিয়ে লাপাত্তা হয়ে গেল। তাদের সম্পর্কে কোন খবরই পাওয়া গেল না।

আমাদের কাছে হায়দরাবাদে বিবির এক আত্মীয়ের ঠিকানা ছিল এবং পরিস্থিতি জানিয়ে আমরা সেখানে লিখলাম। প্রাপকের সন্ধান না পাওয়ায় চিঠি অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলো। শীতল সপ্তাহগুলো শুরু হওয়ার আগেই আমরা স্টোররুমের জানালা ঠিক করলাম, দরজার পাল্লায় টিনের পাত লাগিয়ে দিলাম, যাতে তার গোপনীয়তা রক্ষা পায়। একজন তাকে একটি কেরোসিনের ল্যাম্প দিলো, আরেকজন দিলো পুরনো মশারি ও একজোড়া মোজা। সুযোগ পেলেই আমরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতাম যে, আমরা তাকে ঘিরে আছি। কোন পরামর্শ বা যে কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলেই সে আমাদের কাছে চলে আসতে পারে। বিকেলের কিছু সময়ের জন্যে আমাদের বাচ্চাদের ছাদে খেলাতে পাঠাতাম, যাতে আরেকবার মৃগীতে আক্রান্ত হলে তারা আমাদের জানাতে পারে। কিন্তু প্রতি রাতে আমরা তাকে নিঃসঙ্গ ফেলে আসতাম।

কয়েক মাস এভাবে কাটলো। বিবি তার গভীর ও দীর্ঘ নীরবতার মাঝে ফিরে গেছে। আমরা পালা করে তাকে ভাত ও চা দিতাম। সে সামান্য পান করতো, অল্প খেতো, এবং এমন ভাব প্রকাশ করতে শুরু করলো যে, যা তার বিগত বছরগুলোর প্রকাশের সাথে মিলে না। গোধূলির সময় সে পাঁচিল বরাবর একবার বা দু'বার পায়চারি করতো, কিন্তু কখনোই ছাদ ত্যাগ করতো না। অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সে স্টোররুমে প্রবেশ করতো এবং কোন কারণেই বাইরে বের হতো না। আমরা তাকে আর বিরক্ত করতাম না। আমরা অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম যে, সে মারা যাচ্ছে কি না। অন্যেরা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে যে সে পুরোপুরি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে।

এপ্রিলের এক সকাল, যখন ছাদের উপর ডালের বড়ি শুকানোর উত্তাপ ফিরে এসেছে, তখন আমরা লক্ষ করলাম যে, কেউ ট্যাপের পাশে বমি করেছে। দ্বিতীয়

আরেকদিন সকালে একই অবস্থা লক্ষ করে আমরা বিবির দরজায় টোকা দিলাম। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে নিজেরাই দরজা খুলে ফেললাম। কারণ দরজায় কোন তালা লাগানো ছিল না।

আমরা তাকে ক্যাম্প খাটে শুয়ে থাকতে দেখলাম। সে প্রায় চার মাসের গর্ভবতী। সে বললো যে, তার কি ঘটেছে কিছুই মনে করতে পারে না। কে এটা করেছে কিছুতেই আমাদের বলবে না সে। আমরা তাকে গরম দুধ ও কিসমিস মিশিয়ে পায়েস তৈরি করে খাওয়ালাম। তবু সে তার গর্ভের জন্যে দায়ী পুরুষের নাম প্রকাশ করলো না। আমরা তার রুমে কোন আলামত খুঁজে পেতে তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু রুম পরিপাটি করে ঝাড়ু দেয়া, সাজানো। ক্যাম্পখাটের পাশে মেঝের উপর তার তালিকা তৈরির খাতা, একটি নতুন পৃষ্ঠা খোলা। তাতে কিছু নামের তালিকা।

পুরো মেয়াদ পর্যন্ত শিশুটি তার গর্ভে থাকলো এবং সেপ্টেম্বরের এক সন্ধ্যায় আমরা তার একটি পুত্র সন্তান প্রসবে সহায়তা করলাম। আমরা তাকে শিখালাম যে কি করে শিশুকে খাওয়াতে হবে, স্নান করাতে হবে এবং কিভাবে ঘুম পাড়াতে হবে। আমরা তাকে অয়েলক্লথ কিনে দিলাম, তার সঞ্চিত কাপড় দিয়ে কাঁথা, বালিশের কভার সেলাই এ সহায়তা করলাম। এক মাসের মধ্যে বিবি তার প্রসবজনিত অসুস্থতা কাটিয়ে উঠলো এবং হালদার যে টাকা রেখে গিয়েছিল তা দিয়ে স্টোররুমে চুনকাম করিয়ে নিলো, দরজা ও জানালায় ভালা লাগানোর ব্যবস্থা করলো। এরপর সে শেলফ থেকে দোকানের জিনিসপত্রের বাক্সগুলো নামিয়ে অর্ধেক দামে সব বেঁচে দিলো। সে আমাদেরকে বলেছে লোকদের কাছে জিনিসগুলো বিক্রির কথা জানাতে এবং আমরা তা করেছি। বিবির কাছ থেকে আমরা সাবান ও কাজল কিনেছি, চিরুনি, পাউডার কিনেছি। শেষ জিনিসটা বিক্রি করে সে ট্যাক্সিযোগে পাইকারি বাজারে গিয়ে শেলফ পুনরায় ভরার জন্যে নতুন জিনিস কিনলো। এভাবেই সে তার ছেলেটিকে লালন করেছে এবং স্টোররুম থেকে তার ব্যবসা চালিয়েছে। আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করেছি তাকে সাহায্য করতে। পরবর্তী বছরগুলোতে আমরা শুধু অবাক হয়ে ভেবেছি যে, এ শহরের কে তার মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে। আমাদের কয়েকজন চাকরকে জেরা করা হলো। চায়ের দোকানে, বাস স্ট্যান্ডে সম্ভাব্য সন্দেহ ভাজনকে প্রশ্ন করে ছেড়ে দেয়া হলো। কিন্তু এ নিয়ে একটি তদন্ত চালানোর মতো প্রশ্ন কখনো উঠেনি। আমাদের জানামতে সে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় এবং শেষ মহাদেশ

১৯৬৪ সালে আমি বাণিজ্য ডিগ্রির একটি সার্টিফিকেট এবং আমার নামে তখনকার সময়ের দশ ডলারের সমমানের অর্থ নিয়ে ভারত ত্যাগ করেছিলাম। পরবর্তী তিনটি সপ্তাহ ধরে এসএস রোমা নামে একটি ইটালীয় কার্গো জাহাজে ইঞ্জিনের পাশেই তৃতীয় শ্রেণীর একটি কেবিনে করে আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবশেষে ইংল্যান্ডে পৌছলাম। উত্তর লন্ডনের ফিনসবেরী পার্ক এলাকায় একটি বাড়িতে উঠলাম। যে বাড়িতে আমার মতো কর্পদকশূন্য অবিবাহিত বাঙালিরাই বাস করতো। কমপক্ষে এক ডজন এবং কখনো আরো বেশি। সকলেই কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশুনা এবং বিদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত হতাম এবং চলার ব্যয় জোগাতে লাইব্রেরিতে কাজ করতাম। আমরা এক রুমে তিন চারজন করে থাকতাম। একটি বরফশীতল বাথরুম ব্যবহার করতাম সবাই মিলে, পালা করে ডিমের তরকারি রান্না করে সংবাদপত্র দিয়ে ঢাকা টেবিলে বসে হাত দিয়ে খেতাম। চাকুরি ছাড়া আমাদের কিছু দায়িত্ব ছিল। উইকএন্ডে আমরা খালি পায়ে, ফিতাওয়ালা পাজামা পরে থাকতাম, চা পান করতাম, রথম্যান সিগারেট টানতাম অথবা লর্ডসে ক্রিকেট খেলা দেখতে যেতাম। কোন কোন উইকএন্ডে আমাদের বাড়িতে আরো বাঙালির আগমন ঘটতো, যাদের সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছিল সবজির দোকানে অথবা পাতাল রেলে। সেদিন আমরা আরো বেশি ডিমের তরকারি রাঁধি এবং একটি গ্রুনডিগ ক্যাসেট প্লেয়ারে মুকেশের গান শুনি এবং আমাদের ময়লা বাসনকোসন বাথটাবে রেখে পরিষ্কার করি। যখন তখন বাড়ি থেকে কেউ না কেউ চলে যায় কোন মহিলার সঙ্গে থাকার জন্যে, যাকে কলকাতায় তার পরিবার ঠিক করে রেখেছে সে বিয়ে করবে বলে। ১৯৬৯ সালে আমার বয়স যখন ছত্রিশ বছর আমার নিজের বিয়েও ঠিক হলো। প্রায় একই সময়ে আমেরিকায় একটি পূর্ণকালীন চাকুরির প্রস্তাব পেলাম আমি, এমআইটির এক লাইব্রেরির প্রসেসিং বিভাগে। স্ত্রীকে সহায়তা করার মতো যথেষ্ট আকর্ষণীয় বেতনের চাকুরি এবং বিশ্ববিখ্যাত একটি বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে চাকুরি দিয়ে সম্মানিত করছে। অতএব আমি ষষ্ঠ অগ্রাধিকারের গ্রিনকার্ড সংগ্রহ করে আমেরিকা যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

ইতোমধ্যে আমার কাছে বিমানে ভ্রমণের মতো পর্যাপ্ত অর্থ ছিল। প্রথমে আমি কলকাতায়, বিয়ে করার জন্যে এবং এক সপ্তাহ পর বোস্টনে চলে গেলাম আমার নতুন চাকুরি শুরু করতে। লন্ডন ছাড়ার আগে টটেনহ্যাম কোর্ট রোড থেকে সাত শিলিং ছয় পেন্সে কেনা 'দ্য স্টুডেন্ট গাইড টু নর্থ আমেরিকা' নামে পেপার ব্যাক বইটি দেখছিলাম বিমানে বসে। যদিও আমি এখন আর ছাত্র নই। তবু আমি সবসময় হিসাব করে চলতাম। আমি বইটি পাঠ করে জানতে পারলাম যে, আমেরিকানরা রাস্তার ডান দিকে গাড়ি চালায়, বাম দিকে নয় এবং লিফটকে বলে 'এলিভেটর' এবং ফোন এনগেজড থাকলে বলে 'বিজি'। গাইডবুক পড়ে মনে হলো, "উত্তর আমেরিকার জীবন ব্রিটেনের জীবনের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে, যা তুমি শিগ্‌গির জানতে পারবে। সেখানে সবাই ভাবে তাকে শীর্ষে উঠতে হবে। ইংলিশ চায়ের কাপ আশা করো না।" বোস্টন বন্দরের উপর দিয়ে বিমান অবতরণ করতে শুরু করলো, পাইলট আবহাওয়ার অবস্থা ও সময়ের ঘোষণা দিলেন এবং দু'জন আমেরিকান নভোচারী চাঁদে অবতরণ করেছেন বলে প্রেসিডেন্ট নিক্সন দিনটিকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বেশ কিছু যাত্রী আনন্দ ধ্বনি করে উঠলো। "ঈশ্বর আমেরিকার প্রতি সদয় হোক।" একজন চিৎকার করে উঠলো। বিমানে আসনের সারি পেরিয়ে দেখলাম, এক মহিলা প্রার্থনা করছে।

কেমব্রিজের সেন্ট্রাল স্কোয়ারে ওয়াইএমসিএ হোস্টেলে আমার প্রথম রাত যাপন করলাম। গাইডবুকে উল্লেখ করা স্বল্প ব্যয়ে থাকার ব্যবস্থা। এমআইটি থেকে পায়ে হাঁটা দূরত্ব, পোস্ট অফিসও কাছেই এবং পিউরিটি সুপ্রীম নামে একটি সুপার মার্কেট। রুমে একটি শয্যা, একটি টেবিল এবং এক পাশের দেয়ালে কাঠের ক্রস ঝুলানো। দরজায় সতর্ক বাণী লিখা আছে যে, রুমে রান্না করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। খোলা জানালা দিয়ে ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ দেখা যায়; অন্যতম প্রধান রাস্তার দু'দিকে প্রচুর যানবাহন চলাচল করছে। গাড়ির হর্ণ, দীর্ঘস্থায়ী শব্দ একের পর এক ভেসে আসছে। সাইরেনের আলো ও আওয়াজে অসংখ্য জরুরি অবস্থার ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে, শব্দ তুলে বাসের বহর অতিক্রম করছে, থামার পর এবং চলার আগে হিশ্‌শ্‌ শব্দ তুলে দরজা খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। সারারাত এমন চললো। শব্দ অব্যাহতভাবে বিক্ষিপ্ত অবস্থা এনে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে দম বন্ধ করার মতো অবস্থা। শব্দ অনুভব করছি আমার পাঁজরের গভীরে, ঠিক এসএস রোমায় ইঞ্জিনের ভয়াবহ শব্দ শুনে যেমন লেগেছিল। কিন্তু এখানে পরিত্রাণ লাভের জন্যে জাহাজের মতো ডেক নেই, আত্মাকে প্রশমিত করার মতো উত্তাল উজ্জ্বল সমুদ্র নেই, আমার মুখকে শীতল করার জন্যে মৃদুমন্দ বাতাস নেই এবং কথা বলার মতো কেউ নেই। পাজামা পরা অবস্থায় ওয়াইএমসিএ'র অন্ধকার করিডোরে হাঁটার মতো অবস্থা নেই আমার, আমি খুব ক্লান্ত। অতএব আমি টেবিলের পাশে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলাম ক্যামব্রিজের সিটি হল ও ছোটছোট একসারি দোকানের দিকে। সকালে আমার কর্মস্থল ডিউই লাইব্রেরিতে

গিয়ে রিপোর্ট করলাম। মেমোরিয়াল ড্রাইভের পাশে ধূসর দুর্গের মতো ভবন। আমি ব্যাংকে একটি একাউন্ট খুললাম, পোস্ট অফিস বক্স ভাড়া নিলাম এবং উলওয়ার্থ দোকান থেকে একটি প্লাস্টিকের গামলা ও একটি চামচ কিনলাম, লন্ডন থেকে আমি এ দোকানের কথা জানি। পিউরিটি সুপ্রীম সুপার মার্কেটে গিয়ে পণ্য সাজিয়ে রাখার তাকের সারির পাশ দিয়ে ঘুরলাম, আউন্স থেকে গ্রামের হিসাব করলাম, ইংল্যান্ডের জিনিসপত্রের দামের সাথে আমেরিকায় দামের তুলনা করলাম। শেষে আমি এক প্যাকেট দুধ এবং এক প্যাকেট কর্ণফ্লেকস কিনলাম। এটিই ছিল আমেরিকায় আমার প্রথম খাবার। টেবিলে বসে খেলাম। হ্যামবার্গার বা হটডগের চাইতে এটিই ভালো। ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ এর কফি শপে আমার সাধ্যের মধ্যে এগুলোই কিনতে পারি আমি। তাছাড়া, তখনো আমি গরুর মাংস খেতে শুরু করিনি। এমনকি প্যাকেটে দুধ কেনাও আমার জন্যে নতুন। লন্ডনে প্রতিদিন সকালে দুধের বোতল দরজায় রেখে দিয়ে যেত।

এক সপ্তাহের মধ্যে আমি কমবেশি খাপ খাইয়ে নিলাম। আমি সকালে ও রাতে কর্ণফ্লেকস ও দুধ খাই এবং বৈচিত্র্য আনতে কিছু কলা কিনে সেগুলো পাতলা করে কেটে মিশিয়ে নিয়ে চামচ দিয়ে তুলে খাই। এছাড়া আমি টি ব্যাগ ও একটি ফ্লাস্ক কিনেছি। উলওয়ার্থের সেলসম্যান সেটিকে উল্লেখ করেছে থার্মোস বলে। সে আরো বলেছে যে, ফ্লাস্ক ব্যবহৃত হয় হুইস্কি রাখতে, সে বস্তুটি আমি কখনো গ্রহণ করিনি। প্রতিদিন সকালে কাজে যাওয়ার সময় আমি কফি শপ থেকে এক কাপ চায়ের দামের বিনিময়ে ফুটন্ত পানিতে ফ্লাস্ক ভরে নেই এবং সারা দিনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে চার কাপ চা বানিয়ে পান করি। আমি দুধের একটি বড় প্যাকেট কিনে জানালার পাশে ছায়াযুক্ত অংশে রেখে যাই। ওয়াইএমসিএ'র আরেকজন বাসিন্দাকে ওরকম করতে দেখেছি বলে আমি তা করি। সময় কাটাতে সন্ধ্যায় নিচতলার একটি সুপরিসর কক্ষে গিয়ে আমি 'বোস্টন গ্লোব' পত্রিকা পাঠ করি। আমি প্রতিটি নিবন্ধ এবং বিজ্ঞাপন পাঠ করি, যাতে সবকিছুর সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে পারি। আমার চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়লে আমি রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু ভালো ঘুম হয় না। প্রতিরাতে আমাকে জানালা খোলা রাখতে হয়, রুমে বাতাস প্রবেশের এই একটিই পথ। শব্দ অসহনীয়। আমি বিছানায় শুয়ে দু'কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাখি। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে কান থেকে হাত পড়ে যায় এবং যানবাহনের শব্দে আবার আমি জেগে উঠি। জানালার পাশে কবুতরের পালক পড়ে থাকে এবং এক সন্ধ্যায় কর্নফ্লেকসে দুধ ঢালার পর চেখে দেখলাম দুধ টক হয়ে গেছে। তবু আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো যে, অন্তত ছয় সপ্তাহ আমাকে ওয়াইএমসিএ হোস্টেলে থাকতে হবে, যতক্ষণ না আমার স্ত্রীর পাসপোর্ট ও গ্রিনকার্ড হাতে পাই। সে পৌঁছলেই আমি একটি উপযুক্ত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেব

এবং মাঝে মাঝেই আমি সংবাদপত্রে ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপনগুলো পড়ি অথবা লাঞ্চ ব্রেকের সময় এমআইটির হাউজিং অফিসে গিয়ে আমার আওতার মধ্যে কেমন অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া যায় তা দেখি। এভাবেই আমি আবিষ্কার করতে সক্ষম হলাম যে, এক শান্ত রাস্তার পাশে এখনই উঠার মতো একটি রুম খালি আছে, বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে যে, ভাড়া সপ্তাহে আট ডলার। আমার গাইড বুকে ফোন নম্বর টুকে নিয়ে একটি পে ফোন থেকে ডায়াল করলাম। এজন্যে আমাকে উপযুক্ত মুদ্রা বাছাই করতে হয়েছে, যার সাথে এখনো আমি ভালোভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারিনি। শিলিং এর চাইতে ছোট ও হালকা এবং পয়সার চেয়ে ভারি ও উজ্জ্বল। "হু ইজ স্পিকিং?" একজন মহিলা জানতে চাইলেন। তার কণ্ঠ মোটা এবং উঁচু।

"ইয়েস, গুড আফটারনুন ম্যাডাম", আমি ভাড়ার জন্যে রুমটি সম্পর্কে জানতে ফোন করেছি।

"হার্ভার্ড না টেক থেকে?"

"মাফ করবেন, আপনার কথা বুঝতে পারিনি।"

"আপনি কি হার্ভার্ডের না টেক এর?"

ধারনা করলাম যে 'টেক' বলতে মহিলা ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি' বুঝাতে চেয়েছেন। আমি উত্তর দিলাম, "আমি ডিউট লাইব্রেরিতে কাজ করি", সাথে যোগ করলাম "টেক এ।"

"আমি শুধু হার্ভার্ড অথবা টেক এর ছাত্রদের কাছে রুম ভাড়া দেই।"

"ইয়েস ম্যাডাম।"

আমাকে একটি ঠিকানা এবং সেদিনই সন্ধ্যা সাতটায় সাক্ষাতের সময় দেয়া হলো। সাতটা বাজার আধঘণ্টা আগে আমি রওয়ানা হলাম। গাইড বুক আমার পকেটে এবং আমার নিঃশ্বাস সতেজ। গাছপালায় আচ্ছাদিত একটি রাস্তা ধরে যাচ্ছি, ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ এর সমান্তরাল রাস্তা এটি। ফুটপাতের ফাটল দিয়ে গজিয়ে উঠা ঘাস খাড়া হয়ে আছে। গরম সত্ত্বেও আমি কোট ও টাই পড়েছি, মহিলার সাথে সাক্ষাৎকে আমি অন্য যে কোন সাক্ষাৎকারের মতোই বিবেচনা করেছি। আমি কখনো এমন কোন লোকের বাড়িতে বাস করিনি যে বাড়ি কোন ভারতীয়ের নয়। বাড়িটি চেনের মতো তারের জালি দিয়ে ঘেরাও করা, অফ হোয়াইট রং এর সাথে ঘন ধূসর প্রলেপ। আমি লন্ডনে যে রকম সারিবদ্ধ আস্তরযুক্ত বাড়িতে বাস করেছি, এটা তেমন নয়। এ বাড়ি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং কাঠের তক্তার প্রাচীর ঘেরা; সম্মুখ ও পার্শ্বভাগ এক ধরনের ঝোপে আচ্ছাদিত। আমি বেল টিপলে যে মহিলাটি ফোনে কথা বলেছিল মনে হলো তিনি দরজার অপর পাশ থেকে আওয়াজ দিলেন, "ওয়ান মিনিট, প্লিজ।"

বেশ কয়েক মিনিট পর একজন ক্ষুদ্রাকৃতির অতি বৃদ্ধা মহিলা দরজা খুললেন। মাথার উপরিভাগে একটি ছোট বস্তার মতো তার তুষার ধবল চুল গুটিয়ে রাখা। আমি ভিতরে প্রবেশ করলে মহিলা কার্পেটে মোড়া একটি সংকীর্ণ

সিঁড়ির পাশে রাখা কাঠের বেঞ্চে বসলেন। বেঞ্চে ঠিকভাবে স্থান করে নেবার পর মৃদু আলোতে তিনি অখণ্ড মনোযোগে আমার দিকে তাকালেন। লম্বা কালো স্কার্ট তার পরনে, যা তাবুর মতো ফ্লোরে ছড়িয়ে পড়েছে এবং শক্ত করে মাড় দেয়া শার্ট, যার গলা ও হাতা কুঁচকানো। দু'হাত কোলের উপর ভাঁজ করে রাখা। দীর্ঘ ফ্যাকাসে আঙুল, গাঁটগুলো মোটা, নখ হলদেটে। বয়সের কারণে তার চেহারা পুরুষের চেহারার মতো হয়ে গেছে। চোখ তীক্ষ্ণ এবং নাকের দু'পাশে লক্ষণীয় ভাঁজ পড়েছে। তার ঠোঁট ফ্যাকাসে, চামড়ার ভাঁজে প্রায় অদৃশ্য এবং ভুরুও যেন একই সাথে হারিয়ে গেছে। তবু তাকে ভয়ংকর লাগছে।

"দরজা বন্ধ করো।" বৃদ্ধার নির্দেশ। তার থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে দাঁড়ানো সত্ত্বেও আমার মনে হলো তিনি চিৎকার করে কথা বলছেন। "চেনটা আটকে দাও এবং তালার নব জোরে টিপে দাও। এ বাড়িতে এলে তোমাকে প্রথমেই এটা করতে হবে, বুঝতে পারছো?"

যেভাবে বলা হলো আমি সেভাবেই দরজা বন্ধ করে বাড়ির চারদিকে তাকালাম। বৃদ্ধা যে বেঞ্চে বসেছেন তার পাশেই ছোট্ট গোলাকৃতির টেবিল। টেবিলের পায়া দেখাই যাচ্ছে না, অনেকটা স্কার্টের লেসে মহিলার পা ঢেকে থাকার মতো। টেবিলের উপর একটি ল্যাম্প, একটি ট্রানজিসটার রেডিও, রূপালি হাতলসহ চামড়ার হাতব্যাগ এবং একটি টেলিফোন সেট। এক পাশে একটি কাঠের লাঠি, যাতে ধূলির পুরো আস্তরণ জমেছে। আমার ডান পাশে একটি শেলফ, সারি করে বই রাখা। পশুর থাবার মতো পায়াযুক্ত কিছু ছোটখাট আসবাব। বুকশেলফের পাশেই লক্ষ করলাম ঢাকনা নামানো বিশাল এক পিয়ানো এবং উপরে কাগজপত্রের স্তূপ। সামনে বসার বেঞ্চটি উধাও। মনে হচ্ছে, মহিলা যে বেঞ্চটিতে বসে আছে সেটিই পিয়ানোর সামনের বেঞ্চ। ঘরের মধ্যে কোথাও একটি ঘড়িতে সাতটা বাজার আওয়াজ উঠলো।

"তোমার সময় জ্ঞান টনটনে" মহিলা বলে উঠলেন। "আশা করি ভাড়ার ক্ষেত্রেও তুমি এটা খেয়াল রাখবে।"

"আমার কাছে একটা চিঠি আছে ম্যাডাম।" আমার জ্যাকেটের পকেটে এমআইটিতে আমার চাকুরি কনফার্ম করা সম্পর্কিত চিঠি, আমি যে টেক থেকে তা প্রমাণের জন্যেই এটা সঙ্গে এনেছি।

বৃদ্ধা চিঠি দেখলেন এবং সতর্কতার সাথে আমার হাতে ফিরিয়ে দিলেন। দু'আঙুলে তিনি এমনভাবে চিঠিটা ধরেছিলেন যেন এটি এক টুকরা কাগজ নয়, বরং খাবারে পূর্ণ ডিনার প্লেট। বৃদ্ধার চোখে চশমা ছিল না, আমার সন্দেহ হলো যে আদৌ তিনি এটা পরেছেন কিনা। "এর আগে যে ছেলেটি ছিল ভাড়া দিতে সে সবসময় বিলম্ব করতো। এখনো তার কাছে আট ডলার পাবো! হার্ভার্ডের ছেলেদের যেমন হওয়া উচিত সে তেমন নয়! এ বাড়িতে শুধু হার্ভাড ও টেক এর ছেলেরাই থাকে। তা টেক তোমার কেমন লাগছে?"

"খুব ভালো।"

"তুমি কি তালাটা ভালো করে পরীক্ষা করেছো?"

"ইয়েস ম্যাডাম।"

এক হাতে তিনি বেঞ্চের পাশে চাপড় দিলেন এবং আমাকে বসতে বসলেন। মুহূর্তের জন্যে তিনি নীরব। এরপর আপন মনে বললেন, যেন এ জ্ঞান তিনি একাই ধারণ করে আছেন।

"চাঁদে একটি আমেরিকান পতাকা আছে।"

"ইয়েস ম্যাডাম, আমি জানি।" তখন পর্যন্ত আমি চাঁদে অভিযান সম্পর্কে তেমন মাথা ঘামাইনি। অবশ্যই সংবাদপত্রে নিবন্ধের পর নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নভোচারীরা চাঁদের প্রশান্ত সৈকতে অবতরণ করেছেন। আমি পড়েছি যে, সভ্যতার ইতিহাসে তারা ভিন্ন আর কেউ এতো দূরে ভ্রমণ করেনি। কয়েক ঘণ্টা ধরে তারা চাঁদের উপরিভাগে অনুসন্ধান চালিয়েছে, পাথর শিলা কুড়িয়ে পকেটে রেখেছে। তাদের চার পাশের বর্ণনা দিয়েছে (একজন নভোচারীর মতে চমৎকার নিঃসঙ্গতা), ফোনে প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলেছে এবং চাঁদের মাটিতে আমেরিকার পতাকা পুঁতে দিয়েছে। চাঁদে অভিযানকে মানুষের সবচেয়ে বিস্ময়কর সাফল্য হিসেবে প্রশংসা করা হয়েছে। আমি 'বোস্টন গ্লোবে' নভোচারীদের ফাঁপানো পোশাক পরা পূর্ণ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ছবি দেখেছি এবং তারা যখন চাঁদে অবতরণ করে ঠিক সেই মুহূর্তে বোস্টনের বিশেষ কিছু ব্যক্তি কি করছিলেন তাদের সম্পর্কে পড়েছি। একজন বলেছে যে, সে কানে রেডিও ধরে রেখে বোট চালাচ্ছিল। এক মহিলা তার নাতিনাতনিদের জন্যে খাবার তৈরিতে ব্যস্ত ছিল।

মহিলা গম্ভীর উচ্চারণে বললেন, "চাঁদে একটি পতাকা, চাট্টিখানি কথা নয়। আমি রেডিওতে খবরটা শুনেছি! ব্যাপারটা কি বিস্ময়কর নয়?"

"ইয়েস ম্যাডাম।"

কিন্তু আমার উত্তরে সে সন্তুষ্ট হলেন না। বরং তিনি নির্দেশের সুরে বললেন, "বলো, বিস্ময়কর।"

তার কথায় আমি কিছুটা বিব্রত এবং অপমানিত বোধ করলাম। শৈশবে আমাকে যেভাবে গুণের নামতা শেখানো হয়েছে, আমার তেমন মনে হলো। শিক্ষক উচ্চরণ করার পর আমাদের সমস্বরে বলতে হতো। টালিগঞ্জ স্কুলের একটি রুমে মাটিতে পা আড়াআড়ি করে বসতাম, পায়ে কোন জুতা এবং হাতে পেন্সিল থাকতো না। আমার বিয়ের কথাও স্মরণ হলো, যখন ব্রাহ্মণ তার সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের পর আমাকে বলতে হয়েছে, যে মন্ত্র আমি নিজেও বুঝিনি। যে মন্ত্রবলে আমাকে স্ত্রীর সাথে যুক্ত করেছে। আমি কিছুই বললাম না।

"বলো, বিস্ময়কর।" মহিলা আবার নির্দেশ দিলেন।

"বিস্ময়কর।" বিড়বিড় করে আমি বললাম। দ্বিতীয়বার আমাকে উচ্চস্বরে বলতে হলো, যাতে মহিলা শুনতে পান। স্বভাবগতভাবে আমি মৃদুভাষী এবং মাত্র

কয়েক মুহূর্ত আগে সাক্ষাৎ হয়েছে এমন এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে উচ্চস্বরে কথা বলতে ইচ্ছা হয়নি আমার। কিন্তু মহিলা বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হলো না। মনে হলো আমার উত্তরে তিনি প্রসন্ন। তার দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল,

"যাও, রুম দেখে এসো।"

আমি বেঞ্চ থেকে উঠে কার্পেট মোড়া সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। মোট পাঁচটি দরজা, সিড়ির মতো সরু করিডোরের দুই পাশে দু'টি করে দরজা এবং একটি দরজা সিঁড়ির মুখোমুখি। দরজাগুলোর মধ্যে একটি সামান্য খোলা। সে রুমে পাশাপাশি দু'টি বিছানা, ছাদটা নিচু. ফ্লোরে ডিম্বাকৃতির একটি কার্পেট বিছানো, খোলা পাইপযুক্ত একটি বেসিন, একটি ওয়ার্ডরোব, সাদা রং এর একটি দরজা, দেয়াল আলমারির (ক্লোজেট) এবং অনুরূপ আরেকটি দরজা টয়লেট ও টাবসহ বাথরুমের। ঘরের দেয়াল ধূসর ও ডোরাকাটা কাগজে মোড়ানো। জানালা খোলা, নেটের পর্দা বাতাসে দুলছে। পর্দা তুলে আমি বাইরের দিকে তাকালাম : পিছন দিকে ছোট্ট চত্বর, সেখানে কয়েকটি ফলের গাছ এবং কাপড় শুকানোর জন্যে রশি টানানো। আমি সন্তুষ্ট। সিঁড়ির গোড়ায় মহিলার কণ্ঠ শুনলাম। "তুমি কি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলে?"

নিচে নেমে এসে তাকে বলার পর বৃদ্ধা টেবিল থেকে চামড়ার হাতব্যাগটা নিয়ে খুললেন, ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে পাতলা তারের রিং এর সাথে যুক্ত একটি চাবি বের করলেন। তিনি জানালেন যে, বাড়ির পিছন দিকে একটি কিচেন আছে, লিভিংরুমের ভিতর দিয়েই যেতে হয়। আমি যখন খুশি চুলা ব্যবহার করতে পারি। কাপড় এবং টাওয়েল দেয়া হবে আমাকে, কিন্তু সেগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা আমার নিজের দায়িত্ব। শুক্রবার সকালে ভাড়ার অর্থ রেখে দিতে হবে পিয়ানোর কী-বোর্ডের উপরের তাকে। "এবং কোন মহিলা দর্শনার্থী আসতে পারবে না।"

"ম্যাডাম, আমি তো বিবাহিত।" প্রথম বারের মতো আমি কারো কাছে এ ঘোষণা করলাম।

কিন্তু তিনি শুনতে পাননি। "নো লেডি ভিজিটর" জোর দিয়ে বললেন বৃদ্ধা। নিজের নাম জানালেন মিসেস ক্রফট।

আমার স্ত্রীর নাম মালা। বিয়েটা ঠিক করেছিলেন আমার বড় ভাই ও তার স্ত্রী। বিয়ের প্রস্তাবটিকে আমি আপত্তি বা উৎসাহের সাথে বিবেচনা করিনি। আমার কাছ থেকে বিয়েটাকে একটি কর্তব্য বলে আশা করা হয়েছিল, যেমন সব পুরুষের ক্ষেত্রেই বিবেচিত হয়। আমার স্ত্রী বেলেঘাটার এক স্কুল শিক্ষকের মেয়ে। আমাকে বলা হয়েছিল যে, সে রাঁধতে পারে, সেলাই, এমব্রয়ডারি করতে পারে, প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকতে পারে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু তার এসব মেধাগত যোগ্যতা কোন কাজে আসেনি, কারণ সে ফর্সা নয়।

সেজন্যে একের পর এক লোক তাকে দেখতে এসে তার মুখের উপর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। তার বয়স সাতাশ বছর, তার বাবা মার মধ্যে তখন রীতিমত আশংকার সৃষ্টি হয়েছে যে, আদৌ মেয়েটির বিয়ে হবে কি না। সেজন্যে তারা তাদের একমাত্র সন্তানকে পৃথিবীর অপরপ্রান্তে পাঠিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তার কুমারিত্ব মোচনের জন্যে।

আমরা পাঁচ রাত এক বিছানায় ছিলাম। প্রতি রাতে কোল্ড ক্রিম ব্যবহার করে, চুলের বেণী বেঁধে বেণীর শেষ প্রান্ত একটি কালো সুতা দিয়ে আটকে সে আমার কাছে এসে কাঁদতে শুরু করতো, কারণ বাবা মা'র কথা তার খুব মনে পড়ছে। যদিও আমি কয়েকদিনের মধ্যে দেশ ত্যাগ করতে যাচ্ছি, কিন্তু রীতি অনুসারে সে আমার বাড়ির সদস্য এবং পরবর্তী ছয় সপ্তাহ তাকে আমার ভাই ও বৌদির সাথে থাকতে হবে। রাঁধতে হবে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, অতিথিদের চা মিষ্টি দেয়া ইত্যাদি করতে হবে। তাকে সান্ত্বনা দিতে আমি কিছুই করিনি। বিছানার এক পাশে শুয়ে ফ্লাশলাইটে গাইডবুক পড়েছি এবং আমার যাত্রার বিষয়ে ভেবেছি। কখনো কখনো আমি দেয়ালের অপর পাশে ছোট্ট রুমটির কথা ভেবেছি, যে রুমে আমার মা থাকতেন। এখন রুমটি শূন্য, কাঠের যে চৌকিতে তিনি ঘুমাতেন তার উপর ট্রাংক এবং পুরনো বিছানাপত্র স্তূপ করে রাখা। প্রায় ছয় বছর আগে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার আগে আমি সেই বিছানার উপর তাকে মরতে দেখেছি। তার জীবনের শেষ দিনগুলোতে নিজের বিষ্ঠা নাড়াচাড়া করতে দেখেছি। তাকে দাহ করার আগে আমি চুল আটকানোর পিন দিয়ে প্রতিটি নখ পরিষ্কার করে দিয়েছি এবং যেহেতু আমার ভাই সহ্য করতে পারবেন না, সেজন্যে আমি জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভূমিকা নিয়ে তার কপালে আগুন স্পর্শ করেছি, যাতে তার বিধ্বস্ত আত্মা স্বর্গে গমন করে।

পরদিন সকালে আমি মিসেস ক্রফটের বাড়িতে চলে এলাম। যখন দরজা খুললাম, তখন দেখলাম আগের সন্ধ্যার মতোই তিনি পিয়ানোর বেঞ্চের এক পাশে বসে আছেন। সেই কালো স্কার্টটিই পরনে, একই সাদা ব্লাউজ এবং একইভাবে তার দু'হাত কোলের উপর রাখা। তাকে একই রকম লাগছে দেখতে এবং অবাক হলাম যে, তিনি কি সারারাত এভাবেই বেঞ্চে বসে ছিলেন। আমি স্যুটকেস উপরে তুললাম, কিচেন থেকে গরম পানি নিয়ে ফ্লাস্ক ভরলাম এবং অফিসে চলে গেলাম। সেদিন বিকেলে ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দেখলাম তখনো তিনি সেখানেই বসা।

"এখানে বসো!" তার পাশের জায়গায় চাপড় দিয়ে দেখালেন। তার পাশে বেঞ্চে বসলাম। আমার হাতে একটি ব্যাগ—দুধ, কর্নফ্লেকস, কলা কিনেছি। কারণ সকালে কিচেনে গিয়ে দেখেছি কোন অতিরিক্ত হাঁড়িপাতিল নেই রান্নার

কাজে ব্যবহার করার মতো। রেফ্রিজারেটরে মাত্র দু'টি সসপ্যান আছে, দু'টোতেই কমলা রং এর ঝোল। এছাড়া চুলার উপর একটি পিতলের কেটলি।

"গুড ইভনিং, ম্যাডাম।"

তিনি জানতে চাইলেন তালাটা ঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কিনা। তাকে বললাম যে, আমি ঠিকভাবেই লাগিয়েছি।

মুহূর্তের জন্যে তিনি নীরব। এরপর হঠাৎ তিনি আগের রাতের মতোই সমান মাত্রার অবিশ্বাস ও আনন্দের সাথে ঘোষণা করলেন, "চাঁদে আমেরিকার পতাকা তোলা হয়েছে।"

"ইয়েস ম্যাডাম।"

"চাঁদে পতাকা উত্তোলনের মতো ব্যাপার কি সত্যিই বিস্ময়কর নয়?" আমি মাথা নাড়লাম। এরপর কি শুনবো তা জানতাম। বললাম, "ইয়েস ম্যাডাম।"

"বলো, বিস্ময়কর।"

এবার আমি সময় নিলাম, দু'পাশে তাকালাম যে, আমার কথা শোনার জন্যে আর কেউ আছে কি না, যদিও জানি যে, বাড়িটি শূন্য। বেকুব বলে মনে হলো নিজেকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করার জন্যে খুব ক্ষুদ্র ব্যাপার এটি। চিৎকার করে বললাম, "সত্যিই বিস্ময়কর।"

ক'দিনের মধ্যে এটি আমাদের রুটিনে পরিণত হলো। সকালে আমি যখন লাইব্রেরিতে চলে যাই, তখন মিসেস ক্রফট হয় তার বেডরুমে থাকেন অথবা বেঞ্চে বসা অবস্থায় থাকেন। আমার উপস্থিতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে রেডিও'র সংবাদ অথবা ক্লাসিক্যাল মিউজিক শোনেন। কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় আমি যখন ফিরে আসি তখন একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আমাকে তার পাশে বসতে ইঙ্গিত করেন, ঘোষণা করেন যে, চাঁদে আমেরিকার পতাকা উড়ছে এবং তা বিস্ময়কর। আমিও বলি যে, সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার, এরপর আমরা নীরবে বসে থাকি। আমার কাছে এখনো বিব্রতকর এবং সীমাহীন একটি ব্যাপার বলে মনে হয়। রাতে তার সাথে এই অবস্থা মাত্র দশ মিনিট স্থায়ী হয়। বৃদ্ধা অনিবার্যভাবেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন, সহসাই তার মাথা বুকের কাছে ঝুলে পড়ে। আমি মুক্ত হয়ে রুমে চলে আসি। ততোক্ষণে আমেরিকার পতাকা অবশ্যই আর চাঁদে নেই। আমি সংবাদপত্রে পড়েছি যে, পৃথিবীতে ফিরে আসার আগে নভোচারীরা আবার সেই পতাকা তুলে এনেছেন। কিন্তু সে কথা বৃদ্ধাকে বলার মতো সাহস নেই আমার।

শুক্রবার সকালে আমার প্রথম সপ্তাহের ভাড়া পরিশোধের কথা। পিয়ানোর কাছে গেলাম তাকের উপর ডলারগুলো রাখতে। পিয়ানোর কী বোর্ড ফ্যাকাসে এবং রং চটে গেছে। একটি কী এর উপর চাপ দিলাম, কিন্তু কোন শব্দই হলো না। একটি খামে আটটি এক ডলারের নোট ভরে উপরে মিসেস ক্রফটের নাম

লিখেছি। নাম না লিখে এবং সরাসরি অর্থ পরিশোধ না করার অভ্যাস আমার নেই। যেখানে আমি দাঁড়িয়েছি সেখানে থেকে আমি তার তাবু আকৃতির স্কার্ট দেখতে পাচ্ছি। তিনি বেঞ্চে বসে রেডিও শুনছেন। মনে হলো বেঞ্চ থেকে পিয়ানো পর্যন্ত তার উঠে আসা অপ্রয়োজনীয়। আমি কখনো তাকে হাঁটতে দেখিনি এবং গোল টেবিলে হেলান দিয়ে রাখা বেতের ছড়ি দেখে ধরে নিয়েছিলাম যে, হাঁটতে তার কষ্ট হয়। আমি তার কাছে উপনীত হলে তিনি মুখ তুলে তাকিয়ে জানতে চাই :

"তোমার কি প্রয়োজন?"

"ভাড়া দিতে চাচ্ছিলাম ম্যাডাম।"

"পিয়ানোর কী-বোর্ডের তাকের উপর রেখে দাও।"

"এর মধ্যেই আছে।" তার দিকে খামটি বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু কোলের উপর ভাঁজ করে রাখা তার আঙুল উঠলো না। আমি একটু নিচু হয়ে, খামটিও নিচু করে ধরলাম, তার হাতের সামান্য উপরে। এক মুহূর্ত পর তিনি গ্রহণ করে মাথা ঝুঁকালেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে আসার পর তিনি বেঞ্চে বসার জন্যে ইঙ্গিত করলেন না। কিন্তু অভ্যাসবশত আমিই গিয়ে বসলাম। তিনি জানতে চাইলেন তালাটা পরীক্ষা করে দেখেছি কিনা, কিন্তু চাঁদে পতাকা উত্তোলন সম্পর্কে কিছু বললেন না। বরং তিনি বললেন : "সত্যিই তোমার যথেষ্ট অনুগ্রহ।"

"আপনার কথা বুঝতে পারিনি, ম্যাডাম।"

"তুমি যথেষ্ট অনুগ্রহশীল।"

তখনো তার হাতে আমার দেয়া খামটি ধরা।

রোববার আমার দরজায় করাঘাতের শব্দ। এক বয়োবৃদ্ধা মহিলা নিজের পরিচয় দিলেন : তিনি মিসেস ক্রফটের কন্যা, হেলেন। তিনি রুমে পায়চারি করে প্রতিটি দেয়াল লক্ষ করলেন যে, কোন পরিবর্তন করা হয়েছে কি না। আলমারি খুলে ঝুলানো শার্ট, দরজার নবে ঝুলানো টাই, ড্রয়ারে কর্নফ্লেকস, বেসিনে অপরিষ্কার গামলা ও চামচ লক্ষ করলেন। মহিলা খাটো এবং কোমর মোটা। রূপালি চুল ছাঁটা এবং ঠোঁটে উজ্জ্বল গোলাপি লিপস্টিক লাগানো। হাতাকাটা গরমের পোশাক তার পরনে। গলা থেকে বুক পর্যন্ত ঝুলছে চেন লাগানো চশমা। এছাড়া গলায় সাদা প্লাস্টিকের গুটির মালা। তার পায়ের পিছনে নীল শিরাগুলো মানচিত্রের মতো ছড়িয়ে আছে। হাতের উপরিভাগের মাংস পোড়া বেগুনের মতো ঝুলে আছে। আমাকে বললেন, আর্লিংটনে থাকেন তিনি, ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ থেকে খানিকটা দূরে। "সপ্তাহে একদিন আমি আসি মায়ের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে যেতে।"

"খুব ভালো ম্যাডাম।"

"কিছু কিছু ছেলে হৈ হল্লা করে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সে তোমাকে পছন্দ করেছেন। তুমিই প্রথম ভাড়াটে, যাকে তিনি ভদ্রলোক বলে উল্লেখ করেছেন।"

"না, না, তা কেন হবে ম্যাডাম।"

মহিলা আমার দিকে তাকালেন, আমার খালি পা লক্ষ করলেন, (এখনো ঘরের মধ্যে জুতা পড়ে থাকতে আমার অস্বস্তি লাগে এবং রুমে প্রবেশের আগে জুতা বাইরে খুলে রাখি।) "তুমি কি বোস্টনে নতুন এসেছো?"

"ম্যাডাম, আমেরিকাতেই নতুন।"

"কোথা থেকে এসেছো?" ভুরু তুলে জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি কলকাতা থেকে এসেছি, ইন্ডিয়া।"

"ও তাই? আমাদের এখানে ব্রাজিলের একজন ছিল, প্রায় এক বছর আগে। কেমব্রিজকে তোমার আন্তর্জাতিক শহর বলে মনে হবে।"

আমি মাথা নাড়লাম। বিস্মিত হচ্ছিলাম যে, আলোচনা কতক্ষণ চলবে। কিন্তু তখনই মিসেস ক্রফটের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ সিঁড়ি বেয়ে আমাদের কানে বাজালো। আমরা করিডোরে এসে তার কথা শুনতে পেলাম :

"এখনই তোমাদের নিচে নেমে আসতে হবে!"

"কেন কি হয়েছে?" হেলেন পাল্টা চিৎকার করলো।

"এখনই এসো!"

আমি দ্রুত জুতা পায়ে দিলাম। হেলেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছি। সিঁড়িটা এতো সংকীর্ণ যে, দু'জন পাশাপাশি নামা যায় না। অতএব হেলেনকে অনুসরণ করছি আমি। তার কোন তাড়া আছে বলে মনে হলো না এবং এক পর্যায়ে অভিযোগ করলো যে, তার মায়ের হাঁটুতে ব্যথা। হেলেন চিৎকার করলো, "তুমি কি ছড়ি না নিয়েই হাঁটছিলে? তুমি তো জানো, ছড়ি ছাড়া তোমার হাঁটা উচিত নয়।" সে থামলো, এক হাত সিঁড়ির রেলিং এর উপর এবং পিছন ফিরে আমাকে দেখলো। "মাঝে মাঝে তিনি পড়ে যান।"

প্রথমবারের মতো মিসেস ক্রফটকে দুর্বল মনে হলো। আমি মনে মনে দেখলাম, তিনি বেঞ্চের সামনে ফ্লোরের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, দৃষ্টি সিলিং এর দিকে, পা বিপরীত দিকে ছড়ানো। কিন্তু নিচে পৌঁছে দেখলাম, তিনি সিঁড়ির গোড়ায় বেঞ্চের উপর বরাবরের মতোই বসে আছেন। হাত দু'টি কোলের উপর। জিনিসপত্রে ভরা দু'টি ব্যাগ তার পায়ের কাছে। তার সামনে দাঁড়ানোর পর তিনি বেঞ্চে চাপড় দিলেন না বা বসতে বলরেন না। শুধু তাকিয়ে রইলেন।

"কি হয়েছিল, মা?"

"এটা সঙ্গত নয়।"

"কোনটা সঙ্গত নয়?"

"একজন মহিলা ও পুরুষ, যারা একে অন্যের সাথে বিয়ের বন্ধনে সম্পর্কিত নয় তাদের জন্যে তৃতীয় কারো উপস্থিতি ছাড়া একান্ত আলোচনা মোটেই সঙ্গত কাজ নয়।"

হেলেন বললো যে, তার বয়স আটষট্টি বছর এবং আমার মা হওয়ার বয়সী। কিন্তু মিসেস ক্রফট তার কথায় অবিচল যে, হেলেন এবং আমার কথা বলা উচিত নিচতলায় লিভিংরুমে। তিনি আরো বললেন যে, হেলেনের মতো একজন মহিলার জন্যে তার বয়স প্রকাশ করাটাও অসঙ্গত এবং গোড়ালির এতো উপরে পোশাক পরাও অনুচিত।

"মা, তোমার অবগতির জন্যে বলছি যে, এখন ১৯৬৯ সাল। একদিন তুমি বাড়ির বাইরে বের হয়ে যদি মিনিস্কার্ট পরা কোন মেয়েকে দেখো, তখন তুমি কি করবে?"

মিসেস ক্রফট শব্দ করে নিশ্বাস নিলেন। "আমি তাকে অ্যারেস্ট করতে বলবো।"

হেলেন মাথা নাড়লো এবং তার আনা একটি ব্যাগ হাতে তুলে নিল। আরেকটি ব্যাগ আমি নিয়ে লিভিংরুমের মাঝ দিয়ে কিচেনের দিকে তাকে অনুসরণ করলাম। ব্যাগ দু'টো সুপের ক্যানে পূর্ণ। হেলেন ক্যান ওপেনার দিয়ে বেশ ক'টি ক্যান খুললো, সসপ্যানের পুরনো স্যুপ সিঙ্কে ঢেলে প্যানটি ট্যাপের নিচে পরিষ্কার করে নতুন ক্যানের স্যুপগুলো ঢাললো এবং রেফ্রিজারেটরে রেখে দিলো। "কয়েক বছর আগেও মা নিজেই ক্যানগুলো খুলতে পারতেন।" হেলেন বললো। "এখন আমি যে তার জন্যে এসব করছি, তা তিনি ঘৃণা করেন। কিন্তু পিয়ানো তার হাতকে নষ্ট করে দিয়েছে।" হেলেন চশমা চোখে দিয়ে তাকে চোখ বুলিয়ে আমার টি ব্যাগ দেখতে পেল। "আমরা কি এক কাপ পান করতে পারি?"

চুলার উপর কেটলিতে পানি ভরলাম। "ম্যাডাম, পিয়ানোর ব্যাপারটা বলছিলেন?"

"চল্লিশ বছর ধরে তিনি পিয়ানো শিখিয়েছেন। আমার বাবার মৃত্যুর পর এভাবেই তিনি আমাদের বড় করেছেন।" হেলেন তার নিতম্বে হাত রেখে খোলা রেফ্রিজারেটরের দিকে তাকালো। এগিয়ে গিয়ে মোড়ানো মাখনের টুকরা নাকে শুকে ময়লার বাক্সে ফেলে দিল। অবশিষ্ট স্যুপ ক্যান তাকে উঠিয়ে রাখলো। টেবিলের এক প্রান্তে বসে আমি হেলেনের কাজ লক্ষ করছিলাম : ময়লা প্লেটগুলো ধোয়া, ময়লাগুলো গার্বেজ ব্যাগে তুলে বাধা, সিঙ্কের উপরে রাখা টবে গাছটিতে পানি দেয়া এবং দু'টি কাপে গরম পানি ঢালা। দুধ না দিয়েই সে একটি কাপ আমাকে দিল। টি ব্যাগের সুতা এক পাশে ঝুলে আছে। হেলেন বসলো। "ম্যাডাম, আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু যা করছেন তা কি যথেষ্ট?" এক চুমুক চা পান করলো সে। তার লিপস্টিকে গোলাপি দাগ কাপের প্রান্তে লেগে আছে। "যথেষ্ট কি?"

"প্যানে স্যুপ ঢেলে রেখে যাওয়া। মিসেস ক্রফটের জন্যে এই খাবার কি যথেষ্ট?"

"এছাড়া তিনি আর কিছু খান না। একশ' বছর পূর্ণ হওয়ার পর তিনি কঠিন খাবার গ্রহণ বন্ধ করেছেন। সেটা, মনে হয়, তিন বছর আগে।

আমি যেন অবশ হয়ে গেলাম। আমার মনে হয়েছিল মিসেস ক্রফটের বয়স আশির উর্ধ্বে হবে, সম্ভবত নব্বই। একশ' বছরের বেশি সময় ধরে জীবিত এমন কাউকে আমি কখনো দেখিনি। এই মহিলা একজন বিধবা, যিনি একা বাস করেন, এ ধারণা আমাকে আরো বিমূঢ় করে দিল। বৈধব্য আমার নিজের মাকে পাগল করে দিয়েছিল। আমার বাবা কলকাতার জেনারেল পোস্ট অফিসে ক্লার্কের কাজ করতেন। আমার বয়স যখন ষোল, তখন তিনি মস্তিষ্ক প্রদাহজনিত রোগে মারা যান। তাকে ছাড়া জীবনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেননি মা। এক অন্ধকার জগতের গভীরে ডুবে যান তিনি, যেখান থেকে আমি, আমার ভাই, আমাদের আত্মীয়স্বজন অথবা রাসবিহারী এভিনিউ এর কোন মনোরোগ ক্লিনিকের চিকিৎসাও তাকে রক্ষা করতে পারেনি। আমার কাছে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ছিল তাকে এতো বেখেয়ালি দেখে, খাওয়ার পর সশব্দে ঢেকুর তুলতে এবং সামান্যতম বিব্রত হওয়া ছাড়াই সবার সামনে বায়ু ত্যাগ করতে দেখে। বাবার মৃত্যুর পর আমার ভাই স্কুল ছেড়ে একটি পাটকলে কাজ শুরু করলেন এবং তাকেই শেষ পর্যন্ত সংসারের হাল ধরতে হলো। আমার দায়িত্ব দাঁড়ালো মায়ের পায়ের কাছে বসে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নেয়া। মা তার হাতের চুড়ি গুণতেন, বারবার গুণতেন, যেন এগুলো অংক শেখার গুটি। তার উপর চোখ রাখার চেষ্টা করতাম আমরা। একদিন তিনি অর্ধনগ্ন অবস্থায় ট্রাম ডিপোর দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন, আমরা তাকে আবার বাড়িতে ফিরিয়ে আনি।

"সন্ধ্যায় মিসেস ক্রফটের জন্যে স্যুপ গরম করে দিতে পারলে আমার ভালো লাগবে।" কাপ থেকে টি ব্যাগ সরিয়ে নিতে নিতে আমি বললাম। "এতে আমার কোন অসুবিধা হবে না।"

হেলেন তার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠলো এবং চায়ের অবশিষ্টটুকু সিঙ্কে ঢেলে দিল। "আমি তোমার ক্ষেত্রে হলে, মোটেই তা করতাম না। এ ধরণের ব্যাপার তাকে পুরোপুরি শেষ করে দেবে।"

সেই সন্ধ্যায় হেলেন আর্লিংটনে ফিরে গেলে মিসেস ক্রফট এবং আমি আবার একা। কিন্তু আমার মধ্যে উদ্বেগ কাজ করছে। কারণ এখন আমি জেনে গেছি যে, বৃদ্ধার বয়স কতো। আমার উৎকণ্ঠা হলো যে, মাঝরাতে তার কোন কিছু ঘটে যেতে পারে; অথবা দিনের বেলায় আমি যখন বাইরে থাকি। তার কণ্ঠ যতোটা প্রবল এবং তাকে যত কর্তৃত্ববান মনে হোক না কেন, আমি জানি যে, সামান্য আঁচড় অথবা কাশির কারণেও তার মতো বয়সের ভারে নুব্জ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে। একেক দিন তাকে জীবিত দেখে আমার কাছে অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয়। যদিও হেলেনকে যথেষ্ট বন্ধুভাবাপন্ন মনে হয়, তবুও আমার ভিতরের

ক্ষুদ্র একটি অংশ উদ্বিগ্ন থাকে যে, কোন কিছু ঘটে গেলে সে আমার অবহেলার জন্যে দোষ দিতে পারে। হেলেনকে আদৌ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হয় না। প্রতি রোববার সে আসে মিসেস ক্রফটের জন্যে স্যুপ নিয়ে এবং ফিরে যায়।

এভাবে সেই গ্রীষ্মের ছয় সপ্তাহ কেটে গেল। লাইব্রেরির কাজ শেষ করে আমি প্রতি সন্ধ্যায় ফিরে এসে মিসেস ক্রফটের সাথে পিয়ানো বেঞ্চে কয়েক মিনিটের জন্যে বসি। তাকে সঙ্গ দেই এবং তাকে নিশ্চিত করি যে, তালা ঠিকভাবে লাগিয়েছি এবং বলি যে, চন্দ্রপৃষ্ঠে আমেরিকান পতাকা উড়ানো সত্যিই বিস্ময়কর। কোন কোন সন্ধ্যায় তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার পরও আমি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকি এবং অবাক হয়ে ভাবি যে, এ পৃথিবীতে তিনি কতগুলো বছর অতিবাহিত করেছেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন আমি তখনকার বিশ্বের চিত্র আঁকার চেষ্টা করি। ১৮৬৬ সালের বিশ্ব, আমি কল্পনা করি, দীর্ঘ কালো স্কার্ট পরা মহিলায় পূর্ণ এবং তারা আলোচনায় লিপ্ত বসার ঘরে। কিন্তু কোলের উপর ভাঁজ করে রাখা হাতে আঙুলের স্ফীত গাঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবি এগুলো মসৃণ এবং সরু ছিল এবং এ আঙুলগুলো পিয়ানোর কী বোর্ডে নাচতো। কখনো কখনো শোয়ার আগে আমি নিচে নেমে আসি যে, তিনি তখনো বেঞ্চে সোজা হয়ে বসে আছেন না বেডরুমে নিরাপদে আছেন। শুক্রবার সকালে আমি তার হাতে ভাড়ার অর্থভর্তি খামটা তুলে দেই। এই সামান্য ভদ্রতাটুকু প্রদর্শন ছাড়া আমার পক্ষ থেকে আর কিছুই করতে পারি না। আমি তার পুত্র নই এবং ভাড়ার আট ডলার ছাড়া তার কাছে আমি ঋণী নই।

আগস্টের শেষ দিকে মালার পাসপোর্ট ও গ্রিনকার্ড প্রস্তুত। তার ফ্লাইটের বিবরণসহ একটি টেলিগ্রাম পেলাম। কলকাতায় আমার ভাই এর বাড়িতে কোন টেলিফোন নেই। সে সময়ের মধ্যেই আমি মালার একটি চিঠি পেলাম, আমি চলে আসার কয়েকদিন পরই লিখা। চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই, আমার নাম উল্লেখ করে লিখায় ঘনিষ্ঠতার আঁচ পাওয়া গেলেও আমরা এখনো তা আবিষ্কার করতে পারিনি। মাত্র কয়েকটি লাইন। "যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে আমি ইংরেজিতে লিখছি। এখানে আমি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ। ওখানে কি খুব ঠাণ্ডা। বরফ পড়ছে কি ? তোমার মালা।"

তার শব্দ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেনি। আমরা অল্প কয়েকটি দিন একে অন্যের সাহচর্যে কাটিয়েছি। এখনো আমরা পরস্পর বন্ধনে আবদ্ধ। ছয় সপ্তাহ ধরে তার কবজিতে একটি লোহার বালা পড়ে আছে এবং সিঁথিতে সিঁদুর লাগাচ্ছে পৃথিবীকে এটা বুঝাতে যে, সে বিবাহিতা। সেই ছ'টি সপ্তাহ আমি তার আগমনকে আমার মনে হয়েছে একটি মাসের অথবা একটি মওসুমের প্রতীক্ষার মতো— অনিবার্য কিছু যেন। কিন্তু সময়ের ক্ষেত্রে অর্থহীন। তাকে আমি এতো সামান্য

জেনেছি যে, কখনো তার মুখটা ঝাপসা স্মৃতির মতো মনে হয়। পুরো মুখাবয়ব আমি একসাথে জুড়ে তুলতে পারি না।

চিঠি পাবার কয়েক দিন পর আমি যখন কর্মস্থলে যাচ্ছিলাম, তখন ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ এর উল্টো পাশে শাড়ি পড়া এক ভারতীয় মহিলাকে যেতে দেখলাম। তার শাড়ির আঁচল প্রায় ফুটপাত স্পর্শ করছে। তিনি স্ট্রোলারে এক শিশুকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এক আমেরিকান মহিলা তার ছোট্ট কালো কুকুরের রশি হাতে ধরে ভারতীয় মহিলার এক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সহসা কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করলো রাস্তার অপর পাশে থেকেও আমি লক্ষ্য করলাম ভারতীয় মহিলা চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তখনই কুকুরটি লাফ দিয়ে শাড়ির এক প্রান্ত কামড়ে ধরলো। আমেরিকান মহিলা তার কুকুরকে ধমক দিলেন, মনে হলো ক্ষমা চাইলেন এবং ফুটপাতের মাঝখানে ভারতীয় মহিলাকে শাড়ি ঠিক করার এবং শিশুর কান্না থামানোর জন্যে রেখে দ্রুত চলে গেলেন। তিনি আমাকে দাঁড়ানো দেখতে পাননি এবং এক সময়ে তিনি আবার চলতে শুরু করেছেন। সেদিন সকালে আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ ধরনের অঘটন খুব শিগ্‌গির আমারও উদ্বেগের কারণ হতে যাচ্ছে। আমার কর্তব্য মালার দেখাশুনা করা, তাকে স্বাগত জানানো এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আমাকে তার জন্যে তার প্রথম স্নো বুট, তার প্রথম শীতের কোট কিনতে হবে। তাকে শিখিয়ে দিতে হবে যে, কোন্ রাস্তা এড়িয়ে চলতে হবে, কোন্ দিক হতে গাড়ি আসে, তাকে বলতে হবে যে, শাড়ি এমনভাবে পরতে হবে, যাতে আঁচল ফুটপাত স্পর্শ না করে। আমি খানিক বিরক্তির সাথে স্মরণ করলাম যে, তার বাবা মা'র কাছ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে আসার কারণে সে কেঁদেছে।

আমি ইতোমধ্যে সবকিছুর সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, যা মালা পারবে না। কর্ণফ্লেকস ও দুধে অভ্যস্ত, হেলেনের আগমনে অভ্যস্ত। মিসেস ক্রফটের সাথে বেঞ্চে বসতে অভ্যস্ত হয়েছি। শুধু মালার সাথেই অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি আমি। তবু আমার যা করার ছিল আমি তা করেছি। আমি এমআইটির হাউজিং অফিসে গেলাম এবং কয়েক ব্লক দূরেই আসবাব পত্র দ্বারা সজ্জিত, দুই বেডরুম, কিচেন, পৃথক বাথরুমসহ একটি অ্যাপার্টমেন্ট পেলাম। সপ্তাহে চল্লিশ ডলার ভাড়া। এক শেষ শুক্রবার আমি মিসেস ক্রফটের হাতে আটটি এক ডলারের নোট ভর্তি খাম দিয়ে আমার সুটকেস নিচে নামালাম এবং তাকে জানালাম যে, আমি চলে যাচ্ছি। আমার হাত থেকে চাবি নিয়ে তিনি হাত ব্যাগে রাখলেন। সর্বশেষ তিনি আমাকে যা বললেন, তা হচ্ছে টেবিলে হেলান দিয়ে রাখা বেতের ছড়িটা তার হাতে তুলে দিতে, যাতে তিনি দরজা পর্যন্ত এসে দরজাটা তালাবন্ধ করতে পারেন। তিনি উচ্চারণ করলেন, "গুড বাই।" এবং ঘরের ভিতরে যাওয়ার জন্যে ফিরলেন। আমি কোন আবেগের প্রদর্শন আশা করিনি, তবু আমি পুরোপুরি হতাশ হলাম। আমি শুধু একজন ভাড়াটে ছিলাম, যে লোক অর্থের বিনিময়ে অবস্থান করেছে

এবং ছ'সপ্তাহ তার বাড়িতে প্রবেশ করেছে ও বাইরে গেছে। এক শতাব্দীর তুলনায় ছ'সপ্তাহ কোন সময়ই নয়।

এয়ারপোর্টে খুব সহজে আমি মালাকে খুঁজে পেলাম। তার শাড়ির আঁচল ফ্লোরে গড়াচ্ছে না, কিন্তু মাথার উপর নববধুর মতো আঁচল টেনে দিয়েছে, ঠিক বাবার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমার মায়ের মাথায় যেভাবে আঁচল টানা থাকতো। তার শীর্ণ বাদামি হাতে সোনার চুড়ি, কপালে লাল টিপ এবং তার পায়ের প্রান্তেও লাল রং এর আল্পনা আঁকা। আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম না অথবা চুম্বন করলাম না অথবা হাতও ধরলাম না। আমেরিকায় তাকে প্রথমবারের মতো জিজ্ঞাসা করলাম যে, সে ক্ষুধার্ত কি না।

সে দ্বিধাগ্রস্ত হলেও মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

তাকে বললাম যে, বাড়িতে আমি ডিমের তরকারি রান্না করে এসেছি। "বিমানে ওরা তোমাকে কি খেতে দিয়েছে?"

"আমি খাইনি।"

"কলকাতা থেকে সারাটা পথ খাওনি?"

"মেনুতে উল্লেখ করা ছিল, ষাড়ের লেজের স্যুপ।"

"কিন্তু খাবার অন্য আইটেমও তো নিশ্চয়ই ছিল?"

"ষাড়ের লেজ খাওয়ার বিষয় ভেবে আমার ক্ষুধা চলে গিয়েছিল।" বাড়ি পৌঁছার পর মালা তার একটি সুটকেস খুললো এবং আমাকে দু'টি সোয়েটার দিল, দু'টিই উজ্জ্বল নীল পশমি সুতায় তৈরি এবং আমাদের বিচ্ছিন্ন থাকার সময়ের মধ্যে সে নিজেই বুনেছে। একটি 'ভি' গলাবিশিষ্ট, আরেকটি তার দিয়ে ঢাকা। আমি গায়ে দিয়ে দেখলাম, দু'টোই হাতের নিচে শক্ত হয়ে এঁটে বসে। সে আমার জন্যে দু'টি নতুন পাজামাও এনেছে। আমার ভাই এর একটি চিঠি এবং এক প্যাকেট দার্জিলিং চা। ডিমের তরকারি ছাড়া তার জন্যে আমার কোন উপহার নেই। আমরা টেবিলের পাশে বসলাম, দু'জনই আমাদের প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছি। আমরা হাত দিয়ে খেলাম, এটাও আমি আগে আমেরিকায় করিনি। "বাড়িটি সুন্দর" সে বললো। "ডিমের তরকারিটাও।" বাম হাত দিয়ে সে তার শাড়ির আঁচল বুক পর্যন্ত তুলে ধরালো, তাতে মাথা থেকে আঁচলের বাকিটা খসে পড়লো না।

"আমি খুব বেশি কিছু রান্না করতে জানি না।"

সে মাথা নাড়লো, আলু খাবার আগে ছাল ছিলে নিচ্ছিল। এক পর্যায়ে শাড়ি তার কাঁধে পড়লে দ্রুত সে ঠিক করে নিল।

"এখানে তোমার মাথা ঢেকে রাখার কোন প্রয়োজন নেই।" আমি বললাম, "আমি কিছু মনে করবো না। এখানে এসব কোন ব্যাপারই নয়।" কিন্তু সে মাথায় কাপড় রাখলো।

তার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্যে আমি অপেক্ষা করলাম। আমার পাশে, টেবিলে, বিছানায় তার উপস্থিতির সাথে অভ্যস্ত হতে সচেষ্ট ছিলাম। কিন্তু এক সপ্তাহ পরও আমরা অপরিচিতের মতোই রয়ে গেলাম। আমি এখনো বাড়িতে এসে ফুটন্ত ভাতের গন্ধের সাথে অভ্যস্ত হইনি, বাথরুমের বেসিন পরিচ্ছন্ন দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি। আমাদের দু'টো টুথ ব্রাশ পাশাপাশি পড়ে থাকে, ভারত থেকে আনা পিয়ার্স সাবান সাবানদানিতে রাখা—তার সাথে দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়নি। সে রাতে মাথায় যে নারকেল তেল মাখে তার গন্ধ অথবা তার চুড়ির শব্দ কেমন অনভ্যস্ত লাগে। প্রতিদিন সকালে সে আমার চাইতে আগে ঘুম থেকে উঠে। প্রথম সকালে আমি কিচেনে গিয়ে দেখি, সে রাতের খাবার গরম করে টেবিলে প্লেট সাজিয়ে দিয়েছে কোনায় এক চামচ লবণসহ। তার ধারণা ছিল আমি নাশতার জন্যে ভাত খাবো, যা অধিকাংশ বাঙালিই করে। আমি তাকে বললাম যে, কর্নফ্লেকস হলেই আমার চলবে এবং পরদিন সকালে কিচেনে গিয়ে দেখলাম, সে প্লেটে কর্নফ্লেকস সাজিয়ে দিয়েছে। একদিন সকালে সে আমার সাথে হেঁটে ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ ধরে এমআইটি পর্যন্ত গেল। আমি তাকে ক্যাম্পাসের খানিকটা ঘুরিয়ে দেখালাম। ফেরার পথে আমরা একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে থামলাম এবং চাবির ডুপ্লিকেট তৈরি করে নিলাম, যাতে সে অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করতে পারে। পরদিন সকালে আমি অফিসে যাওয়ার আগে সে কয়েকটি ডলার চাইলো। আমি অনিচ্ছার সাথে দিলাম। কিন্তু আমি জানি, এটা এখন স্বাভাবিক। বাড়ি ফিরে দেখলাম, কিচেনের ড্রয়ারে একটি পটেটো পিলার। টেবিলের উপর একটি টেবিলক্লথ এবং তাজা রসুন ও আদা সহযোগে মুরগি রান্না করা হয়েছে। তখন আমাদের কোন টেলিভিশন ছিল না। রাতের খাবার শেষে আমি সংবাদপত্র পড়তাম, মালা কিচেনের টেবিলের পাশে বসে নিজের জন্যে কার্ডিগান বুনতো আরো উজ্জ্বল নীল উল দিয়ে অথবা বাড়িতে চিঠি লিখতো।

আমাদের প্রথম সপ্তাহ শেষে শুক্রবার বাইরে যাবো বলে জানালাম। মালা তার কার্ডিগান বোনার সরঞ্জাম রেখে বাথরুমে অদৃশ্য হলো। সে বের হয়ে এলে আমি তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিলে সে একটি পরিচ্ছন্ন সিল্কের শাড়ি এবং অতিরিক্ত চুড়ি পরলো এবং মাথার উপরে খোপা বাঁধলো। সে পার্টিতে যাওয়ার মতো করে সেজেছে অথবা সিনেমায় যাওয়ার মতো। কিন্তু আমার মনে তেমন গন্তব্যের ভাবনা ছিল না। সান্ধ্য বাতাস সুবাসিত। ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ ধরে কয়েক ব্লক অতিক্রম করলাম রেস্টুরেন্ট ও দোকানের জানালার দিকে দেখতে দেখতে। এরপর কোন চিন্তাভাবনা না করেই আমি তাকে নিয়ে শান্ত রাস্তা ধরে এগুলাম, যে রাস্তায় কতো রাত আমি একা হেঁটেছি।

"তুমি আসার আগে আমি এখানেই ছিলাম", মিসেস ক্রফটের বাড়ির সামনে থেমে বললাম।

"এতো বড় বাড়িতে থাকতে?"

"পিছনের দিকে উপর তলায় ছোট্ট একটি রুম ছিল আমার।"

"বাড়িটায় আর কে থাকে?"

"এক অতি বৃদ্ধা মহিলা।"

"তার পরিবারের সাথে?"

"না একা।"

"কিন্তু কে তার দেখাশুনা করে?"

আমি গেট খুললাম। "অধিকাংশ সময় বৃদ্ধা নিজেই নিজের দেখাশুনা করে।"

আমার ভয় হলো যে, মিসেস ক্রফট আমাকে স্মরণ করতে পারবেন কিনা, ভাবলাম, তার যদি নতুন কোন ভাড়াটে এসে থাকে তাহলে প্রতি সন্ধ্যায় সেও তার পাশে বেঞ্চে বসে কি না। বেল বাজানোর পর আমি আশা করছিলাম যে, আমাকে প্রথম সাক্ষাতের মতোই দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে কি না। কিন্তু এবার প্রায় তখনই দরজা খুলে গেল। দরজা খুলে দিয়েছে হেলেন। মিসেস ক্রফট বেঞ্চে বসা অবস্থায় নেই। বেঞ্চটিও আগের জায়গায় নেই।

"হ্যালো, ও তুমি" হেলেন তার উজ্জ্বল গোলাপি লিপস্টিক লাগানো ঠোঁটে মালার দিকে তাকিয়ে হেসে বললো।

"মা লিভিংরুমে। তুমি কি একটু সময় থাকবে?"

"আপনার যেমন ইচ্ছা, ম্যাডাম।"

"তাহলে তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমি এক দৌড়ে স্টোরে যাবো। মা ছোট একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। এ অবস্থায় আমরা তাকে একা থাকতে দেই না, এক মিনিটের জন্যেও না।

হেলেন বাইরে গেলে আমি দরজা তালাবদ্ধ করে লিভিংরুমে গেলাম। মিসেস ক্রফট হালকা কমলা রং এর একটি বালিশ মাথায় দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। একটি পাতলা সাদা কম্বল তার উপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হাত দু'টি বুকের উপর ভাঁজ করে রাখা। আমাকে দেখে তিনি সোফার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন এবং বসতে বললেন। নির্দেশমত আমি বসলাম। কিন্তু মালা পিয়ানোর পাশে ঘুরছিল এবং একসময় বেঞ্চের উপর বসলো, বেঞ্চটি এখন যথাস্থানে রাখা হয়েছে।

"আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে" মিসেস ক্রফট ঘোষণা করলেন, যেন মাঝে কোন সময় অতিক্রান্ত হয়নি।

"ওহ্ ডিয়ার, ম্যাডাম।"

"আমি বেঞ্চ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।"

"আই অ্যাম সরি, ম্যাডাম।"

"তখন মধ্য রাত! তুমি জানো, আমি কি করেছিলাম?"

মাথা নেড়ে আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

"আমি পুলিশকে ফোন করলাম।"

তিনি ছাদের দিকে তাকালেন এবং অবসন্নের মতো শব্দ করলেন তার ধূসর দাঁত বের করে। "তুমি এটাকে কি বলবে?"

আমি বিচলিত হলেও জানতাম যে আমাকে কি বলতে হবে। কোন দ্বিধা না করেই জোরে বললাম, "সত্যিই বিস্ময়কর!"

মালা হেসে ফেললো। তার কণ্ঠে করুণা, কিন্তু চোখে আনন্দের উচ্ছলতা। আগে কখনো তার হাসির শব্দ শুনিনি এবং হাসি মিসেস ক্রফটের কানে পৌঁছার মতো যথেষ্ট জোরে ছিল। তিনি মালার দিকে চোখ বড় করে তাকালেন।

"ও কে?"

"সে আমার স্ত্রী, ম্যাডাম।"

মিসেস ক্রফট তাকে ভালোভাবে দেখার জন্যে বালিশের এক দিকে মাথাটা ঘোরালেন। "তুমি কি পিয়ানো বাজাতে পারো?"

"নো, ম্যাডাম।" মালা উত্তর দিলো।

"তাহলে ওখান থেকে উঠো।"

মালা দাঁড়িয়ে তার মাথার উপর শাড়ি ঠিক করলো এবং আঁচলের খানিকটা বুকের কাছে ধরে রাখলো এবং আমেরিকায় পৌঁছার পর প্রথমবারের জন্যে তার জন্যে আমি সহানুভূতি অনুভব করলাম। লন্ডনে আমার প্রথম দিনগুলোর কথা স্মরণ করলাম, প্রথমবারের মতো এসকেলেটরে উঠে কিভাবে পাতাল রেলে আমাকে রাসেল স্কোয়ার পর্যন্ত যেতে হবে তা শিখতে হয়েছিল। যখন একজন লোক 'পেপারকে' 'পাইপার' বলে চিৎকার করেছে তখন আমি তা বুঝতে পারিনি। প্রতিটি স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার সময় কন্ডাক্টর বলতো 'মাইন্ড দ্য গ্যাপ' তা পুরো একটি বছরেও আমার পক্ষে বুঝে উঠা সম্ভব হয়নি। আমার মতো মালাও বাড়ির বহুদূরে এসেছে, সে জানে না কোথায় যাচ্ছে অথবা কোথাও গিয়ে সে কি দেখতে পাবে। আমার স্ত্রী হওয়া ছাড়া এসব স্থানে তার উপস্থিতির কোন কারণও নেই। ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হলেও, আমি জানতাম যে, একদিন তার মৃত্যু আমাকে দুঃখ দেবে এবং তার কাছে আমি প্রায় অজ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও তার মাঝেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। আমি কোনভাবে মিসেস ক্রফটের কাছে আমার এই আবেগের প্রকাশ ঘটাতে চাইছিলাম, যিনি তখনো অনেকটা নৈরাশ্যের দৃষ্টিতে মালার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে, মিসেস ক্রফট কখনো শাড়ি পরিহিতা কোন মহিলাকে দেখেছেন কিনা, যার কপালে টিপ এবং দুই হাতে এতোগুলো চুড়ি। তিনি মালার পায়ে লাল রং এর আল্পনা দেখতে পাচ্ছেন কিনা, যা এখনো স্পষ্ট থাকলেও শাড়ির নিচের অংশ দিয়ে প্রায় ঢাকা। শেষ পর্যন্ত মিসেস ক্রফট তার অবিশ্বাস ও আনন্দের সাথে ঘোষণা করলেন, "সে যথার্থই একজন ভদ্রমহিলা।"

এবার আমি হাসলাম। কিন্তু শব্দ না করে হাসলাম এবং মিসেস ক্রফট আমার হাসি শুনতে পেলেন না। কিন্তু মালা হাসির শব্দ পেয়েছে এবং প্রথম বার আমরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

মিসেস ক্রফটের লিভিংরুমে সেই মুহূর্তের কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে, যে মুহূর্তে মালা ও আমার মধ্যে ব্যবধান কমতে শুরু করেছিল। যদিও আমরা পুরোপুরি প্রেমে পড়িনি, আমি বিয়ের পর হানিমুনের মতো কিছু ভাবতে শুরু করেছি। একসাথে আমরা শহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অন্যান্য বাঙালিদের সাথে সাক্ষাৎ করছি, যাদের অনেকে এখনো আমাদের বন্ধু। আমরা বিল নামে এক লোকের সন্ধান পেলাম, যে লোকটি প্রসপেক্ট স্ট্রিটে তাজা মাছ বিক্রি করে। হার্ভার্ড স্কোয়ারে 'কার্ডালো' নামে একটি দোকানে তেজপাতা ও লবঙ্গ পাওয়া যায়। সন্ধ্যায় আমরা চার্লস নদীর পাড়ে গিয়ে পালতোলা নৌকা কেমন তরতর করে পানি কেটে যাচ্ছে তা লক্ষ করতাম অথবা হার্ভার্ড ইয়ার্ডে গিয়ে কোণ আইসক্রিম খেতাম। আমরা একটি ক্যামেরা কিনেছিলাম আমাদের জীবনকে ধরে রাখার জন্যে এবং আমি মালার ছবি তুললাম প্রুডেনশিয়াল বিল্ডিং এর সামনে, যাতে ছবিগুলো সে তার বাবা মা'র কাছে পাঠাতে পারে। রাতে আমরা চুমো খেতাম, প্রথমে লজ্জা লাগলেও দ্রুত সাহসী হয়ে উঠলাম এবং একে অন্যের বাহুতে পরিতৃপ্তি ও সান্ত্বনা খুঁজে পেতে শিখলাম। আমি তাকে 'এসএম রোমায়' আমার সমুদ্র যাত্রা, ফিনসবারী পার্ক, ওয়াইএমসিএ হোস্টেল, মিসেস ক্রফটের সাথে বেঞ্চে বসে থাকার কথাগুলো বললাম। যখন আমার মায়ের দুঃখময় কাহিনী মালাকে বললাম, সে কাঁদলো। এক সন্ধ্যায় যখন বোস্টন গ্লোব পড়ার সময় মিসেস ক্রফটের মৃত্যু সংবাদ পড়লাম, তখন মালা আমাকে সান্ত্বনা দিল। কয়েকটি মাস আমি তার কথা ভাবিনি—ততোদিনে গ্রীষ্মের সেই ছ'টি সপ্তাহ আমার দূর অতীতে স্থান করে নিয়েছিল। কিন্তু তার মৃত্যুসংবাদ জানার পর আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। এতোটাই কষ্টদায়ক যে, মালা যখন কার্ডিগান বোনা থেকে চোখ তুলে আমাকে দেখলো, আমার দৃষ্টি তখন দেয়ালে নিবদ্ধ, সংবাদপত্র অবহেলিতভাবে আমার কোলের উপর পড়ে আছে এবং কথা বলতে পারছি না। মিসেস ক্রফটের মৃত্যুর খবরেই আমি আমেরিকায় প্রথম শোকগ্রস্ত হলাম, কারণ তার জীবনকে আমি প্রথম প্রশংসা করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি পৃথিবী ছেড়ে গেলেন, প্রাচীন এবং একা। আর কখনো তিনি এ পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না।

আমি এখন আর নিঃসঙ্গ নই। মালা এবং আমি বোস্টন থেকে বিশ মাইল দূরে একটি শহরে থাকি। মিসেস ক্রফটের বাড়ির মতোই সারিবদ্ধ বৃক্ষশোভিত রাস্তার পাশে একটি বাড়ির মালিক আমরা। বাড়িতে একটি বাগান আছে, যেখানে টমেটো জন্মায় এবং সেজন্যে গ্রীষ্মে আমাদেরকে স্টোর থেকে টমেটো কিনতে হয় না। অতিথিদের জন্যেও প্রশস্ত জায়গা আছে। আমরা এখন আমেরিকান নাগরিক, অতএব সময় হলে আমরা সোস্যাল সিকিউরিটির সুবিধা নিতে পারি। যদিও কয়েক বছর পরপর আমরা

কলকাতায় বেড়াতে যাই এবং আরো পাজামা ও দার্জিলিং চা নিয়ে আসি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমেরিকাতেই আমাদের জীবন কাটাবো। আমি একটি ছোট কলেজের লাইব্রেরিতে কাজ করি। আমাদের ছেলে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করে। মালা এখন আর মাথায় আঁচল টেনে দেয় না অথবা রাতে বাবা মা'র জন্যে কাঁদে না, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের ছেলেটির জন্যে কাঁদে। অতএব আমরা তাকে দেখতে কেমব্রিজে যাই অথবা উইকএন্ড কাটানোর জন্যে বাড়িতে নিয়ে আসি, যাতে সে আমাদের সাথে হাত দিয়ে মেখে ভাত খেতে পারে এবং বাংলা বলতে পারে। কখনো কখনো আমাদের ভয় হয় যে, আমরা মারা গেলে সে এ কাজগুলো আর করবে না।

যখনই আমরা কেমব্রিজে যাই, আমি সবসময় ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ দিয়েই যাই, যদিও সে রাস্তায় প্রচুর ভিড় থাকে। এখনকার গড়ে উঠা ভবনগুলো আমি চিনতে পারি না, কিন্তু প্রতিবার সেখানে যেতেই তাৎক্ষণিকভাবেই আমার সেই প্রথম ছয় সপ্তাহে ফিরে যাই, যেন এই সেদিনের ব্যাপার। গাড়ির গতি মন্থর করে আমার ছেলেকে মিসেস ক্রফটের বাড়ির রাস্তা দেখাই, এখানেই আমেরিকায় আমার প্রথম ঘর ছিল, যেখানে আমি একশ তিন বছর বয়সের এক বৃদ্ধা মহিলার সাথে বাস করেছি। "তোমার মনে আছে?" মালা বলে এবং হাসে। আমার মতো সেও বিস্মিত। এমন এক সময় ছিল যখন আমরা অচেনা ছিলাম। আমার ছেলে সবসময় তার বিস্ময় প্রকাশ করে, কিন্তু সে বিস্ময় মিসেস ক্রফটের বয়স নিয়ে নয়, বরং আমি কত কম ভাড়া দিয়েছি সেজন্যে। তার কাছে এ ব্যাপারটা ১৮৬৬ সালে জন্মগ্রহণকারী একজন মহিলার কাছে চাঁদে পতাকা উত্তোলনের মতোই অবিশ্বাস্য। আমার ছেলের চোখে আমি যে উচ্চাভিলাষ দেখি, তা আমাকে পৃথিবী ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। কয়েক বছরের মধ্যে সে গ্রাজুয়েশন লাভ করে নিজের পথ বেছে নেবে সম্পূর্ণ একা এবং কারো তত্ত্বাবধান ছাড়াই। কিন্তু আমি নিজেকে আশ্বস্ত করি যে, তার বাবা এখনো বেঁচে আছে, মা আছে, সে সুখী এবং সমর্থ। যখনই তার মাঝে হতাশা লক্ষ করি, তখন তাকে বলি যে, আমি যদি তিনটি মহাদেশে থাকতে পারতাম, তাহলে এমন কোন বাধাই থাকতো না, যা তার বিজয় অর্জনের বাইরে থাকতো। যখন নভোচারীরা সামান্য কয়েক ঘণ্টা চন্দ্রপৃষ্ঠে কাটিয়ে চিরদিনের জন্যে বীরের মর্যাদা লাভ করেছে, সেক্ষেত্রে আমি তো এই নতুন পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে অবস্থান করছি। আমি জানি আমার সাফল্য খুব সাধারণ। আমিই একমাত্র ব্যক্তি নই যে তার দেশ থেকে বহু দূরে এসে তার ভাগ্য অন্বেষণ করেছে এবং আমি এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথম ব্যক্তি নই। এখনো আমি বিস্মিত হয়ে ভাবি আমার অতিক্রম করে আসা প্রতিটি মাইল, প্রতিবারের আহার, পরিচিত প্রতিটি লোক এবং যেখানে ঘুমিয়েছি সেই স্থানগুলোর কথা। বিষয়গুলো খুব সাধারণ মনে হলেও একসময় এসবই আমার কল্পনা থেকে দূরে বহু দূরে ছিল।

আমারবই.কম amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও !

Amarboi.com Like 2,199

Download Free Bangla Books at AMARBOI

বইয়ের পিডিএফ এ জলছাপ কি আপনার পছন্দ? Click to Vote

Friday, June 1.

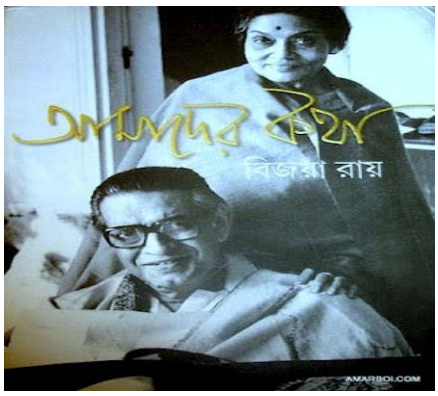

আমাদের কথা - বিজয়া রায়

26 May 2012 | 0 comments

আমাদের কথা - বিজয়া রায় "আমাদের কথা" লেখিকা সত্যজিত রায়ের... *Read more*

আলোচিত বইগুলি

May/31 দ্য ডে অব দি জ্যাকেল - ফ্রেডরিক ফরসাইথ'র

May/31 পাক সার জমিন সাদ বাদ - হুমায়ূন আজাদ

May/28 কেপলার টুটুবি - জাফর ইকবাল

May/28 বইয়ের পিডিএফ এ জলছাপ কি আপনার পছন্দ?

May/27 শুভব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার - হুমায়ূন আজাদ

May/26 আমাদের কথা - বিজয়া রায়

May/26 শঙ্খিনী - সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

May/26 বি. ওয়ার্ডসওয়ার্থ - ভি এস নাইপল

May/25 ফাউন্ডেশন অ্যান্ড আর্থ - অ্যাইজাক আজিমভ

May/24 পাঠ্যপুস্তক প্রথম থেকে মাধ্যমিক

আরও »

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১২

গাছটির ছায়া নেই - সেলিনা হোসেন (বইমেলা ২০১২)

পুড়ির একাকী - মুস্তাফা জামান আব্বাসী (বইমেলা ২০১২)

শালিক পাখিটি উড়ছিল - ইমদাদুল হক মিলন (বইমেলা ২০১২)

পায়ের তলায় খড়ম - হুমায়ুন আহমেদ (বইমেলা ২০১২)

আলোচিত বই

শুভব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার - হুমায়ূন আজাদ

27 May 2012 | 7 comments

শুভব্রত ও তার সম্পর্কিত সুসমাচার - হুমায়ূন আজাদ হুমায়ূন আ...*Read more*

AmarBoi on Pages

+623

228 Recommend us on Google!

Follow @amarboi 70 followers

Enter Your Email here.. Subscribe

RSS Feed YouTube Google Page

» by Gadily »

জনপ্রিয় বইগুলি

হিমু এবং হার্ভার্ড Ph.D. বল্টু ভাই - হুমায়ুন আহমেদ (বইমেলা ২০১২)

মিসির আলি বিষয়ক রচনা যখন নামিবে আঁধার (বইমেলা ২০১২)

মেঘের উপর বাড়ি (বইমেলা ২০১২) হুমায়ূন আহমেদ